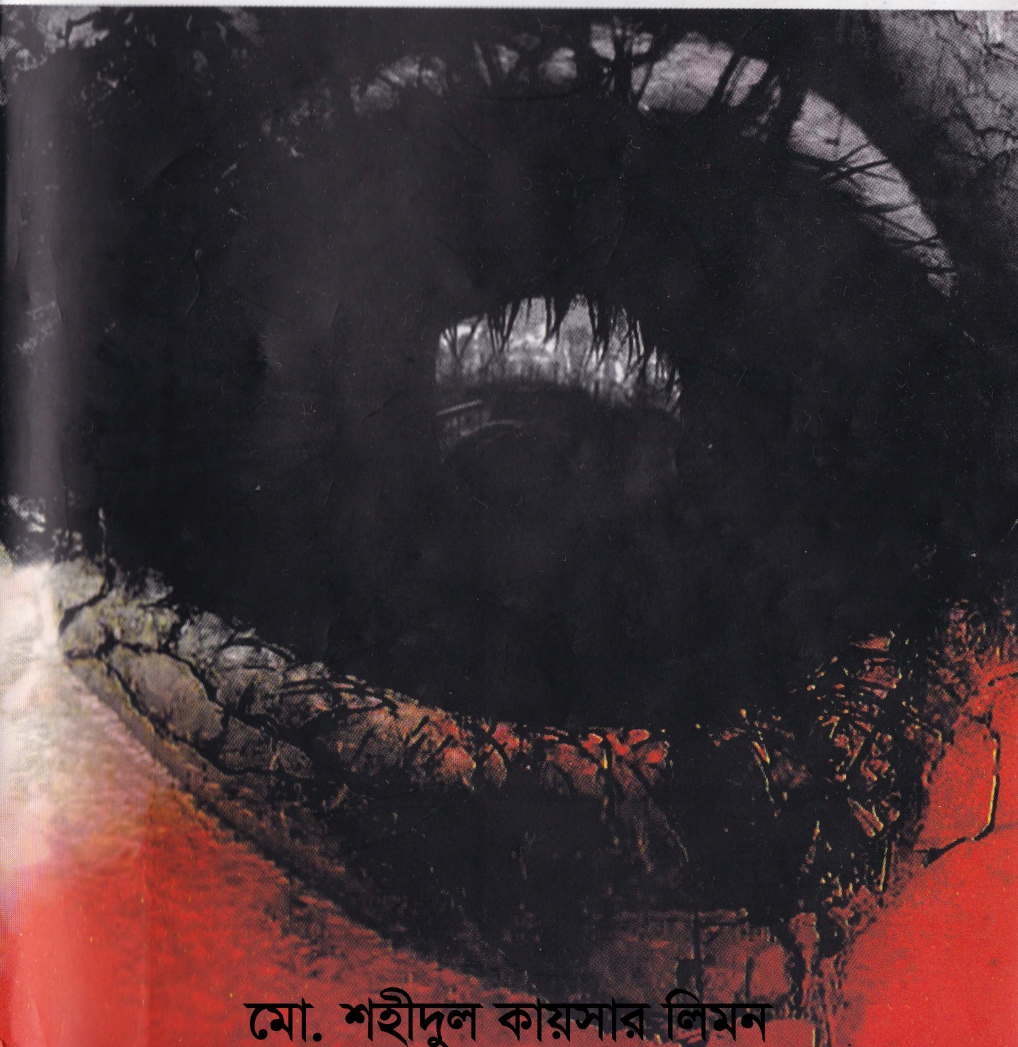
বাংলাপিডিএফ বইঘর বইলাভার্স

কাশ্মীরের কান্না

সমর ইসলাম



মো. শহীদুল কায়সার লিমন

Remash

Presents

https://www.banglapdf.net
https://www.boighar.com
https://www.boilovers.com

Scan & Edit

Md. Shahidul Kaysar Limon
মোঃ শহীদুল কায়সার লিমন
https://www.facebook.com/limon1999

বই ঘর
বইঘর

কাশ্মীরের কান্না

কাশ্মীরের কান্না

স ম র ই স লা ম

বই ঘর বইঘর
[অভিজাত বইয়ের ঠিকানা]
৪৩ ইসলামী টাওয়ার, ১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০
দূরালাপনী ০১৭১১৭১১৪০৯, ০১৭২১১২২৫৬৪



কাশ্মীরের কান্না
সমর ইসলাম

প্রকাশক
ব ই ঘ র -এর পক্ষে
এস এম আমিনুল ইসলাম

© এম এম তাশফি

নবম মুদ্রণ
মার্চ ২০১৫

তৃতীয় সংস্করণ
জানুয়ারি ২০১৩

প্রথম প্রকাশ
জুন ২০০২

প্রচ্ছদ
নাজমুল হায়দার

কম্পোজ
ব ই ঘ র বর্ণসাজ
বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০

মুদ্রণ : মাসুম আর্ট প্রেস
৩৬ শ্রীসদাস লেন, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ২০০ টাকা মাত্র

ISBN : 984-70168-0050-4

KASHMIRER KANNA : By Samor Islam, **Published by** : S M Aminul Islam, **BhoiGhor** : 43 Islami Tower, 11/1 Banglabazar, Dhaka-1100
First Edition : January 2013 © M M Tashfi

Price : 200 Taka only

অ র্প ণ

আযাদী ও দীন কায়েমের লক্ষ্যে যাঁরা
জান কুরবান দেন, যাঁদের খুনে-ভেজা
সলতেয় জ্বলে সত্যের শিখা; সেসব
মরণজয়ী মুজাহিদদের দো'জাহানের
কল্যাণ কামনায়–

–সমর ইসলাম

আল্লাহতে যাঁর পূর্ণ ঈমান
কোথা সে মুসলমান...!

কোথা সে শিক্ষা ছাড়া আল্লাহ ছাড়া
ত্রিভুবনে ভয় করিত না যাঁরা
আযাদ করিতে এসেছিল যা'রা
সাথে লয়ে কোরআন॥

–কাজী নজরুল

আমাদের কথা

আল্লাহ তায়ালার অশেষ শোকর। পাঠক-নন্দিত ঔপন্যাসিক সমর ইসলামের সবচেয়ে জনপ্রিয় উপন্যাস কাশ্মীরের কান্না আমাদের প্রকাশনার তালিকায় স্থান পেলো। ২০০২ সালের জুন মাসে প্রথম এটি প্রকাশিত হয়। কিন্তু পাঠকের বিপুল চাহিদা থাকা সত্ত্বেও বাজারজাতের ক্ষেত্রে প্রায়ই ধারাবাহিকতা রক্ষা পায়নি। আমরা নির্ভুল ও সুন্দরভাবে সব সময় বইটি সরবরাহের ক্ষেত্রে সচেষ্ট থাকবো।

বইটি প্রকাশের দায়িত্ব পাওয়ার পর পাঠকের অনবরত তাকাদায় খুব কম সময়ের মধ্যে তা বাজারে আনতে হয়েছে। তবুও চেষ্টা করেছি আগের চেয়ে আরও সুন্দর ও নির্ভুল করার। এ বইটির যে কোনো ভুল আমাদের ধরিয়ে দিলে অবশ্যই কৃতজ্ঞতার সঙ্গে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করা হবে। আরেকটি কথা, কাশ্মীরের কান্না বইটি এ পর্যন্ত তিনটি প্রচ্ছদে বাজারে এসেছে। আর তিনটি প্রচ্ছদই করেছেন প্রচ্ছদ-শিল্পী নাজমুল হায়দার। একই বইয়ের তিনটি প্রচ্ছদ করার সৌভাগ্যবান শিল্পীকে ধন্যবাদ দিয়ে খাটো করতে চাই না। এছাড়াও বইটি প্রকাশে আমরা যাদের কাছে নানাভাবে সহযোগিতা পেয়েছি, আল্লাহ তায়ালা তাদের উত্তম প্রতিদান দিন। এ বইটিসহ আমাদের প্রকাশনার ব্যাপারে সকলের সুপরামর্শ কামনা করি।

বিনীত

এস এম আমিনুল ইসলাম
পরিচালক, **বইঘর**

তারিখ
৩ জানুয়ারি ২০১৩

প্রথম প্রকাশে লেখকের নিবেদন

আলহামদুলিল্লাহ! সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের– যাঁর করুণাধারায় সিক্ত গোটা সৃষ্টিজগত। আল্লাহর প্রিয় হাবীব, সরদারে দোজাঁহা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শানে সালাম ও দরূদ পেশ করছি। সশ্রদ্ধচিত্তে সালাম ও মুক্তি কামনা করছি যাঁরা আল্লাহর দেয়া জীবন-ব্যবস্থা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রদর্শিত পথে দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে চলেছেন, আযাদী ও নিজ কওমের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠায় যাঁরা জীবনের নজরানা পেশ করেছেন তাঁদের প্রতি।

কাশ্মীর এই উপমহাদেশের বুকে এমনই এক ভাগ্যবিড়ম্বিত জনপদ, যেখানকার মানুষ সুদীর্ঘ অর্ধশতাব্দীরও অধিককাল ধরে আযাদীর জন্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি কাশ্মীর, হাজারো মুসলিম নারীর লুণ্ঠিত সম্ভ্রম, নির্যাতিত মুজাহিদদের হাহাকার, স্বাধীনতাকামী তরুণ-যুবকদের আর্তচিৎকারের মাঝেও প্রতিনিয়ত এখানে আকুল আওয়াজ ওঠে স্বাধীনতার। অথচ বিশ্ববিবেক যেন কাশ্মীরের ব্যাপারে এখনও মুখে কুলুপ এঁটে রয়েছে। পাশ্চাত্য ইহুদীবাদী এবং ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদী মিডিয়া কাশ্মীরী জনতার এই আযাদী-আন্দোলনকে সন্ত্রাস, বিচ্ছিন্নতাবাদ আখ্যা দিয়ে বিশ্ববাসীকে ধোকা দিয়ে চলেছে। তাই কাশ্মীরের জমিনে হাজারো শহীদের খুন চাপা পড়ে যাচ্ছে, সেখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের কুরবানী, আযাদীর জন্য তাদের হাহাকার, তাদের সংগ্রাম, আশা-আকাঙ্ক্ষা সঠিকভাবে তুলে ধরার গরজ খুব কমই চোখে পড়ে। পত্র-পত্রিকায় সেখানকার সংঘাতের, হতাহতের খবরই কেবল চোখে পড়ে।

কাশ্মীর সম্পর্কে জানার আগ্রহের কমতি নেই বাংলাদেশের মানুষের। তাদের জীবনযাত্রা, সামাজিক ও ভৌগোলিক অবস্থা, তাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য, সংগ্রাম ও কুরবানীর

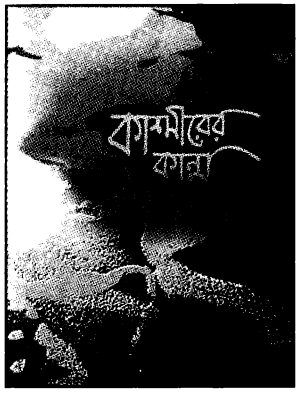
সামান্যতম অংশ নিয়ে রচিত হলো 'কাশ্মীরের কান্না' উপন্যাস। এই পুস্তকে সন্নিবেশিত তথ্য-উপাত্ত বেশিরভাগই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে সংগৃহীত। কাল্পনিক চরিত্র ও ঘটনাপ্রবাহের মাধ্যমে আমি তা সহজভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আমার জন্য এ ধরনের কাজ নিঃসন্দেহে মূষিকের পর্বত ডিঙ্গানোর মতো ব্যাপার। সাহিত্যের রস, ঘটনার বিন্যাস, চরিত্র সৃজন, শব্দ চয়ন ও বাক্য প্রকরণে জ্ঞানের সীমাবদ্ধতাজনিত কারণে অসঙ্গতি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। বিজ্ঞ পাঠক আমার এ ত্রুটিগুলো ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন আশা করি।

এই উপন্যাস রচনায় বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব, চিন্তাবিদ জনাব আরিফুল হক এবং বিদগ্ধ লেখক সাপ্তাহিক বিক্রম-এর সম্পাদক জনাব মাসুদ মজুমদারের দুটি নিবন্ধ যথেষ্ট উপকারে এসেছে। আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। সাপ্তাহিক মুসলিমজাহানের ঈদ সংখ্যায় উপন্যাসটি প্রকাশ করার জন্য সম্মানিত সম্পাদক মোস্তফা মঈনউদ্দীন খানকেও জানাই কৃতজ্ঞতা। মুসলিমজাহানে উপন্যাসটি পড়ে যে সব পাঠক উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন এবং এটি বই আকারে প্রকাশের পরামর্শ দিয়েছেন তাঁদের প্রতি আন্তরিক অভিনন্দন। বই আকারে প্রকাশের ক্ষেত্রে আমি ঋণী হয়ে রইলাম শ্রদ্ধেয় সহকর্মী সফল অনুবাদক, লেখক, চিন্তাবিদ মাওলানা যাইনুল আবিদীন এবং প্রকাশনা সংস্থা এদারায়ে কুরআন-এর স্বত্বাধিকারী আরিফ বিল্লাহর কাছে। শত ব্যস্ততার মাঝেও পাণ্ডুলিপি পড়ে সংশোধন করে দিয়ে আমাকে ঋণী করে দিলেন দৈনিক ইনকিলাবের সহকারী সম্পাদক, লব্ধপ্রতিষ্ঠিত লেখক, গবেষক আলেম, পরম শ্রদ্ধেয় বড় ভাই মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নদভী। আমি গুনাহগার তাঁদের প্রত্যেকের জন্য মহান আল্লাহর দরবারে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ কামনা করি। সকল পাঠকের নিকট দোয়ার দরখাস্ত পেশ করছি।

তারিখ : বিনয়াবনত

ঢাকা, ২০ জুন ২০০২ ঈ. সমর ইসলাম

কাশ্মীরের কান্না



এক

এমন অভাবনীয় খুশির বার্তাটি যেদিন পাই সেদিন প্রথমেই মার কাছে ছুটে গিয়েছিলাম। মাকে সালাম করে দাঁড়াতেই আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, নিশ্চয়ই কোন খুশির খবর আছে বেটা। বল না কি সে খুশির খবরটা?

খুশিতে সত্যিই তখন আমার চোখ চিকচিক করছে। মায়ের দিকে দৃষ্টি তুলে বললাম, আমি কাশ্মীর সফরের দাওয়াত পেয়েছি। কেন্দ্রীয় অফিস আমার সফরের সব ব্যবস্থা করছে। তারা চাচ্ছে আমাকে দিয়ে কাশ্মীরের রণাঙ্গনের উপর একটা স্পেশাল স্পট স্টোরি করাতে। আমার সফরের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন ছাড়াও বেতন বাদে সফর শেষে পাব বার হাজার সৌদি রিয়াল। এবার তুমিই বল খবরটা সত্যিই খুশির কি না?

মা আমার মুখের দিকে কতক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। চাকরি পাওয়ার খবর শুনে মা প্রথমে যেমন খুশি হয়েছিলেন, ভেবেছিলাম তেমনি খুশি হবেন আজও। কিন্তু মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে তেমনটা আমার মনে হয়নি। তাই জিজ্ঞেস করলাম, তুমি খুশি হওনি আম্মা?

মা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, সন্তানের সাফল্যে পিতা-মাতার চেয়ে বেশি খুশি আর কে হতে পারে! কিন্তু আমি ভাবছি...

থামলে কেন আম্মা, কি ভাবছো তুমি?

ভাবছি, কাশ্মীরের মতো গোলযোগপূর্ণ জায়গায় আমার একমাত্র ছেলেকে পাঠিয়ে দিয়ে এ মনকে প্রবোধ দেবো কি করে?

এবার মায়ের আশংকার কারণটা খুঁজে পেলাম। তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, মাত্র তো কটা দিন। এতেই তুমি এমন বেকারার হয়ে পড়লে চলবে কেন মা? একবার কি ভেবে দেখেছো, তোমার মতো হাজার হাজার মায়ের সন্তান সেখানে আযাদীর জন্য দুশমনের বুলেটের সামনে বুক পেতে লড়াই করে চলেছে বছরের পর বছর। আমি তো সেখানে লড়াই করতে যাচ্ছি না, যাচ্ছি সংবাদ সংগ্রহের জন্য।

মা একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, যখন সন্তানের পিতা হবে তখন বুঝবে আমার দুঃখ-দুশ্চিন্তার উৎসটা কোথায়। মায়ের বেদনাক্লিষ্ট মুখের দিকে চেয়ে আর কথা বাড়াতে পারিনি। কতক্ষণ নীরব থেকে নিজের ঘরে চলে যাই।

ছেলেবেলায় বাবাকে হারানোর পর দুঃখিনী মা আমার তিল তিল করে অতি যত্নে আমাকে এতটুকু বড় করেছেন। ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হবার পর প্রতি সপ্তাহে মায়ের একটি চিঠি পেতাম। আমাকেও লিখতে হতো সমান তালে। কত কষ্টে কেটেছে প্রথম বছরটি। যখনই গ্রামের বাড়ি থেকে আসা মানি-অর্ডারটা আমার হাতে পড়ত, তখনই বুঝতাম ঢাকা শহরের হিসেবে সামান্য এ ক'টি টাকা পাঠাতে মাকে কত গলদঘর্ম হতে হয়েছে। তারপর দু'তিনটা টিউশনি জুটিয়ে মায়ের কষ্টটা অনেকটাই লাঘব করেছিলাম। অনার্স শেষ করার পর দেশীয় ক'টি সংবাদপত্রে টুকটাক লিখেও কিছু পেতাম। তারপর সৌভাগ্যবশতই Islamic Broadcasting Agency (IBA)-তে চাকরিটা পেয়ে যাই। সংস্থাটি তখন কেবল তাদের যাত্রা শুরু করেছে। তারা নিজেদের একটি Weekly প্রকাশ ছাড়াও বিভিন্ন দেশের সংবাদপত্রে আহরিত সংবাদ বিক্রি করে থাকে। বিজ্ঞাপনটি পেয়েছিলাম দি মুসলিম ওয়ার্ল্ডলীগ জার্নালে। যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর এপ্লাই করে ইন্টারভিউয়ে ফার্স্ট হয়ে চাকরিটা পেয়ে যাই। পড়াশোনার সময় কিছুটা সংকুচিত হয়ে এলেও চাকরিটার বড়ই প্রয়োজন ছিল আমার। বাংলাদেশী মুদ্রায় হাজার দশেক টাকা দিয়ে শুরু হয়েছিল। দু'বছরের মধ্যেই বেতন প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। তাই ফাইনাল পরীক্ষার আগেই দু'রুমের একটি ফ্ল্যাট ভাড়া করে মাকে নিয়ে আসি ঢাকায়। মাস্টার্স ফাইনাল শেষ হয়েছে কেবল। এর মধ্যে কোম্পানীর কাশ্মীর সফরের অফারটা আমাকে দারুণ আনন্দ দেয়। কিন্তু মা যে আমার কি! ছেলে বড় হয়েছে, এখনো কি ঘরে বসে থাকবে নাকি? আমি নিশ্চিত, মা যদি আগে জানতেন সংবাদপত্র জগতের মানুষদের এভাবে ছোটাছুটি করতে হয়, তাহলে জার্নালিজমে পড়তেই দিতেন না। তবে আশার কথা হলো, মা আজ পর্যন্ত আমার ইচ্ছায় বাধা হয়ে দাঁড়াননি। শেষ পর্যন্ত কাশ্মীর সফরেও বাধা দেবেন না– শুধু মৃদু আপত্তি ছাড়া।

চেয়ারে বসে চোখ বন্ধ করে ভাবছিলাম কথাগুলো। হঠাৎ মায়ের স্পর্শে চোখ মেলে চাইলাম। দেখি আমার পেছনেই তিনি দাঁড়িয়ে। আমি কিছু বলার আগেই আম্মা বললেন, তা কবে যাচ্ছিস, কিছু ঠিক করেছিস?

তারিখ তো ওরাই দিয়ে দিয়েছে। হাতে দশ-বার দিন সময় আছে। এ ক'দিনে কাগজপত্র সব গোছাতে হবে।

ব্যথাহত বিষণ্ন বদন মার। চোখ দুটি সজল হয়ে উঠেছে। আমি একটা কথা ভেবে পাচ্ছি না, তোদের এজেন্সির পাকিস্তানী প্রতিনিধিকে বাদ দিয়ে এ কাজের জন্য তোকে কেন নির্বাচন করলো? সেখানে তাদের ব্যুরো অফিস আছে ...

এটা আমার সৌভাগ্যই আম্মা। আসলে, সম্ভবত ওরা চাইছে একজন বিদেশীকে দিয়ে কাজটি করা হলে বস্তুনিষ্ঠতা প্রশ্নাতীত হবে এবং সর্বত্রই তা গৃহীত হবে। এজন্যই হয়তো তারা আমাকে নির্বাচন করে থাকবে।

আম্মা আমার যুক্তি শুনে এ ব্যাপারে আর কিছু বলেননি। চলে যাবার সময় বললেন, তাহলে রুকোকে খবরটা জানিয়ে দিস।

আজই আপাকে টেলিফোন করবো। আমি চলে যাবার পর তুমি ইচ্ছে করলে তাদের ওখানে অথবা বাড়িতে গিয়েও বেড়িয়ে আসতে পারো।

তারা আগে আসুক। তোকে এক সাথে এয়ারপোর্টে গিয়ে তুলে দিয়ে আসবো। তারপর আমি চিন্তা করে দেখবো কোথায় থাকা যায়। বলে আম্মা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

রুকো মানে আমার বড় বোন রুকাইয়া আপাকে টেলিফোন করাসহ দিনের কাজগুলো গুছিয়ে নেবার চেষ্টায় লেগে গেলাম।

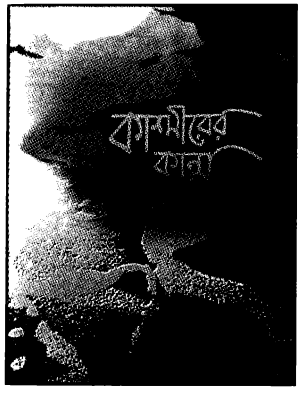
বাঙালি মায়েরা সন্তানদের তাদের আঁচলের ছায়াতলে রাখতেই বেশি পছন্দ করে। তাই সন্তানরাও দেহে বড় হলেও মনের দিক থেকে বড় হতে পারে না। ফলে ঘরকুনো থেকে যায় সারাজীবন। এখন এর ব্যতিক্রম কিছুটা ঘটছে। অনেকেই হয়তো 'ঘর থেকে শুধু দুই পা ফেলিয়া' বিশ্বের দু'এক জায়গায় ছিটকে পড়ে। তবে তারা পাহাড় শৃঙ্গ অতিক্রম করতে নয়, সাগরের তলদেশের রহস্য উদঘাটন করতেও নয়, অথবা পাখির মতো আকাশে উড়ে উড়ে গ্রহ-নক্ষত্রের তত্ত্ব তালাশের জন্যও নয়– তারা নেহায়েতই পেটের দায়ে দেশ ছাড়ে। গায়ের শ্রমের বিনিময়ে যারা জীবিকানির্বাহ করে, চিন্তার ফসল দিয়ে দেশ-জাতিকে এগিয়ে নেবার ফুসরত কই তাদের? তাই তো বিশ্বের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ যেখানে, সেখানকার মানুষ তার নাগাল পায় না। সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে এসে সাদা চামড়াওয়ালারা তা আবিষ্কার করে। তাই সারা জীবন দেখে আসা ঘরের 'পরে উঁচু টিলাটার নাম হয়ে যায় এভারেস্ট শৃঙ্গ।

বিমানে বসে এ কথাটিই খুব বেশি করে ভাবছি আর অবাক হচ্ছি। সাধারণ ভ্রমণে যাচ্ছে যেসব যাত্রী তাদেরও স্বজনরা অশ্রুসজল চোখে বিদায় জানাচ্ছে। যারা চিকিৎসা বা কয়েক বছর কাজের জন্য বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছে তাদের বেলায় তো কথাই নেই। নিকট আত্মীয়রা কেঁদে কেটে হয়রান। শতজনের শত কান্নার শব্দে বিমানবন্দর এলাকাটির বাতাসও যেনো কেমন ভারী মনে হয়।

আমাকে উঠিয়ে দিতেও মা এলেন। সাথে এলেন স্বামী ও বাচ্চাসহ আমার একমাত্র বড় বোন। তাদের চোখ অশ্রুসজল। আমি তাদের মুখের দিকে চাইতে পারিনি। কি জানি হয়তো উচ্ছ্বাসে ভরা হৃদয়খানি আমারও কেঁদে উঠবে ঠিক তাদেরই মতো। তাই বেশি বাক্যালাপ না করে নীরবে নিঃশব্দে নির্দিষ্ট আসনে গিয়ে বসে পড়ি। বিমান তখন আকাশে। প্রিয় স্বদেশকে এত উপরে থেকে দেখার সৌভাগ্য এর আগে হয়নি। তাই চেষ্টা করে জানালার কাচে চোখ রাখি। অফুরন্ত বিস্ময়ভরা চোখে তাকিয়ে থাকি নীচের দিকে। বিদায়কালে মা বার বার বলে দিয়েছেন, যেয়েই টেলিফোন করবি। তুই সহিসালামতে পৌঁছুতে পেরেছিস এবং সুস্থ আছিস– এ কথা না জানা পর্যন্ত আমি স্বস্তি পাব না।

কোনক্রমেই মাকে বুঝাতে পারিনি, ইসলামাবাদে আমার অবস্থান বেশি সময়ের জন্য হবে না। আমি যাচ্ছি এমন এক ভূমিতে, যেখানকার সন্তানরা বিগত অর্ধশতাব্দী ধরে আযাদীর জন্য লড়াই করে চলেছে। এমনই এক রক্তস্নাত ভূমিতে আমি যাচ্ছি যেখানকার হাজারো মা সন্তান হারানোর বেদনা নিয়ে, হাজারো বোন স্বামী হারিয়ে অকাল বৈধব্য নিয়ে দুঃসহ প্রহর গুনছে মুক্ত সমীরণের প্রত্যাশায়।

বিমানের স্পিকার বক্স আমার ভাবনায় ছেদ টানে। সুমধুর নারী কণ্ঠ পরিষ্কার উচ্চারণে বিমানের ইসলামাবাদ উপস্থিতি জানিয়ে দিচ্ছে। একটু তন্দ্রার মতো এসেছিল। চোখ রগড়ে দেখি ঘড়িতে সাড়ে বারোটা বাজে। বিমান তখন ইসলামাবাদের আকাশে। একদিন এই অঞ্চলটাও আমার দেশের অংশ ছিল। এখন এখানে আসতে পাসপোর্ট ভিসা লাগে। দুই যুগের অধিককাল আগে আমরা তাদের থেকে জুদা হয়েছি। সেই জুদা হওয়াটাও অহিংস ছিল না। রক্ত সাগর পেরিয়েই আমরা নতুন আলোর দিকে পা বাড়িয়েছিলাম। কিন্তু যে স্বর্ণচূড়াকে মঞ্জিল করেছিল মুসাফির, শ্বাপদসংকুল পথ মাড়িয়ে গন্তব্যে পৌঁছেছিল– দূর থেকে দেখা সেই ভুবনমোহিনী মণিতে যে খামচে ধরা হায়েনার হাত! সেখানে পৌঁছেই সে বুঝে গেল নিমিষে। এখনও সেই মণি নিয়ে মানব দানবে কাড়াকাড়ি চলে– তাই কষ্টার্জিত মণিতে তার হাত পড়লেও এ হাত এখনও কণ্টকমুক্ত হয়নি।



দুই

ইসলামাবাদের মাটিতে প্রথম পা রাখলাম। এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে কাঙ্ক্ষিত গাড়িটি খুঁজে পেতে পার্কিং প্যাসেজের দিকে এগিয়ে গেলাম। ইসলামাবাদ ব্যুরো চীফের সাথে টেলিফোনে কথা হয়েছিল আগেই। সামনে ও পেছনের গ্লাসে লাল রঙে 'প্রেস' লেখা মেরুন কালারের গাড়ি আসবে বিমান বন্দরে। এটি ইসলামাবাদ ব্যুরো অফিসের গাড়ি। ব্যুরো প্রধান জাভেদ ওমর টেলিফোনে বলেছিলেন, আমি যেন নেমে গাড়ি ভাড়া করে না ফেলি। তিনি নিজেই এয়ারপোর্টে আসবেন আমাকে নিতে। গাড়ি পার্কিংয়ে দৃষ্টি ঘুরাতেই সামনের গ্লাসে লাল রঙে 'প্রেস' লেখা মেরুন কালারের গাড়িটি চোখে পড়লো। একজন ভদ্রলোক গাড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। পরনে কাবুলি স্যুট, তার দৃষ্টিও যাত্রীদের দিকে। আমি আরেকটু নিশ্চিত হয়ে গাড়ির কাছে এগিয়ে যাই। সালাম দিয়ে বললাম, সম্ভবত আপনিই মি. জাভেদ ওমর!

ভদ্রলোকের দৃষ্টি আগেই আমার দিকে ছিল। এবার আরেকটু মনোযোগী হয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, হ্যাঁ, আমি জাভেদ ওমর। আর আপনি নিশ্চয়ই হাসান মাহমুদ, ফ্রম ঢাকা?

ইয়েস! সহাস্যে জবাব দেবার সাথে সাথেই তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। এমন সময় আরও দু'জন আমাদের কাছে এসে দাঁড়ান। জাভেদ ভাই আমাকে ছেড়ে দিয়ে অপর দু'জনকে পরিচয় করিয়ে বললেন, শাকিল খান, জার্নালিজমে মাস্টার্স, ফাইনাল ইয়ার। আমাদের করাচী করেস্পনডেন্ট। আর এ হচ্ছে এজাজ আহমদ, ব্যুরো অফিসে আমার সাথে কাজ করছে।

বললাম, হ্যাঁ, তাদের লেখা আমি পড়েছি। তাই নামের সাথে পরিচয় বেশ ঘনিষ্ঠ।

তোমরা দু'জন নিশ্চয়ই চিনতে পেরেছো ঢাকা ব্যুরো প্রধান মাহমুদ হাসানকে।

সলজ্জ হাসি হেসে বললাম, ঢাকাকে এখনও ব্যুরো অফিস ঘোষণা করা হয়নি কিন্তু। আমাকে স্রেফ বাংলাদেশ প্রতিনিধি বলা যায়।

হো হো করে হেসে উঠলেন সবাই। হাত মেলানো ও কোলাকুলি শেষ হয়েছে। হাসি থামিয়ে এজাজ ভাই বললেন, আপনি কি ম্যাসেজ পাননি এখনও? আসছে জুলাইয়ে আপনাকে ব্যুরো প্রধান করে ঢাকা ব্যুরো অফিস খোলা হচ্ছে। সেই সাথে আপনার অধীনে ঢাকাতে একজন সহকারী এবং চিটাগাং ও রাজশাহীতে একজন করে প্রতিনিধি নিয়োগ দেয়া হবে।

জাভেদ ভাই টেলিফোনে এমন একটা আভাস দিয়েছেন বৈকি।

শাকিল খান প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে বলল, আপনাকে আপনার লেখার মতোই পরিচ্ছন্ন মনে হয়!

কেমন?

আপনি বিশ্বাস করবেন কি না জানি না, আমি সত্যিই আপনার একজন ভক্ত। মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ জার্নালের ফেব্রুয়ারির স্পেশাল প্রতিবেদনটি আমার কাছে দারুণ লেগেছে। উপস্থাপনার ক্ষেত্রে আমি আপনার স্টাইল ফলো করতে চেষ্টা করি।

কিন্তু হচ্ছে না। তাই না?

শাকিল খান একটু পানসে মুখে তাকালো আমার দিকে। ভুল বুঝতে পারে ভেবে বললাম, আপনাদের সকলের লেখাই আমি পড়ি। প্রত্যেকেরই একটা নিজস্বতা আছে, তা আমি লক্ষ করেছি। আর এই নিজস্বতাই হচ্ছে একজন সাংবাদিক বা লেখকের সার্থকতা।

জাভেদ ভাই আমার মুখের দিকে চেয়ে মৃদু হাসলেন। তারপর বললেন, শাকিল আসলেই আপনার ভক্ত। গতকাল তার করাচী চলে যাবার কথা। অথচ আপনি আসবেন শুনেই আজ থেকে গেছে। আজকে তার বাসায় আপনার সম্মানে ডিনারেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে।

শাকিল খানের কাঁধে হাত রেখে বললাম, সত্যি, তাই নাকি!

একটু লজ্জা পেয়েছে বলে মনে হচ্ছে তাকে। সত্যি, আপনাদের এই ভালোবাসার কোন তুলনা হয় না। প্রত্যেকের লেখা পড়ে পড়ে প্রতিটি নামই

আমার কাছে খুব পরিচিত, চেনাজানা, আপনজনদের মতো মনে হয়। সরাসরি আপনাদের সাথে পরিচিত হয়ে খুব খুশি হলাম।

আমার কথা শুনে এজাজ আহমদ সহাস্যে বললো, আমরা বুঝি খুশি হইনি আপনাকে পেয়ে?

খুশির প্রকাশ ঘটাতেই তো ব্যুরো প্রধানসহ সকলেই বিমানবন্দর পর্যন্ত ছুটে এসেছেন। খুশি হবার কথা কি আর মুখে প্রকাশ করতে হয়?

জাভেদ ভাই তাড়া দিলেন। এখানে দাঁড়িয়েই কথা বলবো, না কি গাড়িতে উঠতে হবে?

এজাজ আহমদ প্রফেশনাল ড্রাইভারের মতো গাড়ির দরোজা খুলে নিজে গিয়ে ড্রাইভিং সিটে বসলো। তার পাশে শাকিল খান এবং পেছনে আমি ও জাভেদ ভাই। এজাজ আহমদ গাড়ি স্টার্ট দিতে দিতে বলল, লাউঞ্জ থেকে বেরিয়ে আসার সময় আপনাকে দেখেই আমরা চিনে ফেলেছিলাম। ফলো করে করে আমরা এগুচ্ছি, দেখি আমাদের গাড়ির দিকেই আপনি যাচ্ছেন। জাভেদ ভাইয়ের সাথে হাত মেলানোর সময় নিশ্চিত হয়ে কাছে ছুটে আসি।

আসলে অন্তরের টান থাকলে এমনই হয়।

জাভেদ ভাই আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, পথে কোন অসুবিধা হয়নি তো?

না, কতই বা আর জার্নি?

গাড়ি এগিয়ে চলেছে শহরের প্রাণকেন্দ্রের দিকে। একটা বড়সড় হোটেলের সামনে এসে গাড়ি থামলো। আমি কিছু বলার আগেই জাভেদ ভাই বললেন, এখানেই তিন তলায় একটা রুম বুকিং দিয়েছি। অবশ্য আপনাকে হোটেলে উঠতে দিতাম না, কিন্তু অফিস সাফ বলে দিয়েছে বাসায় যেনো আপনাকে না রাখি।

ভালোই হলো। কিন্তু হোটেলে উঠলেও আপনাদের কম জ্বালাতন করছি না?

মানে! এখনও তো এসেই সারেননি, জ্বালাতন করলেন কখন? বিস্মিত জিজ্ঞাসা জাভেদ সাহেবের।

বললাম, এই যে বিমানবন্দরে আমার জন্য অপেক্ষা, আমাকে এখানে নিয়ে আসা, হোস্টেলে রুম বুকিং দেয়া, এসব কি কম ঝামেলার কাজ?

বিস্ময়ে জাভেদ সাহেবের চোখ তখন কপালে! বললেন, আমাদের এই আন্তরিক কর্তব্যটুকুকেও আপনি ঝামেলা মনে করছেন? তাহলেই হয়েছে!

হেসে বললাম, রাগ করেছেন জাভেদ ভাই?

এমন করে আর কখনোই বলবেন না। চলুন, উপরে উঠা যাক। বলে তিনি আগে আগে এবং পেছনে আমরা হোটেলের নির্দিষ্ট রুমে এসে ঢুকি।

একটা পরিচ্ছন্ন রুম। সিঙ্গেল খাট, একটা টেবিল, টিপয়, সোফা, টেলিফোন সেট, মেঝেতে দামী কার্পেট– এক কথায় চমৎকার গুছানো একটা রুম। জাভেদ ভাই সোফায় বসতে বসতে বললেন, এখানকার সব আয়োজন করে দেবার জন্য হেড অফিস থেকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আমরা সাধ্যমতো করার চেষ্টা করেছি। আপনার যে কোন সমস্যার কথা আমাদের নিঃসঙ্কোচে বলবেন। কোন দ্বিধা করবেন না যেন।

আমি ব্রিফকেসটা রেখে বললাম, আপনাদের এই আন্তরিকতায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা আমার জানা নেই।

জাভেদ ভাই-ই আবার শুরু করলেন, আজ আপনার কেবলই বিশ্রাম। আগামীকাল আমাদের ব্যুরো অফিসটা একবার দেখে আসবেন। আপনার সফরের প্রয়োজনীয় উপকরণ, নির্দেশনা সেখানেই জানানো হবে। বাদ এশা ডিনারের জন্য শাকিল খানের গাড়ি এসে তার বাসায় নিয়ে যাবে আপনাকে।

শাকিল খান এবার বলে উঠলো, গাড়ি আগে অফিসে যাবে এবং আপনি ও এজাজ ভাইকে নিয়ে আমরা হোটেলে আসবো।

আমাকে কেন আবার?

জাভেদ ভাইয়ের প্রশ্ন শুনে অভিমানী সুরে শাকিল খান বলল, আপনি না গেলে হয় কি করে? তাছাড়া আপনাকে সাথে না নিয়ে গেলে বাসায় আমার জায়গা হবে না।

সকলেই একসঙ্গে হেসে উঠলাম। বাঙালিরা নাকি খুবই অতিথিপরায়ণ। এখন দেখি পাকিস্তানীরাও অতিথি সেবায় কম যায় না।

জাভেদ ভাই সিদ্ধান্ত দিয়ে বললেন, ঠিক আছে, তাহলে তোমাকে এখানে গাড়ি নিয়ে আসতে হবে না। এজাজ আর আমি অফিস থেকে এসে মাহমুদ সাহেবকে নিয়ে সোজা তোমার বাসায় চলে যাবো। হয়েছে এবার? এখন দেখো, এখানে কিছু জলযোগের ব্যবস্থা করা যায় কি না?

শাকিল খান বেরিয়ে গেলো এবং কিছুক্ষণ পরই ফিরে এসে আমাদের সাথে সোফায় বসলো। জাভেদ ভাইকে জিজ্ঞেস করলাম, আমার কাশ্মীর যাওয়া হচ্ছে কবে?

সব কিছু ঠিক থাকলে পরশুই আপনাকে রওয়ানা হতে হবে।

ঠিক না থাকার আশংকা কেন, একটু বুঝিয়ে বললে ভালো হয়। আসলে আমি কিভাবে যাত্রা শুরু করবো, কোন এলাকা ঘুরতে হবে তা পরিষ্কার কিছু বুঝতে পারছি না।

তিনি আমার কাঁধে আঙ্গুলের একটি টোকা দিয়ে বললেন, জানবে বন্ধু, সব কিছুই জানবে। এ সময় বেয়ারা এলো। এক হাতে চারটি চিকেন বিরিয়ানীর প্যাকেট অন্য হাতে মিনারেল ওয়াটারের বোতল। সালাম দিয়ে বললো, কোথায় রাখবো স্যার?

শাকিল খান উঠে এসে হাতে নিলো। তারপর প্রত্যেকের হাতে একটা করে প্যাকেট ধরিয়ে দিয়ে বললো, এভাবেই খেতে হবে।

জাভেদ ভাই আমার দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলেন, এভাবেই পারবেন না প্লেটের ব্যবস্থা করতে হবে?

বললাম, পারবো না কেন? প্লেটের ঝামেলার দরকার নেই।

শাকিল খান বেয়ারাকে বুঝিয়ে বললো খাওয়া শেষে এগুলো পরিষ্কার করে দিতে। বেয়ারা কাঁধ ঝাঁকিয়ে কুর্নিশের ভঙ্গি করে বেরিয়ে গেলো।

খেতে খেতে জাভেদ ভাইকে আবার প্রশ্ন করলাম আমার কাশ্মীর সফর সম্পর্কে। তিনি জানালেন, জাতিসংঘ অনুমোদিত একটি স্বেচ্ছাসেবী মেডিক্যাল টিমের সাথে আমাকে যেতে হবে। কারণ সাংবাদিক পরিচয়ে কারগিলের তথ্য তালাশে গোলযোগপূর্ণ অঞ্চলে ঘুরে বেড়ানো মোটেও নিরাপদ নয়। কেননা, কারগিল ও দ্রাস অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ভারতীয় বাহিনী ক্ষ্যাপা কুকুরের মতো হয়ে গেছে। যে কোন সংবাদ সংস্থারই মুসলিম সাংবাদিকদের তারা অন্য চোখে দেখে। অন্যান্য সংবাদ সংস্থা মূলত তাদের দেয়া এবং মুজাহিদ পক্ষের তথ্য কেন্দ্রের দেয়া তথ্যমতেই সংবাদ পরিবেশন করে। ভারতীয়দের পক্ষে যারা কাজ করে মূলত তারাই তাদের নিয়ন্ত্রণে সরেজমিনে যেতে পারে। তাই এ ধরনের চেষ্টা করা বৃথা। আমাদের সংবাদ সংস্থা আইবিএ'র নাম শুনলে সোজা বন্দি অথবা বুলেটের শিকার হতে হবে।

আমি সোজা হয়ে বসলাম। বললাম, তাহলে উপায়?

সে ব্যবস্থার কথাই তো বলছি। ওই মেডিক্যাল টিমের সাথে তাদের আইডেন্টিটিতে যেতে হবে। কোন অবস্থাতেই সেখানে সাংবাদিক পরিচয় দেয়া যাবে না। এমনকি আপনার আইডি কার্ড রেখে দিয়ে ওদের ইস্যুকৃত আইডি কার্ড সঙ্গে নিতে হবে। ওদের সাথে সব ব্যবস্থা পাকাপাকি করেছেন স্বয়ং

আইবিএ'র চেয়ারম্যান। অফিসে গিয়ে একটি ছবি জমা দিলেই তাদের আইডি কার্ড দিয়ে তাদের একজন করে নেবে আপনাকে। আগামীকাল আমাদের অফিস থেকে টেলিফোন করিয়ে দেবো আপনাকে। বাকি সব ব্যবস্থা করা আছে। ওই টিমে থাকছে দু'জন স্পেশালিস্ট ডাক্তার, একজন শিক্ষানবীশ ও দু'জন এটেনডেন্ট। এটেনডেন্টদের একজন সাজবেন আপনি।

তারা এ প্রস্তাবে রাজি হলো?

হ্যাঁ, তারা এমনিতেই যুদ্ধাহত মুজাহিদদের চিকিৎসার্থ মুজাহিদ নিয়ন্ত্রিত কারগিলের পাদদেশে অস্থায়ী মেডিক্যাল ক্যাম্পে চিকিৎসাসেবা প্রদান করতে যেতে চাচ্ছে। আমাদের চেয়ারম্যান বলে-কয়ে রাজি করিয়েছেন। সম্ভবত তাদের একটা ডোনেশনও দিয়েছেন উৎসাহিত করার জন্য।

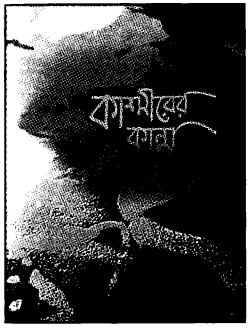
ততক্ষণে খাওয়া দাওয়া শেষ হয়েছে। বেয়ারা এসে সব পরিষ্কার করে দিয়ে গেছে। বেয়ারাকে জাভেদ ভাই কিছু বখশিশ দিয়ে আমাকে দেখিয়ে বললেন, উনি আমাদের দেশের মেহমান। সব সময় খোঁজ খবর রাখবে। যখন যা দরকার হয় করে দেবে।

বেয়ারা ঘাড় কাত করে সালাম জানিয়ে বললো, অবশ্যই স্যার, আপনি না বললেও এটা আমার ডিউটি।

জাভেদ ভাই উঠে বললেন, মি. মাহমুদ, আমরা এখন উঠি। আপনি বিশ্রাম নিন। রাতের প্রোগ্রাম তো শুনলেন। সফর নিয়ে কোন চিন্তা করবেন না। আমরা সব গুছিয়ে দেবো।

মৃদু হেসে বললাম, আচ্ছা! আল্লাহ হাফেজ!

আল্লাহ হাফেজ বলে তাঁরাও বেরিয়ে গেলেন। ঘড়িতে তাকিয়ে দেখি দুইটা বেজে গেছে। জোহরের নামায পড়া হয়নি এখনও। ওযু করে নামায পড়ে নিলাম। তারপর বিশ্রামের জন্য বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে কাশ্মীর সফরের চিন্তা করতে করতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়লাম।



তিন

আইবিএ'র ইসলামাবাদ ব্যুরো অফিসটি সত্যিই বেশ সুন্দর। গোছানো শান্ত পরিবেশের এমন ছোট অফিস ঢাকায় খুব কমই চোখে পড়ে। তিন রুমের একটা ফ্ল্যাট। একটা বিশ্রাম কক্ষ। তাতে মাঝারি সাইজের একটা খাট পাতা। এ রুমটি একটু ভেতরে। দ্বিতীয় রুমটি মূল অফিস। একখানা বড় টেবিল। চেয়ারের বাম পাশে ইন্টারনেট সংযোগসহ একটি কম্পিউটার। পাশেই লেজার এবং ইমেজ প্রিন্টার। ডান দিকে টেলিফোন সেট। এখানে বসেন জাভেদ ভাই। স্বচ্ছ কাচের বিশাল একটি জানালা টেবিলের পাশের দেয়ালে। গ্রিলের সামনে সুন্দর করে পর্দা টানানো। বিশাল দুটি বুকশেলফ ভর্তি বই পুস্তক। নিচে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার স্তূপ। একেবারে সামনের রুমটিতে বসেন এজাজ আহমদ। তাঁর টেবিলেও টেলিফোন সেট এবং ফ্যাক্স মেশিন। একটি কম্পিউটার, তবে কোন প্রিন্টার নেই। মনিটর এবং হার্ডডিস্কের সাথে পাশের রুমের লেজার ও ইমেজ প্রিন্টারের সংযোগ আছে। এখানেও দুটি বড় বুকশেলফ ভর্তি বই-পুস্তক। তার সামনে ভিজিটরদের জন্য সোফা বসানো। জাভেদ ভাই ও এজাজ আহমদের রুম দুটি বিশাল কাচের দেয়াল দিয়ে পৃথক করা। অফিসের সামনে রেলিং দেয়া সুন্দর বারান্দা। তিন চারটি ফুলের টব। যে কোন রুচিশীল মানুষের এই অফিসটি পছন্দ হবে। ঢাকায় যদি সত্যিই ব্যুরো অফিস খোলা হয়, তাহলে এমন পরিচ্ছন্ন একটি অফিস যেন করতে পারি মনে মনে তাই ভাবছি।

সকাল দশটায় এসেছি অফিসে। এখন বাজে দেড়টা। প্রায় বিশ মিনিট টেলিফোনে কথা হলো আইবিএ'র চেয়ারম্যান শেখ ওমর বিন সুহাইলের সাথে। আরবী তো তাঁর মাতৃভাষা। ইংরেজি এবং উর্দুতেও সমান দক্ষ। আমিও তাঁর

সাথে সাথে উর্দু-ইংরেজি দু'ভাষায়ই কথা বলেছি। তাঁর সাথে আজকের আলোচনার পর মনটা খুশিতে ভরে উঠলো। সত্যিই তো ইসলাম ও মুসলমানদের পক্ষে কোন শক্তিশালী আন্তর্জাতিক মিডিয়া এখনো গড়ে ওঠেনি।

শেখ ওমর বিন সুহাইল এক সউদী ধনকুবেরের ছেলে। জার্নালিজমে মাস্টার্স করেছেন। এছাড়া তিনি গাজীপুর আইআইটি থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে গেছেন। আয়-রোজগারের চিন্তা করতে হয়নি। তাই জ্ঞানসাগরে ডুবে ছিলেন দীর্ঘ সময়। বিভিন্ন দেশ সফর করে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন, তাতে তিনি এ সত্যটি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন যে, বর্তমানে গোটা বিশ্বের মিডিয়া জগতে সর্বোচ্চ দখলদারিত্ব চালিয়ে যাচ্ছে ইহুদী-খৃষ্টান শক্তি। তাদের মিডিয়া বলয়ের চাপে পড়ে ইসলাম ও মুসলমানরা আজ জগদ্বাসীর চোখে সন্ত্রাসী, মৌলবাদী, একটি অনৈতিক প্রাচীন চিন্তাধারার অধিকারী হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে। অথচ ইসলাম যে একটি সত্য-সুন্দর ন্যায়নিষ্ঠ গতিশীল আধুনিক জীবন ব্যবস্থার নাম, তা যেন মুসলমানরাও ভুলতে বসেছে। তাই এই কপট ও স্বার্থবাদী তথ্যপ্রবাহ তথা তথ্য সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে মুসলমানদের পক্ষে এমনই একটি আধুনিক মিডিয়া গড়ে তোলা অপরিহার্য। ওদের তথ্য সন্ত্রাসের জোয়ারের বিপরীতে ন্যায় ও সত্যসন্ধানী তথ্যপ্রবাহের দেয়াল তুলে দিতে হবে।

পঁয়ত্রিশোর্ধ্ব এই যুবকের প্রতিটা কথা তখনও আমার কানে অনুরণিত হচ্ছিল। তাঁর কথায় পরিষ্কার আমি বুঝতে পেরেছি, আইবিএ প্রতিষ্ঠানটি তাঁর বিশাল স্বপ্নের প্রথম ধাপ মাত্র। একটি টেলিভিশন চ্যানেল খোলারও ইচ্ছা তাঁর রয়েছে। তিনি পরিষ্কার ভাষায় আমাকে একটা কথা বলেছেন, ময়দানে অস্ত্রের জেহাদের চেয়ে কৌশল ও কলমের জেহাদের বড় প্রয়োজন এই সময়ে। আমরা প্রতিটি সদস্য যেন জেহাদ মনে করে ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থে আমাদের কলমের খেদমত পেশ করি। আল্লাহ আমাদের এই নেক আশা পূরণ করার তওফিক দিন।

আমি কিছুটা আনমনা হয়ে পড়েছিলাম। আমি কোথায় বসে, তা যেন ভুলেই গিয়েছিলাম। জাভেদ ভাই আঙ্গুলে মৃদু টোকা মেরে আমার সম্বিত ফিরিয়ে আনেন। হ্যালো, মি. মাহমুদ! কী ভাবছেন এমন তন্ময় হয়ে?

একটু যেন কেঁপে ওঠলাম জাভেদ ভাইয়ের ডাক ও হাতের ছোঁয়ায়। মৃদু হেসে জবাব দিলাম, না, কিছু না।

কিছু একটা তো ভাবছিলেনই! থাক, না বলতে চাইলে। আপনার সফর সম্পর্কে কিছু মশওয়ারা করা যাক।

হ্যাঁ, তা তো করতেই হবে। জাভেদ ভাই! হৃদয়ের গভীর থেকে যেন আওয়াজটা বেরিয়ে এলো।

চমকে ওঠে তাকালেন জাভেদ ভাই আমার দিকে। কি?

নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে বললাম, জাভেদ ভাই! চেয়ারম্যানের সাথে কথা বলার পর আমি নিজেকে বেশ গর্বিত মনে করছি। মিডলইস্টের একজন ধনকুবেরের মাথায় এমন চিন্তাটা আসা মুসলমানদের জন্য আল্লাহর একটা রহমতই বলা যায়। এতদিন নেশার ঘোরে স্রেফ সাংবাদিকতার জন্যই কাজ করেছি। শখের বশেই ইউনির্ভাসিটিতে এই সাবজেক্টে ভর্তি হয়েছিলাম। এখন দেখছি আমার চেষ্টা সত্যিই সার্থক হয়েছে। সাংবাদিকতা যে নিছক একটা কর্মই শুধু নয়, এটা যে একটি মিশনও হতে পারে, তা জানা থাকলেও এতদিন বুঝতে পারিনি। স্যাররা লেকচারে এসব কথা বহুদিন বলেছেন। তবে তা তাদের বিশ্বাস ও উপলব্ধির আঙ্গিকে। আজ যেন আমি নতুন সবক নিলাম শেখ ওমর বিন সুহাইলের কাছ থেকে। আমার মনে হচ্ছে আজ আমি নিছক একজন সাংবাদিকই শুধু নই, আমি একজন মুজাহিদ। তথ্য সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আমি লড়াই করতে জেহাদে নাম লিখিয়েছি।

ধন্যবাদ মি. মাহমুদ, আপনার উপলব্ধির জন্য। একদিন খোলামেলা কথা বলেই আপনি অবাক হচ্ছেন, দেখবেন আমরা যা ভাবি তার চেয়েও উনি অনেক বেশি। ঢাকায় কিন্তু উনি বেশ কয়েক বছর কাটিয়েছেন। বাংলায় কিছু বলেছেন কি?

বাংলা বলেননি, ইংরেজি ও উর্দুতেই কথা বলেছি আমি। তিনিও তাই বলেছেন।

প্রচুর অভিজ্ঞতা তিনি এর মধ্যে সঞ্চয় করেছেন। মুসলিম মিল্লাতের বিরাট খেদমত তিনি আঞ্জাম দিতে পারবেন বলে আমার বিশ্বাস।

সত্যিই তাই, আল্লাহ তাঁকে বৃহৎ কিছু করার জন্যই দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন।

আচ্ছা, আপনার কাশ্মীর সফর সম্পর্কে তিনি কি সাজেশান দিলেন?

সাজেশান যা দেবার সবই আপনি দেবেন বলেছেন। বলা যায়, এ সম্পর্কে তাঁর সাথে তেমন কোন কথাই হয়নি। শুধু বললেন, এ ব্যাপারে আপনার সাজেশান মেনে নিতে। তবে হ্যাঁ, একটা কথা তিনি বলেছেন বৈকি! আমার চোখে কৌতুক ফুটে ওঠলো। জাভেদ ভাই কৌতূহলে উচ্ছ্বসিত হয়ে জানতে চাইলেন, কি সেটা?

কাশ্মীরে প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে আপনি যে আমার নাম প্রস্তাব করেছিলেন সেটা।

হো হো করে হেসে ওঠলেন জাভেদ ভাই। ও এই কথা! তাছাড়া কি উপায় ছিল বলুন? পাকিস্তান থেকে প্রতিনিধি প্রেরণের তো প্রশ্নই ওঠে না। ভারতে একজন প্রতিনিধি আমাদের আছে, কিন্তু একই কারণে তাকেও এসাইনমেন্টটা দেয়া

যাচ্ছে না। চেয়ারম্যান বললেন একজন বিদেশী নির্বাচন করতে। বিশ্বের সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে সত্য ও বস্তুনিষ্ঠতার জন্য বিদেশী প্রতিনিধিকে দিয়ে কাজ করানোই যুক্তিযুক্ত মনে করেছেন তিনি। তাই প্রথমেই আপনার নামটা মুখে এসে যায়।

আপনার এ মেহেরবানী মনে থাকবে বহুদিন।

জাভেদ ভাই সলজ্জ হাসি হেসে বললেন, আপনার কাশ্মীর সফর দুই থেকে তিন সপ্তাহের। আসলে কারগিল ও দ্রাস, যেখানে বর্তমানে লড়াই চলছে– এ দুটি অঞ্চলের যে কোন একটি এলাকা ঘুরে আসলেই চলবে। আপনার ভিসা তো তিন মাসের, তাই না?

: জি।

তাহলে ভালোই হলো। এপ্রিলের ফার্স্ট উইকে ইসলামাবাদে যে ওয়ার্কশপ হচ্ছে, তাতে যোগদানের জন্য কাশ্মীর সফর শেষ করে বাকি সময় এখানেই কাটিয়ে দিতে পারবেন। ঢাকায় বার বার যাওয়া আসা করার দরকার হবে না।

এখনও তো এক মাস দেরি। আজ মার্চের কেবল পাঁচ তারিখ। তাছাড়া চেয়ারম্যান সাহেব কি তা মানবেন?

কেন মানবেন না! ঢাকায় তো আপনার এসিস্টেন্ট রয়েছেই। কাশ্মীরে যদি তিন সপ্তাহই লেগে যায় তাহলে কয়দিনই বা আর থাকতে হবে? আমি চেয়ারম্যানকে জানাবো বিষয়টা।

: যথা আজ্ঞা, বলে হাসলাম আমি।

এ সময় জাভেদ ভাই ছোট ছোট কয়েকটি ইলেক্ট্রনিক যন্ত্র বের করলেন। তার মধ্যে আছে সিগারেটের প্যাকেট আকৃতির একটি ডিজিটাল ভিডিও ক্যামেরা, যার মাধ্যমে আলোকচিত্রও ধারণ করা যায়। একটি টেপ রেকর্ডার, আকৃতি প্রায় সমান। অতিরিক্ত স্টিল ক্যামেরাসহ বেশ কয়েকটি অডিও ভিডিও ফিল্ম, বেশ কিছু পেন্সিল ব্যাটারি এবং আড়াই গিগা হার্ডজের একটি পেন ড্রাইভ।

জিনিসগুলো অত্যাধুনিক। এর আগে এগুলোর ব্যবহার তো দূরের কথা, দেখিইনি। সাধারণত ঢাকায় পাওয়া যায় এমন একটি টেপ রেকর্ডার ও সাধারণ ক্যামেরা আমার আছে। এগুলো নিজের টাকায় ঢাকাতে কিনেছিলাম। পরে এর জন্য অফিস থেকে বিল পেলেও নতুন করে কেনার প্রয়োজন পড়েনি। আমি এগুলো সঙ্গে নিয়ে আসতাম, কিন্তু টেলিফোনে জাভেদ ভাই আগেই নিষেধ করেছিলেন বলে আনা হয়নি। এখন বুঝলাম কেন মানা করেছিলেন তিনি।

জাভেদ ভাই জিনিসগুলো টেবিলের উপর সাজিয়ে রেখে এর ব্যবহার হাতে ধরে ধরে শেখালেন। তারপর ব্যাটারি ভরে অন করতে বললেন। আমি অবাক হয়ে দেখলাম মার্বেলের মতো ছোট চাকার যে লেন্স ও জুম ক্যামেরাতে বসানো তা

ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে প্রায় এক মাইল দূরের জিনিসও কাছে নিয়ে আসা যায় অনায়াসে।

জাভেদ ভাইয়ের নির্দেশে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম। তারপর শাহাদাত আঙ্গুল নির্দেশ করে বললেন, ওই দিকে দেখুন তো কোন্ পর্যন্ত ছবি এরিয়ায় আসে?

চোখের সামনে মেলে ধরে আস্তে আস্তে ক্যামেরার জুম ঘুরাতে লাগলাম। দেখি এখান থেকে বিমানবন্দর স্পষ্ট দেখা যায়। চোখ থেকে ক্যামেরাটি নামিয়ে জাভেদ ভাইকে বললাম, আপনাদের এয়ারপোর্টের ছবি এখান থেকে দিব্যি তোলা যাবে।

ঠিক আছে, আপনি বেশ পারবেন বলে মনে হচ্ছে। তবু জাস্ট এক্সপেরিমেন্ট হিসেবে আজকে এজাজদের বাসার লাঞ্চের প্রোগ্রামটা আপনি নিজের হাতে সবাক ভিডিও করবেন। এই এক্সটা ফিল্মটাও ভরে নিন।

বহুত আচ্ছা! বলে মুচকি হাসলাম। জাভেদ ভাইও আমার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন। পেছন ফিরে দেখি এজাজ ভাইও আমার পেছনে দাঁড়িয়ে। এবার এজাজ ভাই জাভেদ ভাইকে উদ্দেশ করে বললেন, দুটো কিন্তু বেজে গেল প্রায়। বাসার লোকজন আমাদের অপেক্ষায় বসে আছে। আপনাদের কি হয়েছে জাভেদ ভাই?

হ্যাঁ, হয়েছে। এখনই যাওয়া যাক, তবে নামাযটা এখানেই পড়ে যাওয়া উচিত। বললেন জাভেদ ভাই।

এজাজ ভাইয়ের দিকে চেয়ে বললাম, এরই মধ্যে অনেক কিছু জানলাম-শিখলাম। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।

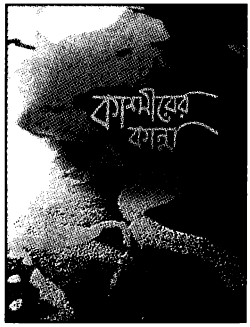
জবাবে এজাজ ভাই বললেন, এইটুকু আর কি শেখা, তবে এপ্রিলের ফার্স্ট উইকে চেয়ারম্যানের উপস্থিতিতে যে ওয়ার্কশপ হচ্ছে তাতে আশা করি শেখা যাবে অনেক কিছু। এতে দেশ-বিদেশের প্রায় সকল প্রতিনিধিই অংশ নেবেন।

নামাযের জন্য ঘরে প্রবেশ করতে করতে বললাম, এত সব অত্যাধুনিক ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতির খোঁজ পেলেন কোথায় আপনারা? সবই তো দেখি জাপানের তৈরি।

জাভেদ ভাই বললেন, খোঁজ আমরা পাইনি, এসব পাঠিয়েছেন চেয়ারম্যান স্বয়ং। এগুলোর মালিক আজ থেকে আপনি। আমাদের অফিসের জন্যও দুই সেট পাঠিয়েছেন আরও আগেই। যারা ডেলিভারি দিয়ে গেছেন তারাই ক্যাটালগ ছাড়াও এর ব্যবহার হাতে-কলমে দেখিয়ে গেছেন।

সত্যিই আমাদের চেয়ারম্যান একজন জিনিয়াস পারসন।

জাভেদ ভাই হেসে উঠে বললেন, ভুলে যাচ্ছেন কেন, আওয়ার চেয়ারম্যান ইজ নট অনলি এ গ্রেট জার্নালিস্ট, বাট অল সো ইঞ্জিনিয়ার।



চার

জাভেদ ভাই ঠিকই বলেছিলেন। এদের কাজকর্মে বেশ সিনসিয়ারিটি আছে, বাংলাদেশের সরকারি অফিসগুলোতে যা কল্পনাও করা যায় না। পাসপোর্ট, ভিসা, বিমানের টিকিট এসব নিয়েই যা তিক্ত অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে, তাতে মনে হয়েছে দেশে শতকরা একজন সৎমানুষও খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি প্রবেশ করেছে। নীতি-নৈতিকতা যেন ভুলে বসেছে সবাই। এ অবস্থায় একটি জাতির ভবিষ্যৎ যে কত অন্ধকার তা ভাবাই যায় না। কোন একটা অফিসেও ঘুষ ছাড়া কাজ করা যায় না। বিশেষ করে সরকারি অফিসে। নগদ নারায়ণ ছাড়া একটা স্লিপও এক টেবিল থেকে আরেক টেবিলে সরে না। সরকারি কর্তারা নগদ নারায়ণের বিনিময়েও যদি কোন একটা কাজ করে দেন তো মনে হবে ক্লায়েন্টকে যেন তিনি করুণা করছেন। দায়িত্ববোধ বা সেবার মানসিকতা তো নেই-ই আমাদের দেশে।

আমার সাথে জাভেদ ভাইয়ের অফিসে আসার কথা ছিল। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেশের সম্পাদক ও সিনিয়র সাংবাদিকদের একটা বৈঠক থাকায় তিনি আসতে পারেননি। অবশ্য সেবা সংস্থার হেড অফিসে টেলিফোনে কথা বলে সব ব্যবস্থা পাকা করে দিয়েছেন। বেলা এগারটায় কাশ্মীরের উদ্দেশে যাত্রা করা হবে। আমাকে আসতে বলা হয়েছে সকাল নয়টায়। আসতে পাঁচ মিনিট লেট হয়েছে। অবশ্য এখানে তেমন কোন কাজ নেই। স্রেফ একটা আইডি কার্ড তৈরি করা।

ফার্স্ট ফ্লোরের সতের নম্বর কক্ষ। দরজা আনলক, দামি পর্দা ঝুলছে। পর্দা ঈষৎ ফাঁক করে ভেতরে দৃষ্টি দিলাম। একজন শ্বেতাঙ্গী তরুণী বসা। দৃষ্টি একটা খোলা ফাইলে। ডান হাতে কলম ধরে ঠোঁটে ঠেকিয়ে রেখেছে।

মে আই কাম ইন...! কথা শেষ না হতেই তরুণী মুখ না তুলেই বলল, ইয়েস, কাম ইন!

আমি গিয়ে টেবিলের সামনে দাঁড়ালাম। এবার মুখ তুলল তরুণী। ওয়েলকাম, প্লিজ, সিটডাউন।

: থ্যাঙ্ক ইউ! আই অ্যাম মাহমুদ হাসান!

ও, মি. মাহমুদ হাসান, এ গ্রেট জার্নালিস্ট ফ্রম ঢাকা! তরুণী যেন বিস্মিত চোখে তাকালো ফের আমার দিকে। আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম তরুণীর কপালে কটি ভাঁজ পড়েছে। কেন যেন কিছুটা নার্ভাস ফিল করি। ইংরেজিতেই বললাম, প্রফেশনালি জার্নালিস্ট বটে, তবে এখনও গ্রেট হতে পারিনি।

মেয়েটি এবার সহজ ভঙ্গিতে হাসলো। তারপর বললো, আমি মিস এলিয়েদা। আমেরিকান, মেডিকেলে সার্জারিতে পড়াশোনা করে ইন্টার্নী শেষ করেছি। ভলান্টিয়ার সার্ভিস হিসেবে এ সংস্থায় ছয় মাস শ্রম দেবার ইচ্ছায় যোগ দিয়েছি। জাতিসংঘ অনুমোদিত আন্তর্জাতিক এই সেবা সংস্থায় কিছুদিন শ্রম দিলে ক্যারিয়ারে একটি বিশাল সঞ্চয় হবে। এর আগে বসনিয়ায় ছিলাম কিছুদিন। এখন এশিয়ায়। সফরটাও কিন্তু কম অভিজ্ঞতার নয়, ইন্টারেস্টিংও। কি বলেন?

মনে মনে বললাম, কিন্তু কথা একটু বেশিই বলো মনে হচ্ছে। মুখে বললাম, তা ঠিক।

তরুণী বললো, তা বলুন, আপনার জন্য কি করতে পারি?

আমার একটি আইডি কার্ড করার কথা, তা...

এবারও কথা শেষ হবার আগেই বলে ওঠলো, হ্যাঁ হ্যাঁ, কই ছবি এনেছেন?

আমি ছবি বের করে দিলাম। ছবি হাতে নিয়ে কলিং বেল চাপলো। সঙ্গে সঙ্গে পিয়ন এসে হাজির। ড্রয়ার খুলে কার্ডের সাথে ছবিটা সুন্দর করে পেস্ট করে পিয়নের হাতে দিয়ে বললো, শোন, এটা বিশ মিনিটের মধ্যে লেমিনেটিং করে নিয়ে এসো। পিয়ন কার্ড হাতে নিয়ে চলে যাচ্ছিল, পেছন থেকে আবার ডেকে আনলো। তারপর আমার দিকে চেয়ে বললো, ব্রেকফাস্ট হয়েছে নিশ্চয়ই। তা কি খাবেন, কফি না চা?

বললাম, নো থ্যাঙ্কস! এসবের দরকার নেই।

ফর্মালিটি করবেন না, আপনাদের এ অঞ্চলের মানুষদের বাড়াবাড়ি রকমের ফর্মালিটি আমার একদম পছন্দ নয়।

হেসে ফেললাম কথা শুনে। বললাম, স্রেফ চা খাওয়া যেতে পারে।

পিয়নকে দু'কাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে বিদায় করলে বললাম, এক্সকিউজ মি, আমাদের এ অঞ্চলের আর কি কি আপনার অপছন্দ বলবেন কি?

ডা. এলিয়েদা এবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাকে পরখ করতে লাগলো। বলল, তা জেনে আপনার লাভ?

লাভ-লোকসান কিছু নেই। তবে সম্ভবত কাশ্মীর সফরে আপনিও আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন। জানা থাকলে হয়তো আপনার অপছন্দের বিষয়গুলো এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করতাম। এমনিতেই যাচ্ছি একটা গোলযোগপূর্ণ এলাকায়। এর মধ্যে যদি আপনার সাথে রাফ বিহেভ করে বসি তো অতিষ্ঠ হয়ে ওঠবেন।

প্রথমত কথা হচ্ছে, আমি আপনাদের সাথে যাচ্ছি না; বরং আপনি আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন। আর রাফ বিহেভ করার সুযোগ আপনি পাচ্ছেন কোথায়? আমরা থাকবো হাসপাতালে আর আপনি থাকবেন সংবাদ সংগ্রহের ধান্ধায়। কিন্তু মশাই, সাংবাদিক হয়ে সোশ্যাল ওয়ার্কার হিসেবে যাচ্ছেন, ডেজিগনেশানটা দেখেছেন তো? এসিস্টেন্ট সোশ্যাল ওয়ার্কার। আত্মসম্মানে লাগছে না?

না, কারণ সেবাই হচ্ছে মানবতার বড় ধর্ম। সেই অর্থে সোশ্যাল ওয়ার্কার হওয়া গর্বের, হীনমন্যতার নয়। তাছাড়া কিভাবে কি পরিচয়ে সেখানে আমি যাচ্ছি সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা হচ্ছে আমি আমার উদ্দেশ্য হাসিল করতে পারলাম কিনা!

গুড, বেশ ধার্মিক বুঝি আপনি? এই ফান্ডামেন্টালিস্ট মানসিকতা দূর করতে পারলে এই অঞ্চলের মানুষের মুক্তি আসতে পারতো।

এত সহজে রায় দিয়ে ফেললেন ম্যাডাম! আমাদের অঞ্চলটা খুব বুঝি অশান্ত?

তা নয় তো কি? এই যে কাশ্মীরের চলমান সংঘাত, এটাও তো উগ্র সাম্প্রদায়িকতারই রেজাল্ট। আপনি কি তা অস্বীকার করবেন?

আলবৎ অস্বীকার করবো।

এ সময় বেয়ারা দু'কাপ চা দিয়ে যায়। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললাম, ম্যাডাম! আপনি যেসব বিষয় নিয়ে কথা তুলেছেন এ সম্পর্কে আপনাকে বাস্তব ধারণা দিতে হলে অনেক দীর্ঘ সময় নিয়ে কথা বলতে হবে। তার আগে কিছু মনে না করলে আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই?

বলুন, কি প্রশ্ন আপনার?

আপনি কি স্রষ্টাকে স্বীকার করেন?

মুখটা হঠাৎ আমসি হয়ে গেলো ডা. এলিয়েদার। কিছুটা ভয় পেয়ে গেলো নাকি? গম্ভীর হয়ে বললো, আমার স্রষ্টাকে স্বীকার করা না করার সাথে কি এ আলোচনার কোন সম্পর্ক আছে?

তা তো কিছুটা আছেই। ঠিক আছে, আপনি বলতে না চাইলে থাক। তবে কাশ্মীরের সংঘাত সম্পর্কে আপনি জানতে চাইলে ইতিহাসের পাতা থেকে দু'চারটি সত্য আপনাকে শুনাতে পারি।

বলুন না শুনি। আসলে কাশ্মীর এবং এ অঞ্চল সম্পর্কে কিছুটা জানার জন্যই আপনার সাথে এ খোঁচাখুঁচিটা করেছি।

তাহলে শুনুন! আজকের পাকিস্তান, ভারত, বাংলাদেশসহ প্রায় সমগ্র দক্ষিণ এশিয়া এক সময় মুসলমানদের অধীনে ছিল। হাজার বছরের মুসলিম শাসনামলে এ অঞ্চলের সকল শ্রেণীর মানুষ সুখে-শান্তিতেই ছিল। সভ্যতা এবং শিক্ষা সংস্কৃতির দিক থেকে পৃথিবীর যে কোন অঞ্চলের মানুষের তুলনায় এরা খুব একটা পিছিয়ে ছিল না। পদ্ধতিগত ত্রুটি ছাড়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিক থেকেও বিশ্ব সভ্যতা বিনির্মাণে এ অঞ্চলের মানুষের অবদান কম নয়। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশদের কোপানলে পড়ে একে একে আমাদের সবই হারাতে হয়। এক সময় ১৭৫৭ সালে ছলে বলে কৌশলে তারা আমাদের ভৌগোলিক সার্বভৌমত্বও গিলে বসে। ব্রাহ্মণ্যবাদী সাম্প্রদায়িক হিন্দুরা শাসন ক্ষমতা থেকে মুসলমানদের বিতাড়িত করতে তাদের হাজার বছরের জমে থাকা পুঞ্জীভূত হিংসার জ্বালা মেটায় এ সুযোগে। তারপর থেকে দেশপ্রেমিক মুসলমানরা প্রায় পৌনে দু'শ বছর সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়েছে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। এক পর্যায়ে হিন্দুরাও স্বাধীনতার মর্ম উপলব্ধি করে এ আন্দোলনে শরিক হয়। গোটা ভারতবর্ষ যখন স্বাধীনতার প্রশ্নে বজ্র নিনাদে ফেটে পড়ে, তখন বৃটিশরা পাততাড়ি গুটাতে বাধ্য হয়। চলে যাওয়ার সময় কথিত গণতন্ত্রের বাহানা তুলে সাম্প্রদায়িকতা উস্কে দিয়ে যায়। তারা স্বাধীনতা আন্দোলনের মুখে শাসন করতে যেয়ে এর আগে থেকেই সাম্প্রদায়িক বিষ ছড়িয়ে রেখেছিল। নইলে হয়তো আরও আগেই সংগ্রামী এ জনগোষ্ঠী দখলদার বৃটিশদের তাড়াতে পারতো। ফলে প্রায় দু'শ বছর ধরে বঞ্চিত-শোষিত মুসলিম জনগোষ্ঠী পৌত্তলিক সমাজব্যবস্থা মেনে নিতে না পেরে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র আবাসভূমি দাবি করে বসে। বৃটিশদের পরিচালনায় গণভোটের মাধ্যমে পাকিস্তান এবং হিন্দুস্থান নামের দুটি রাষ্ট্রের জন্ম

হয়। সেই হিসেবে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনসংখ্যা অধ্যুষিত আজকের কাশ্মীর পাকিস্তানের অংশ হওয়ার কথা। কিন্তু এখানকার ইতিহাস হিন্দুপ্রিয় বৃটিশদের কূটজালে আটকা পড়ে বেমালুম পাল্টে যায়।

আমার কথাগুলো যেনো গোগ্রাসে গিলছে ডা. এলিয়েদা। আমিও একটু দম নিলাম। ততক্ষণে চায়ের কাপ খালি হয়ে গেছে। এলিয়েদা চায়ের খালি কাপ টেবিলে নামিয়ে রেখে বললো, বলুন কেমন করে পাল্টে যায়?

এবার কাশ্মীর সম্পর্কে বলতে শুরু করলাম– জম্মু, কাশ্মীর ও উত্তর এলাকাসমূহ নিয়ে এই উপত্যকা ভূ-রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চুরাশি হাজার বর্গ মাইল বিস্তৃত উপত্যকায় বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় এক কোটি বিশ হাজার। অধিবাসীদের শতকরা পঁচাশি ভাগ মুসলিম। হিন্দু সম্প্রদায় এখানকার প্রথম সংখ্যালঘু শ্রেণী এবং দ্বিতীয় সংখ্যালঘু শ্রেণী শিখ সম্প্রদায়।

১৮৪৬ সালে বৃটিশ বেনিয়ারা পাঞ্জাবের অমৃতসরে বসে জম্মু ও কাশ্মীর উপত্যকার সংখ্যাগুরু মুসলমানের আবাসভূমি জনৈক পাঞ্জাবী গোলাব সিং ডোগরার হাতে মাত্র ৭৫ লাখ টাকার বিনিময়ে বিক্রি করে দেয়। শ্রীনগরের জনগণ দেশ বিক্রির এ ঘটনা মেনে নিতে না পেরে ডোগরা রাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। কিন্তু রাজশক্তি ও বৃটিশ সৈন্য মিলে সমবেত প্রচেষ্টায় সেই বিদ্রোহ দমন করে গোলাব সিংকে রাজক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করে। তারপর থেকে কাশ্মীরীরা স্বপ্ন দেখে আসছে, একদিন ভারত থেকে বৃটিশ শাসন অপসারিত হবে, নিষ্ঠুর ডোগরা রাজশক্তির অবসান হবে। স্বাধীন কাশ্মীরে তারা আবার স্বাধীনভাবে নিঃশ্বাস নিতে পারবে। ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশের মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি বাস্তবায়নের শর্তেই দেশ বিভাগ হয়েছিল। কথা ছিল, মুসলিম জনসংখ্যা অধ্যুষিত অঞ্চলগুলো নিয়ে গঠিত হবে মুসলমানদের স্বতন্ত্র আবাসভূমি Seperete Muslim Homeland Pakistan.

এখানে উল্লেখ্য, ভারত বিভাগের পূর্বে বৃটিশ শাসনের অধীনে ৫৬২টি দেশীয় করদরাজ্য ছিল, যারা বৃটিশ সরকারকে কিছু কর বা রাজস্ব দানের বিনিময়ে মোটামুটি স্বাধীনভাবেই রাজ্য শাসন করতো। দেশ বিভাগের সময়, ১৯৪৭ সালে ভারত শাসন আইনে তাদের সম্বন্ধে বলা হয়, ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্টের পর দেশীয় রাজ্যগুলোর উপর থেকে বৃটিশ নিয়ন্ত্রণ অবসান হলে রাজ্যগুলো স্বীয় ইচ্ছামত ভারত অথবা পাকিস্তান ডোমেনিয়নে যোগ দিতে অথবা স্বাধীন থাকতে পারবে। অথচ তৎকালীন কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এবং স্বয়ং ভাইসরয় মাউন্ট ব্যাটেনের ষড়যন্ত্র এবং গোপন চক্রান্ত স্বাধীনতা আইনের এই নীতিটিকে কার্যকর হতে দেয়নি।

দেশ বিভাগের নীতি সততার সাথে অনুসৃত হলে জম্মু ও কাশ্মীর পাকিস্তানের অঙ্গীভূত হওয়া উচিত ছিল এবং সে ক্ষেত্রে কাশ্মীর সমস্যা বলে কোন সমস্যাই সৃষ্টি হতো না। অতএব কাশ্মীর সমস্যা ভারতীয় শাসকদের আধিপত্যবাদী নীতি এবং পররাজ্য লোভেরই ফসল।

এখন আপনাকে ভারতের সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের সামান্য একটি উদাহরণ দিচ্ছি। হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ জুনাগড় রাজ্যের শাসক ছিলেন মুসলমান। তিনি পাকিস্তানে যোগদানের কথা ঘোষণা করলে ভারতীয় নেতৃবর্গ হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল পাকিস্তানে যোগদানের ঘোষণা দেশ বিভাগ নীতির বরখেলাপ আখ্যা দিয়ে চেঁচামেচি করে সেনাশক্তি বলে জুনাগড় দখল করে নেয়। অপরদিকে তার মাত্র দু'মাস পরই পঁচাশি ভাগ মুসলিম জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত জম্মু-কাশ্মীরের হিন্দু রাজা হরি সিং যখন ভারতে যোগদানের কথা ঘোষণা করলো, তখন সেটা দেশ বিভাগ নীতির বরখেলাপ হলো না। ভারতীয় নেতারা হরি সিং-এর ভারতভুক্তি ঘোষণাকেই সমর্থন জানালেন। এমনকি রাজা হরি সিং-এর এই বেআইনী ঘোষণায় জনগণ যখন প্রতিবাদমুখর হলো, তখন ভারত তলে তলে রাজার পক্ষ নিয়ে প্রজা পীড়নে হরি সিংকে উৎসাহিত ও সহায়তা করলো।

রাজা হরি সিং-এর ভারতভুক্তির আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিবাদ-আন্দোলন ক্রমান্বয়ে প্রতিরোধ আন্দোলনে রূপ নেয়। গিলগিট এজেন্সির জনগণ পাকিস্তানের সঙ্গে তাদের একাত্মতা ঘোষণা করে। একই সাথে পুঞ্চ এবং মীরপুর জেলার জনগণের সাথে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসরপ্রাপ্ত ষাট হাজার সৈনিক একত্রিত হয়ে মহারাজা হরি সিং-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে আযাদ জম্মু কাশ্মীরের ঘোষণা দেয়। মহারাজাও তার বাহিনী নিয়ে নিষ্ঠুরভাবে স্বাধীনতাকামী জনগণকে দমনে উঠে পড়ে লাগে। শুরু হয় আসল লড়াই। ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের উস্কানিতে এবং হরি সিং ডোগরার প্রত্যক্ষ মদদে কাশ্মীরী পুলিশ এবং শিখরা মিলে প্রায় দুই লাখ কাশ্মীরী মুসলমানকে গুম অথবা হত্যা করে।

ডোগরা হরি সিং-এর নিষ্ঠুরতা এখানেই থেমে থাকেনি। ওই বছরই হরি সিং ঘোষণা দেয়, যারা পাকিস্তান চলে যেতে চায় তাদের জন্য ৬ নভেম্বর বাস প্রস্তুত থাকবে। ৬ নভেম্বর পঁচিশটি বাসভর্তি কাশ্মীরী মুসলমান নর-নারী বৃদ্ধ-শিশু পাকিস্তান যাওয়ার আশা নিয়ে বাসে চড়ে রওয়ানা হয়। পথে সামবা নামক সড়কে বাসগুলো পৌঁছানোর পর ডোগরা রাজার ঘাতক বাহিনী বাসগুলোকে চারদিক থেকে ঘিরে বৃষ্টির মতো গুলিবর্ষণ করে নির্মমভাবে সকল বাসযাত্রীকে হত্যা করে। পরের দিন আরও পঁয়ত্রিশটি বাসভর্তি মুসলমান যাত্রীদের একই

পন্থায় হত্যা করা হয়। কাশ্মীরীরা ৬ নভেম্বরকে আজও কালো দিবস হিসেবে পালন করে থাকে। এসব নির্মম ঘটনায় ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে বহু কাশ্মীরী মুসলমান সীমান্ত অতিক্রম করে পাকিস্তানে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। তাদের মুখে নির্দয়-নির্মম লোমহর্ষক হত্যাযজ্ঞের কাহিনী শুনে সীমান্ত প্রদেশের মুসলমানরা স্বজাতির পক্ষে হিন্দু রাজার বিরুদ্ধে জেহাদের উদ্দেশে দলে দলে জম্মু-কাশ্মীরে প্রবেশ করলে মুসলমান মুজাহিদদের ভয়ে রাজা হরি সিং ভারতের সাহায্য প্রার্থনা করে। ভারত যেন এই সুযোগের অপেক্ষায়ই ছিল। তারা আন্তর্জাতিক সকল নিয়ম-কানুন লংঘন করে জম্মু-কাশ্মীরে সেনাবাহিনী ঢুকিয়ে দেয়।

জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে এই বেআইনী সৈন্য সমাবেশের ঘটনা থেকে পৃথিবীর দৃষ্টি বিভ্রম ঘটানোর জন্য ভারত প্রতারণামূলকভাবে রাজা হরি সিং-এর ভারতভুক্তির মিথ্যা পত্রের কথা প্রচার করতে থাকে।[১] সেই সাথে প্রচার করে যে, ভারত সরকারের নীতি হলো, কোন রাজ্যের ভারতভুক্তি নিয়ে জনগণের মাঝে বিতর্কের উদ্ভব হলে সেই রাজ্যের জনগণের ইচ্ছানুসারেই সমাধান করা হবে।

১৯৪৭ সালের পহেলা নভেম্বর বিশ্ববাসীকে ধোকা দেবার জন্য চালাকি হিসেবে কাশ্মীরে গণভোটের প্রস্তাব নিয়ে মাউন্ট ব্যাটেন পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর কাছে যান। মাউন্ট ব্যাটেনের প্রস্তাব শুনে জিন্নাহ বললেন, 'কাশ্মীরে ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং ভারতপন্থী শেখ আবদুল্লাহ ক্ষমতায় থাকলে সেখানকার অধিবাসীরা নির্ভয়ে ভোট দিতে পারবে না।'

এ সময় কাশ্মীরবাসীর প্রবল প্রতিরোধ-সংগ্রামে টিকতে না পেরে এই লড়াইয়ের দায় দায়িত্ব পাকিস্তানের ঘাড়ে চাপিয়ে ভারত নিজেই কাশ্মীরকে Deputed area বর্ণনা করে ইউএন সিকিউরিটি কাউন্সিলে এক অভিযোগ দাখিল করলে পাকিস্ত

---

[১] ১৯৪৭ সালের ১৭ জুন জওহরলাল নেহেরু লুইস মাউন্ট ব্যাটেনকে কাশ্মীর বিষয়ে এক গোপন চিঠি লিখে তাঁর মনের খায়েশ ব্যক্ত করেন। তিনি লিখেছিলেন, সীমান্তবর্তী এই রাজ্যটির নিরাপত্তার গুরুত্ব বিবেচনা করেই সেটিকে ভারতভুক্ত করা উচিত। কারণ This will satisfy both the popular demand and the maharajas wishes. অর্থাৎ এটা আমাদের উভয়েরই জনপ্রিয় দাবি এবং মহারাজার ইচ্ছা পূরণ করতে পারবে। অমুসলিম নেতৃবৃন্দ চাননি যে, উপমহাদেশে নবগঠিত মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তান দীর্ঘদিন টিকে থাকুক বা স্থায়িত্ব লাভ করুক।
তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি জে.বি. কৃপালনী তাঁকে লেখা গভর্নর জেনারেল মাউন্ট ব্যাটেনের ২ জুন ১৯৪৭-এর পার্টিশন প্ল্যানের ওপর সম্মতি জ্ঞাপক এক পত্রের উত্তরে ৩ জুন লিখেছিলেন– We believe as fully as ever before in a united India. We earnestly trust that when present passons have subsided. Our problems would be viewed in their proper perspective and a Willing Union of all parts of India will result thereform. অর্থাৎ আমরা সম্পূর্ণভাবে আগের মতোই অখণ্ড ভারতে বিশ্বাস করি। আমরা আন্তরিকভাবে আরও বিশ্বাস করি, বর্তমানের ভাবাবেগ থিতিয়ে পড়লে আমাদের সমস্যাগুলো স্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হবে এবং তখনই আমরা পুনরায় ভারতের সকল অংশের সংযুক্তির আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করবো। অর্থাৎ দেশ বিভাগ করে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বেশিরভাগ হিন্দু নেতারই ছিল প্রবল অনীহা।

।নও পাল্টা অভিযোগ দায়ের করে।

উভয় দেশের বক্তব্য শোনার পর সিকিউরিটি কাউন্সিল ১৯৪৮ সালের জানুয়ারিতে UN Commission For India (UNCIP) নামক এক কমিটি গঠন করে তাদের হাতে কাশ্মীর বিরোধ মীমাংসার দায়িত্ব অর্পণ করে। সে বছরের একুশ এপ্রিল এই কমিটি জম্মু কাশ্মীরে নিরপেক্ষ গণভোটের প্রস্তাব দেয় এবং উভয় পক্ষকে অস্ত্র সংবরণ ও শান্তি স্থাপনের উদ্যোগ নেয়ার অনুরোধ জানায়। উভয়পক্ষ কাশ্মীরে গণভোটের UN council -এর প্রস্তাব মেনে নিলে UNCIP অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিচালনার জন্য একজন গণভোট এ্যাডমিনিস্ট্রেটর নিয়োগ করে।

তৎকালীন পাক প্রধানমন্ত্রী মি. লিয়াকত আলী খান কাশ্মীর থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহারের পর সেখানে গণভোট অনুষ্ঠানের প্রস্তাব দিলে নেহরু সে প্রস্তাবে রাজি হননি। মি. লিয়াকত আলী জম্মু কাশ্মীরে ভারতীয় সেনার পরিবর্তে বৃটিশ সেনার অধীনে গণভোট অনুষ্ঠানের পাল্টা প্রস্তাব রাখলে নেহরু সে প্রস্তাবও নাকচ করে দিয়ে বলেন, 'বৃটিশ সৈন্য ভারতীয় সীমানায় প্রবেশের আর অনুমতি পাবে না।' অথচ বৃটিশ ভাইসরয় কিন্তু ঠিকই স্বাধীন ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন।

নেহরু আরও জানালেন, ভবিষ্যতে গণভোটে যাই ঘটুক, বর্তমানে কাশ্মীর ভারতেরই অংশ। পাকিস্তানীরা সেখানে অবৈধভাবে প্রবেশ করেছে; বরং তাদেরকেই দখলকৃত অংশ ছেড়ে চলে যেতে হবে। ভারতের এসব একগুঁয়েমি, অযৌক্তিক, অনৈতিক উদ্ধত আচরণের ফলে UNCIP-এর পক্ষে কাশ্মীরে গণভোট অনুষ্ঠান করা সম্ভব হয়নি। সর্বশেষ UN প্রতিনিধি অস্ট্রেলিয়ার Owen Dixon বহু চেষ্টা করেও ভারতকে কাশ্মীর থেকে সেনা প্রত্যাহারে রাজি করাতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত মি. ডিক্সন হতাশ হয়ে 'আমার আর কিছু করার নেই' বলে আক্ষেপ করে পদটি থেকে বিদায় নেন।

সেই থেকে কাশ্মীর পাক ভারত উপমহাদেশের এক জ্বলন্ত ইস্যু হয়ে দাঁড়ায়। একদিকে সাম্রাজ্যলোভী ভারত, অন্যদিকে আযাদীকামী মুসলিম জনগণ। এরই মধ্যে পাক ভারত যুদ্ধও হয়ে গেলো ক'বার। কিন্তু স্বাধীনতাকামী ভাগ্যবিড়ম্বিত এই জনগোষ্ঠীর স্বাধীনতার অফুরন্ত আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণই থেকে যায়। সুদীর্ঘ বায়ান্ন বছর ধরে চলে আসছে রক্তরাঙা আযাদী লড়াই। এখন আপনিই বলুন, এ লড়াইয়ের সাথে সাম্প্রদায়িকতার সম্পর্ক কোথায়। মুসলমানদের স্বাধীনতাকামী কাশ্মীরী মুজাহিদদের প্রতি নৈতিক সমর্থন দেয়াটাও কি অপরাধ? এটাও কি

আপনাদের চোখে উগ্র সাম্প্রদায়িক সংকট হিসেবে চিহ্নিত?

ডা. এলিয়েদা বিস্মিত চোখে তাকিয়ে থাকে আমার দিকে। কাশ্মীরের এই রোমাঞ্চকর কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে কখন যে আমার চোয়াল শক্ত হয়ে মুখাবয়বে কঠিন ভাব ফুটে ওঠেছে এবং একই সঙ্গে কণ্ঠস্বরও আর্দ্র হয়ে ওঠেছে বুঝতে পারিনি।

মিস এলিয়েদা বললেন, প্লিজ! মি. মাহমুড! আপনি বেশ ইমোশনাল হয়ে পড়েছেন। এখন থাক, পরে শোনা যাবে।

এমন সময় পিয়ন এসে জানালো, ডা. ইবরাহিম খলিল এসে গেছেন। ডা. ইবরাহিম এই স্বেচ্ছাসেবী মেডিকেল টিমের প্রধান। তিনি করাচী মেডিকেল কলেজের বিভাগীয় প্রধান এবং বিখ্যাত একজন সার্জন। এলিয়েদার কথা এবং ডা. ইবরাহিমের আসার সংবাদ শুনে একটু সোজা হয়ে বসে স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করলাম। ঠিক এ সময়ই ডা. ইবরাহিম ঘরে প্রবেশ করে বললেন, হাই, মিস এলিয়েদা! এদিকে সব ঠিকঠাক আছে তো?

: ইয়েস স্যার।

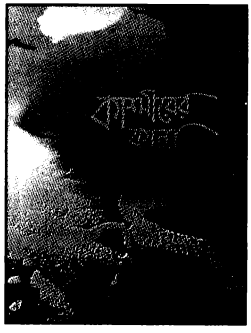
এলিয়েদার সাথে আমিও দাঁড়ালাম। সালাম দিয়ে নাম বলতেই ডা. ইবরাহিম বললেন, ও তাহলে আপনিই জার্নালিস্ট মি. মাহমুদ! তা বয়েস তো একেবারেই কম দেখছি!

আমি সলজ্জে দৃষ্টি আনত করলাম। ডা. ইবরাহিম আমাকে দেখিয়ে এলিয়েদাকে বললেন, এর প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, আইডি কার্ড সব ঠিক করা আছে তো?

ইয়েস স্যার! বলে আইডি কার্ডটি তুলে ধরলেন ডা. ইবরাহিমের দিকে। তিনি তাতে চোখ বুলিয়ে আবার ফেরত দিয়ে বললেন, ঠিক আছে। তোমরা প্রস্তুত হয়ে নাও। সাড়ে দশটা বেজে গেছে। জাস্ট এগারটায় আমরা রওনা হবো। আর হ্যাঁ, গাড়ি এসে গেছে। মালপত্র সব ওঠানোর ব্যবস্থা কর।

: ও কে স্যার।

ডা. ইবরাহিম ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।



পাঁচ

ছাইরঙা এসি মাইক্রোবাস। আমাকে নিয়ে সাকুল্যে যাত্রী ছয় জন। ডা. ইবরাহিমের নেতৃত্বে স্বেচ্ছাসেবী এ মেডিকেল টিমে ডাক্তার রয়েছেন দু'জন। একজন মেডিকেল এসিস্টেন্ট, একজন এটেনডেন্ট এবং আমি নিজে। আমার আইডি কার্ডও করা হয়েছে মেডিকেল এসিস্টেন্ট হিসেবে। প্রফেশনাল ড্রাইভার নেয়া হয়নি। আমাকে ছাড়া সম্ভবত সকলেই গাড়ি ড্রাইভ করতে পারেন।

ডা. আবদেল রহমান নাইজেরিয়ান নাগরিক। ত্রিশোর্ধ্ব কৃষ্ণাঙ্গ এই যুবক ডাক্তারটির ব্যবহারে সত্যিই মুগ্ধ হতে হয়। আমার সাথে পরিচয় হওয়ার পর বাংলাদেশ সম্পর্কে বেশ কিছু প্রশ্ন করেন আমাকে। মাত্র ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলে বার কোটির মতো লোক বাস করে জেনে বেশ অবাক হলেন। আরও অবাক হলেন এটা শুনে যে, বাংলাদেশ জনসংখ্যার দিক থেকে দ্বিতীয় মুসলিম বৃহত্তম দেশ। বললেন, সত্যিই! এই তথ্যটা তো আমার জানা ছিল না!

নাইজেরিয়া সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য জানা গেল তাঁর কাছ থেকে। দেশটি দুর্নীতির দিক থেকে বিশ্বের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে বলে শোনা যায়। রহস্য করেই বলেছিলাম কথাটা। দেখলাম কুচকুচে কালো মুখটা আরও কালো হয়ে গেলো। অধিক কালো বলেই কি না, দাঁতগুলো বেশ সুন্দর তাঁর। সদা হাস্যময় বিশ্বখ্যাত ক্রিকেট তারকা ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্রায়ান লারার মতো দেখতে অনেকটা। চুল এত কুচকানো যে, লম্বা চুল রাখা সত্ত্বেও দেহের তুলনায় মাথাটা ছোট দেখায়। লাল ঠোঁটের ফাঁক গলে রুপালী দাঁতের প্রাণোচ্ছল হাসি সত্যিই অপূর্ব দেখতে।

ড্রাইভিং সিটে বসলেন ডা. আবদেল রহমান। সামনে পাশের সিটে বসেন ডা. ইবরাহিম। মাঝের সিটে ডা. এলিয়েদা বসে আমাকে আহ্বান করলেন। এর আগেই পেছনের সিটে উঠে বসেছে মেডিকেল এসিস্টেন্ট এবং এটেনডেন্ট। ডা. ইবরাহিম আড় চোখে তাকালেন পেছনের দিকে। আমি কিছুটা লজ্জা পেলাম। তবু মাঝের সিটে মিস এলিয়েদার পাশেই বসতে হলো। আমাকে ছাড়া পুরুষ সকলের পরনেই স্যুট-কোট-টাই। মার্চের মাঝামাঝি। তবু আমার কিছুটা শীত শীত লাগছে। এলিয়েদার পরনে স্কার্ট। পায়ে আবার কেড্স। মাথায় হ্যাট। প্রায় হাঁটু অবধি সাদা মোজা পরা থাকলেও নড়াচড়ায় কখনো কখনো সাদা হাঁটু অনাবৃত হয়ে পড়ে। আশ্চর্য! এই শর্টকাট পোশাকেও মেয়েটা কেমন স্বাভাবিকভাবে বসে আছে। একটুও যেন সংকোচ নেই।

ইসলামাবাদ শহর ছেড়ে ন্যাশনাল হাইওয়েতে ওঠেছে গাড়ি। রাস্তার দু'পাশে জানা-অজানা বিভিন্ন গাছের সারি। দিগন্ত বিস্তৃত প্রান্তর। গাড়ির স্বচ্ছ কাচ দিয়ে সব দেখা যায়। রাস্তায় ভিড় নেই বললেই চলে। মিস এলিয়েদা হ্যাটটা হাতে নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, তখন কিন্তু কাশ্মীর সম্পর্কে বলা আপনার শেষ হয়নি। এখন কি বলা যায়?

বললাম, কাশ্মীর এমন এক ভাগ্যবিড়ম্বিত জনপদের নাম, যা সম্পর্কে সারাদিন বলেও শেষ করা যাবে না। শোষিত-বঞ্চিত এই জনগোষ্ঠীর প্রতিটি দিনের ইতিহাস রক্তের আখরে লেখা হয়।

কিন্তু আপনি যা বলেছেন, তা অনেকটাই একপেশে বলে মনে হয়। এর সত্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠা কি স্বাভাবিক নয়?

আপনার কাছে কেন, গোটা বিশ্ববাসীর কাছেই এমনটা মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু যারা এ অঞ্চলের ইতিহাস জানে, অন্তত গত বায়ান্ন বছর ধরে যারা কাশ্মীরের ওপর খোলা দৃষ্টি রেখেছে, তারাই কেবল বলতে এবং বোঝাতে পারবে, আমার বর্ণনায় জুলুম-নির্যাতনের ছিটেফোঁটাই কেবল ওঠে এসেছে।

মিস এলিয়েদা কিছু বলতে চেয়েও থেমে গেলেন। আমি আমার নোট বুকটা বের করে বললাম, সত্যতার প্রশ্ন যেহেতু তুলেছেন তাহলে দেখুন, আমি তথ্যসূত্র উল্লেখ করে বলছি– এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল (লন্ডন), এশিয়া ওয়াচ (নিউইয়র্ক), কমিটি অব ইনিসিয়েটিভ অন হিউম্যান রাইটস (নিউদিল্লী), জে এন্ড কে পিপলস বেসিক রাইটস মুভমেন্ট (শ্রীনগর), কাশ্মীর মিডিয়া সার্ভিস, ভয়েস অব জার্মানি, ভয়েস অব আমেরিকা সূত্রে প্রাপ্ত ১৯৮৮ সালের জুলাই থেকে ১৯৯৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত ভারতীয় বাহিনীর হাতে কাশ্মীরে সাধারণ নাগরিক নিহত হয় ৪৫,৭৪৫ জন, আহত হয় ৮৯,৭২৬ জন। যুদ্ধরত শহীদ মুজাহিদের সংখ্যা ১৩,০১০ এবং আহতের সংখ্যা ৯,৮০৩ জন। এই সময়ের মধ্যে ভারতীয়

বাহিনী ১৭,১২২ জন নারী-শিশুকে ধর্ষণ করে। নির্বিচারে গ্রেফতার করে ১১,৮২০ মুজাহিদ এবং ৮০,৪৩৭ জন সাধারণ নাগরিককে। ভারতীয় হানাদাররা ২৬,৯৭৯ বাড়ি, দোকান লুট ও অগ্নিসংযোগ করে। এছাড়া আযাদ কাশ্মীরে ৭৬৪ জন সাধারণ নাগরিক শহীদ এবং ১৮২৮ জন আহত হয়। বাইরে থেকে এসব মিডিয়া যা সংগ্রহ করতে পেরেছে তার মাত্র এগার বছর পাঁচ মাসের হিসাব এটা।

১৯৯৭ সালে একটি ট্রাইব্যুনাল রিপোর্টে পূর্ববর্তী এক দশকের একটি চিত্র তুলে ধরা হয়। তাতে দেখা যায়, দশ হাজারের বেশি মহিলা বিধবা হয়েছে। এতিম হয়েছে প্রায় অর্ধ লক্ষ শিশু। প্রায় দশ হাজার যুবক বন্দি আছে। নিখোঁজের সংখ্যা বেশুমার। পঙ্গু ও আহতের সংখ্যা লক্ষাধিক। নিহত হয়েছে প্রায় পৌনে এক লক্ষ। বিদ্যালয়, খানকা, মাদরাসাগুলোকে ব্যবহার করা হচ্ছে সেনাশিবির হিসেবে। মসজিদ-মাদরাসা ভেঙ্গে দেয়া, দোকানপাট লুট করা, ঠাণ্ডা মাথায় জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে শেষ করে দেয়া অনেকটা ছেলে খেলার মতো। বলতে পারেন, এ বর্বরতার পরিসীমা কতটুকু?

আমার চোখ দুটি সজল হয়ে ওঠলো। একটু সামলে নিয়ে ডা. মিস এলিয়েদার দিকে তাকালাম। দেখি নীরবে গো-গ্রাসে গিলছে যেন আমার কথাগুলো। আমার চোখে চোখ পড়তেই বললো, হাউ ট্র্যাজেডি! ভেরি স্যাড হিস্ট্রি!

বললাম, মানবাধিকার সংস্থাগুলো দূর থেকে যে তথ্য-উপাত্ত জোগাড় করে, অনুমান করে, প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা দিয়ে যে হিসাব প্রকাশ করে তাতে মনে হয়, দখলদারিত্বের দীর্ঘ কালো ইতিহাসে 'ভূ-স্বর্গ' খ্যাত কাশ্মীরের ঝিলাম নদী দিয়ে যত না পানি প্রবাহিত হয়েছে, তার চেয়ে বেশি গড়িয়েছে রক্ত, লাশ আর চোখ ভেজা নোনতা পানি।

ভারত, পাকিস্তান ও আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় প্রকাশিত তথ্য মোতাবেক উল্লিখিত সময়ে হত্যাযজ্ঞ, নির্যাতন, খুন, গুম, ধর্ষণ ও ক্ষয়ক্ষতির চিত্র মোটামুটি এরূপ

আমার নোট বুকটা মিস এলিয়েদার চোখের সামনে মেলে ধরে পড়তে লাগলাম– হত্যা প্রায় ৭২ হাজার, জখম ৩০ হাজার, অগ্নিদগ্ধ দেড় হাজার, নদী ও বরফ গলা ডোবা থেকে উদ্ধারকৃত লাশ সাতশ'রও বেশি। এদের মধ্যে শিশু থেকে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, নারী-পুরুষ সবই রয়েছে। ধর্ষিতা মা বোন বালিকার সংখ্যা প্রায় আট হাজার। যৌন জীবন ধ্বংস করার জন্য গোপন অঙ্গ নষ্ট করে দেয়া হয়েছে এমন নারী-পুরুষের সংখ্যা প্রায় সাত হাজার। পঙ্গুত্ব বরণ করে দুর্বিষহ জীবন কাটাচ্ছে প্রায় অর্ধ লক্ষ মানুষ। নিজ বাড়ি-ঘর ছেড়ে প্রবাসে শরণার্থী জীবন কাটাচ্ছে অর্ধ লক্ষের বেশি। হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ, মাদরাসা, বাড়ি-ঘর, দোকানপাট

ধ্বংসের পরিমাণ সাধারণ হিসাবে চল্লিশ হাজারেরও বেশি। খাদ্যশস্য আর ফল-ফলারির বাগান ধ্বংসের আসল খতিয়ান কৃষি শুমারি ছাড়া পাওয়া প্রায় অসম্ভব।

এবার নোট বুক বন্ধ করে বললাম, মুজাহিদদের লন্ডনভিত্তিক সংগঠনের বরাতে এ হিসাব আরও অনেক বেশি। দৃশ্যত এ হিসাবের বাইরে অদৃশ্য হিসাবের অংক কত বেশি হতে পারে তা আপনিই অনুমান করুন। এমন নৃশংস লোমহর্ষক ইতিহাস আপনি পড়েছেন কখনো?

ডা. এলিয়েদার চোখও দেখলাম সিক্ত হয়ে ওঠেছে। বললো, সত্যিই বর্বরতার সকল সীমা ছাড়িয়েছে এ কাহিনী। এমন নৃশংসতার কাহিনী কেবল গল্প-উপন্যাসেই শোভা পায়। বাস্তরে এর অস্তিত্ব আছে ভাবতে অবাকই লাগে!

ডা. এলিয়েদা সিটে হেলান দিয়ে চুপচাপ বসে থাকে। সম্ভবত সেও কিছুটা ইমোশনাল হয়ে পড়েছে। আমিও আর কিছু না বলে জানালার কাচে চোখ রেখে নিশ্চুপ বসে থাকি।

বেশ সময় কেটে যায় এভাবে। ডা. ইবরাহিম পেছন দিকে চেয়ে বললেন, হ্যালো, মি. মাহমুদ! আমরা কাশ্মীর সীমান্তে এসে গেছি। আর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আমাদের গাড়ি কাশ্মীর সীমানায় প্রবেশ করবে। কারগিল পর্যন্ত পৌঁছতে আমাদের তিনটি ভারতীয় চেকপোস্ট অতিক্রম করতে হবে। বিশেষ করে আপনাকে এ সময় এলার্ট থাকতে হবে। আপনার আসল পরিচয় যথেষ্ট সতর্কতার সাথে গোপন করবেন। আর হ্যাঁ, আমাদের দেয়া আইডি কার্ডটা হাতে রাখুন।

আমি খানিকটা সচকিত হয়ে ওঠলাম। আইডি কার্ডটা বুক পকেটে আছে। আবার দেখে নিলাম ওটা। ডা. ইবরাহিমের কথার জবাবে বললাম, ধন্যবাদ স্যার। আপনার নির্দেশমতোই হবে ইনশাআল্লাহ।

ডা. এলিয়েদাও যেন সজাগ হয়ে ওঠলো। অবাক চোখে চেয়ে বললো, আমরা কাশ্মীরে এসে গেছি?

: ডা. ইবরাহিম তো তাই বললেন।

হ্যাঁ, আমরা কাশ্মীরে এসে পড়েছি। আমার শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অজানা রোমাঞ্চ অনুভূত হচ্ছিল। এ সেই কাশ্মীর, যেখানে মুসলিম নারীর লুণ্ঠিত সম্ভ্রম, নির্যাতিত মুজাহিদদের হাহাকার, স্বাধীনতাকামী হাজারো যুবকের আর্তচিৎকারের মাঝেও প্রতিনিয়ত যে ভূমিতে স্বাধীনতার আওয়াজ ওঠে। মকবুল বাট, মৌলভী ফারুক, আসিয়া আন্দ্রাবীসহ অগণিত শহীদের রক্ত ফিনকি দিয়ে শুধু ঝিলাম নদীকে রাঙিয়ে দেয়নি, পাহাড়ী এ উপত্যকার প্রতিটি কন্দরে কন্দরে আযাদীর চিরায়ত

আওয়াজকেও বুলন্দ করে। এটা তো কেবল হযরতবাল ট্র্যাজেডির দেশ নয়, কেবল কারগিল ও দ্রাস যুদ্ধের মৃত্যুপুরী রণক্ষেত্র নয়, সাহসী ও লড়াকু মুজাহিদদের দেশও বটে। এতো মোগল সম্রাট শাহজাহানের ভূ-স্বর্গ, গান্ধীর 'আলোর কিরণ'। কিন্তু অমানিশার ঘুটঘুটে অন্ধকারে নিকষ কালো আঁধারে ভারতীয় হায়েনাদের নৃত্য আর ইবলিসি তাণ্ডবের ফলে এ উপত্যকা যেন আজ পৃথিবীর নরকে পরিণত হয়েছে। হত্যা, লুণ্ঠন ও সম্ভ্রমহারা মা-বোনদের আর্তনাদে এখানকার আকাশ ভারী হয়ে ওঠেছে, বাতাসে বারুদের ঝাঁঝালো গন্ধ এখানকার পরিবেশকে করে তুলেছে ভৌতিক এক পিশাচপুরী। হায়! এদের এই আযাদীর লড়াইয়ের শেষ কি হবে না কখনো? আমার দুই চোখ ভরে দেখছি সুশোভিত কাশ্মীর জনপদ, এখানকার রাস্তা, পথ-ঘাট, ক্ষেত-খামার, সবুজ বৃক্ষ, পাহাড়, তরুলতা সবকিছুই যেন কেমন চাপা স্বরে ক্রন্দন করছে।

হঠাৎ গাড়িটি কড়া ব্রেক কষলো। কি হলো দেখার জন্য জানালার কাচ থেকে চোখ তুলে সামনে তাকালাম। আমার দৃষ্টিও গাড়ির মতো থমকে গেছে। গাড়ির চারদিকে ভারতীয় সৈন্যরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে। আমার চোখে মুখে ভয়ের চিহ্ন ফুটে ওঠলো কি না জানি না, তবে শ্বেতাঙ্গ তরুণী মিস এলিয়েদার সাদা মুখচ্ছবি কেমন যেন নীলাভ দেখাচ্ছে। ভেবেছিলাম আমাদের গাড়ি কেউ এভাবে আটকাবে না। কেননা, গাড়ির সামনে বাম্পারে লাগানো বিশাল ব্যানারে জাতিসংঘের লোগো অঙ্কিত স্বেচ্ছাসেবী মেডিকেল টিমের সংস্থার নাম লেখা আছে। কিন্তু ওরা কি ইংরেজি বুঝে না? নাকি জেনে শুনেই পথ রোধ করেছে? ওদের মতলব যে কি আল্লাহই ভালো জানেন।

অফিসার কিসিমের দু'জন এগিয়ে এলো গাড়ির সামনে বসা ডা. ইবরাহিমের কাছে। তিনি ইংরেজিতে পরিষ্কার ভাষায় আমাদের উদ্দেশ্য ও গন্তব্যের কথা জানালেন। ইউএন লোগোযুক্ত আইডি কার্ডসহ বিভিন্ন প্রমাণাদি পেশ করলেন। একজন অফিসার কপাল কুঁচকালো, অপরজন গাড়ির ভেতর দৃষ্টি দিয়ে কি যেন পরখ করলো। প্রথম অফিসারটি ওয়াকিটকিতে কি জানি কথা বলে মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে পুরো গাড়ি তল্লাশি করলো। তারপর উদাসীনভাবে পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ালো। ডা. ইবরাহিম অনিচ্ছা সত্ত্বেও থ্যাঙ্ক ইউ বলে গাড়ি ছাড়ার নির্দেশ দিলেন।

মাইল তিনেক বোধ হয় এগুনো যায়নি, আবার গাড়ির সামনে ভারতীয় চেকপোস্টের ব্যারিকেড পড়লো। ডা. ইবরাহিম পেছনের চেকপোস্টের বর্ণনাসহ আবার নতুন করে তাদের কাছে সফরের উদ্দেশ্য এবং সংস্থার পরিচিতি প্রমাণাদিসহ পেশ করলেন। কিন্তু এরা যেন আরো গোঁয়ার। তাদের নির্দেশে হাত উঁচু করে সবাইকে নামতে হলো গাড়ি থেকে। এবার সত্যিই আমি কিছুটা ভয় পেয়ে গেলাম।

দু'জন অফিসার আমাদের গাড়িতে ওঠে জিনিসপত্র ওলট পালট করলো। মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে গাড়ির প্রতিটি কোণ চেক করলো। তারপর কাদের সাথে যেন ওয়াকিটকিতে কথা বলে গাড়ি থেকে নেমে যাত্রার অনুমতি দিল।

আমি বুঝতে পারছি, ডা. ইবরাহিম যথেষ্ট বিরক্ত হচ্ছেন ওদের প্রতি। তবুও তিনি মুখে হাসিভাব ফুটিয়ে সামনে যেন এ ধরনের হয়রানি না করা হয় তার জন্য বিনীত অনুরোধ জানালেন। ওরা নিঃশব্দে একটা রহস্যময় হাসি হেসে গুড বাই জানালো। তাদের হাসির অর্থ আমাদের কারো বোধগম্য হয়নি।

গাড়ি চলতে শুরু করলে ডা. ইবরাহিম পেছনের দিকে চেয়ে বললেন, তোমরা ভালো করে দেখো তো গাড়িতে ইলেক্ট্রনিক কোন যন্ত্র সেট করে দিয়েছে কি না?

প্রশ্নটা শুনে কিছুটা হকচকিয়ে গেলাম। তাহলে কি প্রথম চেকপোস্টেই কিছু লাগিয়ে দিয়েছিল? কোন অডিও ভিডিও মিনি রেকর্ডার বা এ জাতীয় কিছু? অসম্ভব কি? হয়তো এরা সেটা দেখে নিঃসন্দেহ হয়েছে এবং পুনরায় সেটি কোথাও লাগিয়ে রেখেছে।

সকলে মিলে গাড়ির মেঝেসহ চারপাশে ভালো করে দেখে নিলাম। কিন্তু কিছুই পেলাম না। ডা. ইবরাহিমকে এ কথা জানাতে যাবো, ঠিক এ সময় পেছনের সিটে বসা একজন সিগারেটের প্যাকেটের মতো একটি অডিও রেকর্ডার বাড়িয়ে দিলেন সামনে। আমি সেটি দিলাম ডা. ইবরাহিমের হাতে। তিনি এটি হাতে নিয়ে যন্ত্রটি অফ করলেন। ফিতা টেনে আবার শুরুতে নিয়ে বললেন, সামনে আরেকটি শুয়োরের খোঁয়াড় আছে। এটি অন করে যথাস্থানে রেখে দাও। আর হ্যাঁ, গাড়িতে বসে সামনের চেকপোস্ট না পেরুনো পর্যন্ত কেউ কোন কথা বলবে না। আল্লাহ আল্লাহ করে সামনের চেকপোস্টটি পেরিয়ে যেতে পারলে দুশ্চিন্ত ামুক্ত হওয়া যাবে।

ঘটনার আকস্মিকতায় কিছুটা থ হয়ে গিয়েছিলাম। যন্ত্রটি যথাস্থানে রেখে দিয়ে সিটে হেলান দিয়ে বসলাম। এর আগে যে শীত শীত ভাবটা ছিল তা কেটে গেছে এতক্ষণে। হয়তো বা কপালে বিন্দু বিন্দু ঘামও জমেছে। ডা. এলিয়েদার চোখে মুখেও দুশ্চিন্তার ছায়া পড়েছে। নীরব থেকে সবকিছু দেখে যাচ্ছে, হয়তো বা বুঝতে পারছে সবকিছু। উত্তেজনায় কেমন বোবা হয়ে বসে আছে। কপালে ক'টি ভাঁজ স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠেছে। কিন্তু আশ্চর্য! নাইজেরিয়ান ডা. আবদেল রহমান সম্পূর্ণ নির্বিকার। চোখে মুখে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন নেই। খুবই স্বাভাবিক ভঙ্গিমায় গাড়ি ড্রাইভ করছে। মনে হচ্ছে পেশীবহুল কঠিন পাথরে গড়া এক কৃষ্ণ যন্ত্রমানব রোবট!



ছয়

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি কাশ্মীর উপত্যকার অপূর্ব সৌকর্য যে কোন প্রকৃতিপ্রেমী সৌন্দর্যপিপাসুর চিত্ত-মনকে ভাবিয়ে দিতে সক্ষম। একে সত্যিই 'ভূ-স্বর্গ' বলা যায়। মিস এলিয়েদা সেদিন বলেছিল, কাশ্মীর এমন এক লিভিং প্যারাডাইজ, যেখানে আমার সারা জীবন থেকে যেতে ইচ্ছে হয়। পৃথিবীর বেশ কিছু অঞ্চল আমি দেখেছি, কিন্তু এমন মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক স্নিগ্ধতা কোথাও দেখিনি। যদি এখানে এমন রক্তপাত না হতো, তাহলে থেকে যাওয়ার লোভ সামলাতে সত্যিই কষ্ট হতো।

দূর থেকে দেখা মেঘের মতো পাহাড়, ঝর্না, ছোট ছোট নদী-নালা, বরফের চাদর, বরফগলা ডোবা, আঙুর, কমলা, আপেল, বেদানাসহ প্রচুর রসনাবিলাসী ফল-ফলারির বাগান, ফসলের মাঠ, দিগন্ত বিস্তৃত প্রান্তর, কি এক মনোমোহিনী সৌন্দর্যের আকর এই কাশ্মীর, তা বলে বোঝানো যাবে না। পাখিদের কূজন, শিশুর কোলাহল, গাঁয়ের পথে বোরকাপরা রমণীদের চলাচল এখানে চমকে থমকে যায় বুলেটের শব্দে ও বারুদের গন্ধে। এখানকার মাটির পরতে পরতে মিশে আছে লক্ষ শহীদের খুন। বাতাসে মিশে আছে কত যে বুকফাটা আর্তনাদ, হাহাকার!

হাসপাতালে আমার কোন কাজ নেই। সারাদিন কেবল পঁইপঁই করে ঘুরে বেড়াই। ইচ্ছেমতো ছবি তুলি, কথা বলি গাঁয়ের মানুষদের সাথে। ছেলে-বুড়ো সকল শ্রেণীর মানুষের সাথে কথা হয়। এ পর্যন্ত প্রায় হাফ ডজন মুজাহিদের সাথে আলাপ হয়েছে। মিনি সাক্ষাৎকার হিসেবে চালানোর জন্য তাদের সাথে

কথা বলার সময় টেপ রেকর্ডার ব্যবহার করছি। এ কয়দিন নিয়মিত কলম পেষায় নোট বইয়ের পাতাগুলোও স্ফীত হয়ে ওঠেছে। আহার-বিশ্রামের সময়টুকু ছাড়া প্রতিদিন সন্ধ্যা অবধি ঘুরে বেড়াই গ্রামের পর গ্রাম। অবশ্য মুজাহিদ নিয়ন্ত্রিত এলাকার মধ্যেই আমার চলাচল সীমাবদ্ধ রাখি। এখানকার মাঠ পর্যায়ে যেসব মুজাহিদ নিয়মিত টহল দেয় তাদের প্রত্যেকেই প্রায় চিনে ফেলেছেন আমাকে। কাবুলি ড্রেস পরে বেরুলে আমাকে মুজাহিদ মনে করে ভ্রম করে অনেকেই।

কারগিল পাহাড়ের পাদদেশের একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। গ্রামের মাঝামাঝি ছোট্ট একটি বাজার। তারই একদিকে পুরনো একটি পাকা বাড়িতে যুদ্ধাহত মুজাহিদদের চিকিৎসার জন্য অস্থায়ী মেডিকেল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। কারগিল দখলের পর থেকে অর্ধশতাধিক যুদ্ধাহত মুজাহিদ এখান থেকে নিয়মিত চিকিৎসাসেবা নিচ্ছেন। চিকিৎসকের সংকট, প্রয়োজনীয় চিকিৎসোপকরণ, ওষুধের অভাবে চিকিৎসাকার্য প্রায়শই মুখ থুবড়ে পড়ে। কিন্তু সেবা-যত্ন ও আন্ত রিকতার অভাব এখানে নেই। অনেক তরুণী সেবিকা স্বেচ্ছাশ্রম দিয়ে যাচ্ছে এই সেবালয়ে। তাদের কোন মুজাহিদ ভাই আযাদীর জন্য যুদ্ধে গিয়ে আহত হয়ে আসবে এখানে, আর তারা চুপ করে ঘরের ভিতরে বসে থাকবে তা কি করে হয়! রণাঙ্গনে বন্দুক চালাতে দেবে না যখন, অন্তত সেবার অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারে না তারা।

ডা. ইবরাহিমের নেতৃত্বে মেডিকেল টিমটি আসার পর দশটি মেজর অপারেশন হয়েছে এখানে। তাদের প্রায় সকলেরই একটা পা অথবা হাত কেটে ফেলতে হয়। মেজর অপারেশনগুলো ডা. ইবরাহিম নিজে করেছেন। মাইনর কেইসগুলো দিয়ে দেন ডা. আবদেল রহমান ও ডা. এলিয়েদার হাতে। যথেষ্ট ওষুধপত্র নিয়ে আসা হয়েছিল। সেই সাথে চিকিৎসোপকরণও। বেশ কাজ দিয়েছে তা।

হাসপাতালের অদূরে আমাদের তাঁবু খাটানো হয়েছে। পর্দা দিয়ে সেপারেট করা থাকার জায়গা। রান্নাবান্না হয় বাইরে। এখানকার স্থানীয় লোকজন সব ধরনের কাজে সাহায্য করে আন্তরিকতার সাথে। মুজাহিদরা এ অঞ্চল কব্জা করার পর মুসলমানরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে অবাধে চলাফেরা করতে পারছে। মসজিদগুলো আবাদ হচ্ছে। এখন নিয়মিত মাইকেও আযান হয়, নামায হয় জামাতে। মসজিদে মসজিদে মক্তব চালু হয়েছে। যেন জনজীবনে নতুন প্রাণের জোয়ার এসেছে। তাই সাধারণ জনগণ মুজাহিদদের সেবা করতে পারলে গর্ববোধ করে। আর যারা আহত মুজাহিদদের সেবার জন্য ছুটে এসেছে, পারলে তারা তাদের মাথায় তুলে রাখে।

শুক্রবার। জুমার নামায পড়তে মাইল দেড়েক দূরে একটি প্রাচীন মসজিদে যাই। দেখলাম ছোট বড় অনেক মানুষের ভিড়। সেখানে গল্প চলে যুদ্ধ নিয়ে। মুজাহিদদের সফলতায় তারা খুশি হয়, পুলকিত হৃদে মহান স্রষ্টার কাছে শুকরিয়া জানায়। আবার তাদের কোন ধরনের ব্যর্থতা বা অপরাগতায় বেদনাহত হৃদয়ে আল্লাহর পানাহ চায়।

অল্পক্ষণের মধ্যেই মসজিদ ঘর কানায় কানায় ভরে গেল। বারান্দা ছাড়িয়ে বাইরে মাঠেও নামাযের জন্য বিছানা পাতা হয়েছে। আমি অনেক আগে আসায় মসজিদের ভিতরে প্রথম সারিতেই জায়গা করতে পেরেছি। খুতবার আগে ইমাম সাহেব মুসল্লীদের উদ্দেশে বললেন, মুজাহিদদের পক্ষ থেকে একজন নওজোয়ান আপনাদের উদ্দেশে কিছু কথা বলতে চান। মসজিদের সকল মুসল্লী ইমাম সাহেবের দিকে দৃষ্টি দিয়ে সম্মতি প্রকাশ করলো।

একজন সুদর্শন নওজোয়ান মেহরাবের কাছে এসে দাঁড়ালেন। চমৎকার ফর্সা মুখাবয়ব। মুখে ঘন কালো দাড়ি, মাথায় কালো রঙের পাগড়ি। গায়ে লম্বা জুব্বা। পুরুষোচিত দরাজ কণ্ঠে কালামে পাক থেকে কয়েকটি আয়াত বিসমিল্লাহসহ তেলাওয়াত করলেন। তারপর চারদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে মহান আল্লাহর প্রশংসা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শানে দরূদ ও সালাম পাঠ করে শহীদ মুজাহিদদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করলেন এবং যুদ্ধাহত মুজাহিদদের আশু সুস্থতা কামনা করে সংক্ষিপ্ত মুনাজাত করেন। চমৎকার কণ্ঠ এ নওজোয়ানের। শুদ্ধ উর্দু উচ্চারণের প্রতিটি কথা এতই প্রাঞ্জল ও হৃদয় ছোঁয়া যে, আমার মতো বিদেশীও মুগ্ধ হয়ে গেলাম।

তিনি বললেন– মুসল্লী ভাইয়েরা! আল্লাহর অশেষ রহমতে কারগিল ও দ্রাস পৌত্তলিক সৈনিকদের কবল থেকে মুক্ত হওয়ায় এখানকার জনজীবনে বেশ স্বস্তি ফিরে এসেছে। কাশ্মীরের প্রতিটি ঘরে সন্তান জন্ম নিয়ে পৃথিবীর বাতাস গ্রহণ করতে যেয়ে বারুদের গন্ধ পায়। দুনিয়াতে এসে আযানের ধ্বনির আগে কামানের শব্দ শুনতে পায়। কেউ বা মাতৃগর্ভে থেকে পিতাকে হারায়। এতিম হয়ে অস্ত্রের ঝনঝনানি শুনতে শুনতে তারা বড় হয়। বিগত অর্ধ শতাব্দীকালেরও বেশি সময় ধরে এই অবস্থার কোন পরিবর্তন নেই। আযাদীর তামান্না বুকে লালন করে কত মুসলিম সন্তান নিজেদের জীবন বিলিয়ে দিয়েছে, তার কোন হিসাব নেই। এখানকার প্রতিটি মুসলিম সন্তানের একমাত্র বাসনা ভারতীয় পৌত্তলিক আগ্রাসন থেকে নিজ মাতৃভূমিকে আযাদ করে খোদায়ী রাজ কায়েম করা। কিন্তু এই বর্বর বাহিনীর কবল থেকে দেশকে উদ্ধার করতে যুদ্ধের কোন বিকল্প নেই। আমাদের তো ভারী কোন অস্ত্র নেই, নেই সুপ্রশিক্ষিত সৈন্য

বাহিনীও। তাই আমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে মাঠে নামতে হবে। আমাদের লড়াই করতে হবে কাশ্মীরের আযাদীর জন্য, নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষদের শয়তানের কবল থেকে মুক্ত করার জন্য, আমাদের মা-বোনদের ইজ্জতের হেফাজতের জন্য। ইতিহাস সাক্ষী– তাগুতি শক্তি যত ভয়ানকই হোক না কেন, মুসলমানদের ঈমানী তাকতের কাছে তারা নতিস্বীকার করতে বাধ্য। তার সর্বশেষ প্রমাণ মহান আল্লাহ এই কারগিল ও দ্রাস অঞ্চলে দেখিয়েছেন।

খোদাপ্রেমী ভাইয়েরা আমার! ভারতীয় আগ্রাসী বাহিনী যে কত ভয়াবহ নৃশংসতার পরিচয় দিয়েছে তা আপনারা ভালো করেই জানেন। মাইছামা, সোপুর, গানাই মহল্লা এবং এলাহাবাদ মহল্লার লোকজন এখনও দু'একদিন পর পরই ক্র্যাক ডাউনের শিকার হচ্ছে। এর আগে মাজার-ই-শরীফে মসজিদের ভিতর যে তাণ্ডব তারা চালিয়েছে, পৃথিবীর ইতিহাসে এমন ঘটনা বিরল। আজ কাশ্মীরের জমিনে মুসলমানের সন্তানরা বেঁচে থাকবে আর তাদের মা-বোনরা চোখের সামনে পৌত্তলিকদের দ্বারা ধর্ষিত হবে– এমন জিন্দেগীই কি আমাদের কাম্য!

মসজিদের ভিতর পিনপতন নীরবতা। আবেগাপ্লুত নওজোয়ানের কথা শুনে সকল মুসল্লী সমস্বরে চিৎকার দিয়ে ওঠলো– না, না। নওজোয়ান বলতে লাগলেন– আরে ভাই! আমরা তো সেই মুহম্মদ বিন কাসিমের উত্তরসুরি, যে কিনা বন্দি এক মুসলিম বোনের পত্র পেয়ে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন দাম্ভিক পৌত্তলিক বাহিনীর ওপর। যার তলোয়ারের ছায়ার নিচে এই জমিন সেদিন আশ্রয় খুঁজে পেয়েছিল। আজ এমন নির্মমতা-নিষ্ঠুরতা দেখেও আমরা ঘরে চুপ করে বসে থাকবো? এই কি আমাদের ঈমানী দাবি?

আবার শোরগোল শুরু হয়ে গেলো। সমস্বরে সকল বয়সের লোকজন চিৎকার করে বলতে লাগলো– আমরা যুদ্ধে যেতে প্রস্তুত। আমাদের নির্দেশ করুন।

নওজোয়ান বললেন– আলহামদুলিল্লাহ! আমি জানি, কাশ্মীরের প্রতিটি সন্তানের বুকে যে আগুন জ্বলছে তাতে বক্তৃতা দিয়ে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করার প্রয়োজন নেই। সকলের সেই বয়সও নেই, আর মুজাহিদদের সে পরিমাণ অস্ত্রও নেই। তবু আল্লাহর ওপর ভরসা করে এই এলাকার নিকটে একটি ট্রেনিং ক্যাম্প খোলা হয়েছে। যুদ্ধ করার মতো সামর্থ্যবান যুবকরা এখানে নাম লেখান, তারপর মুজাহিদদের পক্ষ থেকে ট্রেনিং ক্যাম্পের ঠিকানা এবং সময় বলে দেয়া হবে।

সব বয়সের লোকজনই নাম লেখানোর জন্য হাত তুললেন। কিন্তু দু'জন সাথী দেখে দেখে দু'একটি প্রশ্ন করে করে নাম লিস্ট করতে লাগলেন। নাম

তালিকাভুক্তি চলছে পাঁচ মিনিটও হয়নি, মাইক্রোফোন হাতে বক্তা নওজোয়ান কয়েকটি নম্বরের একটি কোড উচ্চারণ করলেন। দেখলাম সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে। উত্তর এবং দক্ষিণ দিক থেকে দু'জন দু'জন করে চার জন তরুণ মুসল্লীদের ভিড় গলিয়ে দ্রুত পায়ে বারান্দায় বেরিয়ে গেলো। অন্য সকলের মতো আমিও পেছনে দৃষ্টি ফেরালাম। দেখি, বারান্দায় বেরিয়ে চার তরুণ ওয়ারলেস সেট ও একটি রিভলবারসহ দু'জন লোককে ধরে পিঠমোড়া বাঁধ দিচ্ছে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই বক্তা নওজোয়ান বললেন, আপনারা শান্ত হোন, এই মুহূর্তে এই মসজিদে দু'জন ভারতীয় গুপ্তচর ধরা পড়েছে। তারপর উক্ত চার তরুণের উদ্দেশে সাংকেতিক একটি নির্দেশ দিয়ে বললেন, আপনারা তালিকার কাজ শুরু করুন। অনুগ্রহ করে কেউ বসা থেকে ওঠবেন না, যা করার আমরা করছি।

মসজিদের পরিবেশ শান্ত হয়ে এলেও একটা গুঞ্জন রয়েই গেলো। পেছনে চেয়ে দেখি, ধৃতদের একটা পিকআপ ভ্যানে তুলে দক্ষিণ দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আমার নিজের ভেতর কেমন একটা ভয় ভয় ভাব চলে এসেছে। ভিতরে ভিতরে ঘেমে ওঠলেও শান্ত হয়ে বসে রইলাম। মুজাহিদ নওজোয়ানের চোখে মুখে কোন ভাবান্তর নেই। স্বাভাবিকভাবেই নাম অন্তর্ভুক্তির কাজ সমাধা হলো।

নামায শেষে মুসল্লীরা চলে যাচ্ছে। আমার সুন্নত পড়া শেষ হলেও মসজিদেই বসে রইলাম। পরিস্থিতি এতই স্বাভাবিক যে, এর আগে মসজিদে কিছু একটা ঘটেছে তা বোঝার উপায় নেই। তাই হয়তো আমার মনেও একটু সাহস ফিরে এসেছে। মনে মনে ভাবলাম, এ নওজোয়ান নিশ্চয়ই কোন মুজাহিদ কমান্ডার। ওর সাথে কিছু কথা বলতে পারলে মন্দ হয় না। কিন্তু তার ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধির প্রখরতা দেখে কিভাবে কথা শুরু করবো ভেবে পাচ্ছি না। এ সময় নামায শেষ করে এ তরুণ মুজাহিদ বের হচ্ছেন। মনে হলো বেরুবার সময় আমার দিকে একবার বুঝি তাকালেনও। আমি পেছনে পেছনে বারান্দায় বেরিয়ে এলাম। সামনে গিয়ে সালাম দিয়ে বললাম, আপনার সাথে আমি দুটি কথা বলতে চাই, অনুগ্রহ করে আপনার একটু সময় হবে কি?

আমার দিকে পূর্ণ দৃষ্টি মেলে চাইলেন তিনি। বললেন, বলুন কি জানতে চান?

বললাম, আমার অনুমান যদি সত্য হয় তাহলে নিশ্চয়ই আপনি কোন মুজাহিদ গ্রুপের কমান্ডার?

আমার প্রশ্নের জবাবে কিছু না বলে পাল্টা আমাকেই প্রশ্ন করলেন, আপনি নিশ্চয়ই সাংবাদিক এবং বিদেশী?

বিস্মিত হলাম আমি, আমার পরিচয় জানলো কি করে? বললাম, আপনার অনুমান সত্য। মেহেরবানী করে আমার প্রশ্নের জবাব দেবেন কি?

ঠিক এ সময় একজন তরুণ ছুটে এসে নওজোয়ানের হাতে একটি স্লিপ ধরিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। তিনি চিরকুটটি চোখের সামনে মেলে ধরে তা ভাঁজ করে পকেটে পুরতে পুরতে বললেন, হ্যাঁ, আপনার অনুমান সত্য। আমার হাতে সময় খুবই কম, বলুন আর কি জানতে চান?

বললাম, আপনার বক্তৃতা, চেহারা এবং মসজিদের স্বল্প সময়ের কর্মকাণ্ড দেখে সহজেই বুঝে নেয়া যায় আপনি একজন মুজাহিদ কমান্ডার। কিন্তু আমাকে আপনি চিনলেন কি করে, বিষয়টা জানতে ইচ্ছে করছে।

: আপনার চেহারা এবং মুখভাবের অভিব্যক্তিই বলে দিচ্ছে আপনি এই এলাকার মানুষ নন। তাছাড়া সাংবাদিকতা ছাড়া এমন কোন মহৎ কর্ম নেই যে, এমন বিপদসংকুল এলাকায় এভাবে নির্বিকার মসজিদে বসে থাকবে একজন বিদেশী। সর্বশেষ এই চিরকুটের মাধ্যমে আপনার পরিচয় পেয়ে নিশ্চিত হলাম, আপনি আইবিএ'র লোক।

: শুকরিয়া। আপনি দেখছি আমাদের সংবাদ সংস্থার সাথেও পরিচিত!

মৃদু হেসে বললেন, তা তো অবশ্যই। দুনিয়ার কোথায় কারা কি করছে তার ন্যূনতম ধারণা তো আমাদের রাখতে হয়! আপনারা যে আমাদের হয়ে কাজ করছেন এ খবরটুকু জানা না থাকলে কি চলে! আপনারা এখানে আর কতদিন থাকবেন?

দেড় সপ্তাহের মতো থাকার কথা। এরই মধ্যে এক সপ্তাহ চলে গেছে। আপনি কি মেহেরবানী করে এর মধ্যে আমাকে একটু সময় দিতে পারবেন? তাহলে আমার কাশ্মীর আগমনের উদ্দেশ্য অনেকটা সফল হবে বলে মনে করবো।

নিজের চোখেই তো দেখছেন কাশ্মীরের মাটি, মানুষ আর তাদের প্রাণের একান্ত আকুতি। আমার সাথে কথা বলে এর বেশি কিই-বা আশা করতে পারেন? আর সময়ের কথা বলছেন! মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কখন যে কোথায় কার সাথে কিভাবে মিলিত করেন তা মানুষের কল্পনায়ও আসে না। তাই ডেফিনিট কিছু বলতে পারছি না, যদি তেমন মওকা মিলে তবে আমি চেষ্টা করবো আপনার সাথে মিট করতে।

আরেকটা কথা জানতে বড্ড ইচ্ছা করছে। এই যে দু'জন গুপ্তচর মসজিদের শত শত মানুষের মধ্যে শনাক্ত করলেন, এটা কি করে সম্ভব হলো? নেহায়েতই কৌতূহল আমার! অনুগ্রহ করে বলবেন কি?

আবার হাসলেন তিনি, এক রহস্যময় হাসি। বললেন, তেমন কঠিন কিছু নয়। মসজিদের পয়সা কালেকশনের যে বাক্সটা সবার সামনে দিয়ে চলে গেছে, তাতে 'মেটাল ডিটেক্টর' লাগানো ছিল। ইলেক্ট্রনিক সংকেত পেয়েই এদের সন্দেহ করা হয়। আপনি ভেবে অবাক হবেন, এই কাশ্মীরের মাটিতেই জন্মেছে– এমন অনেক মুসলমান নামধারী গাদ্দার রয়েছে, যারা ভারতীয় সৈন্যের চেয়ে ভয়ঙ্কর শুধু নয়; বরং ক্ষেত্র বিশেষে অধিক ভয়ানক। সবচেয়ে সমস্যা হয় এজন্য যে, এদের সাধারণভাবে চেনা যায় না। এই যেমন মসজিদে মুসল্লী সেজে এসে বসে আছে। এ তো নিজের চোখেই দেখলেন। মজার ব্যাপার হলো, যাকে সন্দেহ করে শনাক্ত করতে মেটাল ডিটেক্টর ব্যবহার করলাম– শেষে তাকে পেলাম বন্ধুরূপে। অথচ দালাল মিলল অন্যত্র। সন্দেহ নেই, নিজের ভোগের জৌলুসের বিনিময়ে যে সব দালাল আপন কওমের স্বাধিকারের সওদা করলো, তাদের বেঈমানীর কারণেই কাশ্মীরের আযাদী বিলম্বিত হচ্ছে!

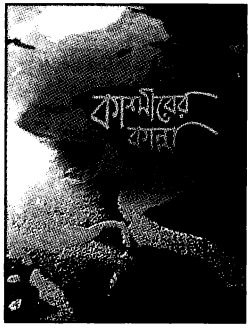
আমাকেই তাহলে সন্দেহ করা হয়েছিল! মনে মনে ভাবলাম এবং তা এই নওজোয়ানের সামনে প্রকাশ করলাম। তিনি এবার শব্দ করেই হেসে ওঠলেন। আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, সত্যি, মূলত আপনাকেই আমরা ডাউট করেছিলাম। যাক, আপনি নিশ্চিন্তে তাঁবুতে ফিরে যেতে পারেন।

আমি কি ধরে নেব এতক্ষণ আমি বন্দি ছিলাম?

আমার হাসিমাখা এ প্রশ্নের উত্তরে তিনিও হেসে বললেন, অন্তত মসজিদে প্রবেশের পর থেকে তো নজরবন্দি ছিলেনই। তবে অল্প একটু আগেই আপনার সত্যিকার পরিচয় আমরা পেয়ে যাই।

এমন সময় এক তরুণ এসে বললো, গাড়ি প্রস্তুত। মুজাহিদ কমান্ডার শেখ ওসামা আমার সাথে হাত মিলিয়ে বললেন, আমাকে এখুনি যেতে হচ্ছে। ওই গাদ্দার দুটিকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে। আসি, আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন। ফি আমানিল্লাহ!

বিস্ময়ভরা চোখে তাঁর গমন পথের দিকে চেয়ে রইলাম। স্বগতোক্তির মতো কেবল আমার মুখ দিয়ে বের হলো– ফি আমানিল্লাহ! আল্লাহ তোমাদের সহায় হোন।



সাত

আসরের নামায পড়ে বের হলাম তাঁবু থেকে। প্রতিদিন এই সময়টাতেই বের হই। বিকেলে পাহাড়ের দিকে এবং সকালে ঘুরি গ্রামে গ্রামে। কাশ্মীরের শ্রীনগর থেকে প্রকাশিত আস্‌সাফা, শ্রীনগর টাইমস, আফতাব, চাটান– এ জাতীয় দু'তিনটি পত্রিকা পড়ার সুযোগ হয়। প্রতিদিনই যুদ্ধ সংক্রান্ত খবর ছাড়াও কাশ্মীরের ইতিহাস-ঐতিহ্য, শিল্প-সংস্কৃতি, এখানকার জীবনযাত্রার একটা চালচিত্র এসব পত্রিকা পড়ে জানতে পারি। এখানকার বেশিরভাগ সংবাদপত্রের স্ট্যান্ড পরিষ্কার নয়। ভারতপন্থীদের বিনিয়োগ থাকায় কোন কোন সংবাদপত্র নেহায়েতই সরকারের দালালি করে থাকে। এতে সংবাদের বস্তুনিষ্ঠতা যেমন বিঘ্নিত হয়, তেমনি সত্য প্রকাশে ব্যর্থতার একটা চাপা আর্তনাদও লক্ষ করা যায়। গতকালের ঘটনা সম্পর্কে তাই তিনটি পত্রিকা তিন রকম রিপোর্ট করেছে। তবে সব পত্রিকাই এটাকে লীড আইটেম করেছে। আমার সৌভাগ্য, একজন বিদেশী হয়েও ভারতীয় জঙ্গি বিমান ভূপাতিত করার ঘটনা এত কাছে থেকে পর্যবেক্ষণই শুধু করিনি; বরং তা রেকর্ডবন্দিও করেছি। স্রেফ সংবাদ পাঠানোর ব্যবস্থা যদি থাকতো এখানে, তাহলে আমার এ চিত্র ধারণ বিভিন্ন দেশের সংবাদ সংস্থার কাছে বিক্রি করা যেতো। অনেকেই তাজ্জব বনে যেতো এ ভিডিও দৃশ্য দেখে। কেননা পরিস্থিতির শিকার হয়ে আমি যা পেরেছি কোন সংবাদকর্মী তা দেখতে সক্ষম হবেন না। এ কারণে যে, কোথায় কখন কি ঘটবে সংবাদকর্মীরা তা আগে থেকে জেনে রাখার কথা নয়। ঘটনার পর তারা ছুটে যান অকুস্থলে, তারপর ছবি তোলা বা রিপোর্ট করা। এসব ক্ষেত্রে সংবাদের ভিডিও রেকর্ড যে কতটুকু গুরুত্ব বহন করে তা সংবাদকর্মী হিসেবে আমার অজানা নয়। কিন্তু

দুর্ভাগ্য আমার– ধারণ করা চিত্র আমি কোন সংবাদ সংস্থার কাছে বিক্রি কিংবা আমাদের সংবাদ সংস্থাকেই পাঠাতে পারছি না কমিউনিকেশনের অভাবে। শুধু পয়সার জন্য নয়, এমন একটা কারেন্ট ইস্যু আমি প্রকাশের কোন সুযোগ করতে না পারায় বেশ অস্বস্তি লাগছে।

আজ এলিয়েদা আসেনি আমার সাথে। গতকালের পর থেকে এ পর্যন্ত একবারও দেখা করেনি। না আসুক, আসলে আমিই কি ওকে কিছুটা আস্কারা দিয়ে ফেলেছিলাম? না দিয়েই বা উপায় ছিল কি! আমি এসেছি ওদের আইডেন্টিফাইয়ে। প্রতিনিধি দলের প্রধান একজন পাকিস্তানী হলেও ইউএন-এর এ কার্যক্রমে বিন্দুমাত্র অনিয়মের অভিযোগ ওঠলে ভবিষ্যতে যুদ্ধকবলিত কাশ্মীরে আর কোন মানবাধিকার সংস্থা কাজ করতে আগ্রহ দেখাবে না। অথচ যুদ্ধবিধ্বস্ত কাশ্মীরের বিপন্ন মানুষগুলোর প্রতি বিশেষত যুদ্ধাহত মুজাহিদদের কল্যাণে সামান্যতম সহায়ক কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাই আমি এলিয়েদাকে এড়িয়ে চলে তাকে নারাজ হতেও দিতে পারি না। গতকালের ঘটনা আযাদীর লক্ষ্যে লড়াইরত মুজাহিদদের জন্য যেমন একটি গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য, তেমনি আমার এবং এলিয়েদার জন্যও একটি স্মরণীয় মুহূর্ত।

বিকেলে বেরুনোর সময় প্রতিদিনই এলিয়েদা আসে আমার সাথে পাহাড়ে ঘুরতে। সকালে আমি গ্রামে গ্রামে ঘুরি। বিকেলে বেশিরভাগ দিনই পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াই। সকাল নয়টা থেকে দুপুর দুইটা পর্যন্ত ডাক্তাররা এই মেডিকেল সেন্টারে কাটান। বিকেলে ছুটি এবং রাতে একবার করে রোগীদের খোঁজ-খবর নেয়া হয়। ডা. এলিয়েদা বিকেল বেলাটা অবসর কাটায়। ফলে প্রায় প্রতিদিনই বিকেলে আমার সাথে ঘুরতে বের হতো। গতকালও বেরিয়ে ছিল।

আমরা হাঁটতে হাঁটতে একটা টিলার ওপরে এসে দাঁড়ালাম। ছোট বড় পাথরের ফাঁক গলে দু'একটা আগাছা জন্মেছে। কতক দূরে দূরে বড় বড় গাছও আছে। লতা-গুল্মের ফাঁক গলে সরু রাস্তার মতো দেখে দেখে পথ চলতে হয়। তখন সূর্য পশ্চিম আকাশে একেবারে হেলে পড়েছে। পাহাড়ি অঞ্চলে অন্ধকার নেমে আসে একটু আগেই। কিন্তু আমরা যে টিলাটায় উঠেছি সেটা বেশ উঁচু এবং উত্তর-পশ্চিম কোণ বরাবর পাহাড়ের পাদদেশে এ টিলাটার অবস্থান হওয়ায় চারদিক তখনো বেশ ফর্সা মনে হচ্ছিল। এ সময় আকাশে একটি জঙ্গি বিমানের প্রচণ্ড শব্দ শুনতে পেলাম। দু'জনই আকাশের দিকে তাকিয়ে বিমানটিকে বেশ কাছে ঘুরপাক খেতে দেখলাম। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে তার পূর্ব-দক্ষিণ কোণে পাহাড়ের পাদদেশের দু'কিলোমিটার পর্যন্ত এলাকা মুজাহিদদের কব্জায় রয়েছে। বিমানটি মুজাহিদ নিয়ন্ত্রিত এলাকায় চক্কর দিচ্ছে। আমি কি ভেবে তখন ভিডিও ক্যামেরা অন করলাম। বিমানটি ভয়ানক শব্দে ঘুরপাক খাচ্ছে প্রায় মাথার ওপর। আমার মন বলছে, এটি মুজাহিদদের শিকারে পরিণত হয়েছে।

ক্যামেরায় চোখ রেখে লক্ষ করলাম, বিমানটিতে আগুন ধরে গেছে। খুব দ্রুত ঘটনাটি ঘটলেও আমি তখনও স্বাভাবিকভাবেই পর্যবেক্ষণ করে যাচ্ছিলাম। গগনবিদারী শব্দের প্রচণ্ডতায় তখন এ পাহাড়ি উপত্যকা থরথর করে কাঁপছে যেন। কাঁপছি আমিও, তবে তখনও জ্ঞান হারাইনি। দেখলাম, ভয়ে এলিয়েদা চিৎকার করে আমাকে জড়িয়ে ধরেছে দু'হাতে। বিমানটি ভূপাতিত হলো– আমাদের থেকে তিন-চারশ' গজ দূরে অপেক্ষাকৃত সমতল ভূমিতে। দৃশ্যটা দেখেছি, কিন্তু আর মনে করতে পারছি না। কিছুক্ষণের জন্য আমিও জ্ঞান হারালাম।

সম্বিত ফিরে পেয়ে দেখতে পেলাম এলিয়েদা ও আমি জড়াজড়ি করে গড়িয়ে পড়ে একটা মস্ত পাথরের গায়ে আটকে আছি। তিন-চারশ' গজ দূরে আগুন জ্বলছে ধোঁয়ার কুণ্ডলি পাকিয়ে। নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে গিয়ে মনে হলো এলিয়েদার জ্ঞান নেই। তবে শক্ত করে দু'বাহু পেঁচিয়ে জড়িয়ে আছে আমাকে। আমি কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে ডাক দিলাম তাকে। কোন সাড়া পেলাম না। দু'হাতে চোয়াল ধরে দেখতে লাগলাম দাঁত কপাটি লেগে আছে কি না। আবারও ডাকলাম, হাই এলিয়েদা! প্লিজ, জবাব দাও! না, কোন সাড়া নেই। এবার চোয়াল ধরে পর পর কয়েকটি ঝাঁকি দিয়ে ডাকলাম। দেখি তার বাহু বন্ধন আরও শক্ত হয়ে ওঠছে। একেবারে আমার গায়ের সাথে লেপ্টে যাচ্ছে যেন। গাঢ় একটা গরম নিঃশ্বাস ছাড়লো আমার মুখে। চোখ মেলে চাইলো। তার চোখের ভাষায় আমি অন্য এক এলিয়েদাকে আবিষ্কার করলাম। এবার জোর করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে যাবো, ঠিক তখনই লক্ষ করলাম, তার লিপস্টিক রাঙা ওষ্ঠদ্বয় এগিয়ে আসছে আমার ঠোঁট বরাবর। তাড়াতাড়ি এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালাম। এলিয়েদা খানিকটা চোট পেল পাথরের গায়ে পড়ে। আঘাত বেশি দেহে পেয়েছে না মনে, তা বুঝতে খানিকটা সময় লাগলো আমার। এবার তার দিকে তাকিয়ে বললাম, সরি, উই আর নট সেফ! প্লিজ ফলো মি, কুইক!

এলিয়েদা নির্বিকার আমার দিকে ক্রূর দৃষ্টি হেনে ওঠে দাঁড়ালো। বিড়বিড় করে বললো, কাউয়ার্ড!

আমি ভেবে পেলাম না এমন ভয়ানক পরিস্থিতিতে কি করে এলিয়েদা এমন আবেগতাড়িত হয়ে পড়লো। আমি তার অনাকাঙ্ক্ষিত রুষ্টতার কোন জবাব না দিয়ে কি করে তাঁবুতে ফেরা যায় তাই চিন্তা করছি। যে দিক দিয়ে পাহাড়ে চড়েছি সে পথে ফিরে যাবার উপায় নেই। তাই পশ্চিম-উত্তর কোণে ঝোপ জঙ্গল ও পাথরের বাধা ডিঙিয়ে এগুতে লাগলাম। এলিয়েদা আমার পিছু পিছু আসছে বটে, তবে রাগে নাকি ক্ষোভে তার সাদা চামড়ার মুখখানি রক্তবর্ণ ধারণ করেছে।

বিধ্বস্ত বিমান থেকে কুণ্ডলি পাকিয়ে ধোঁয়া ওঠে আকাশে ছড়াচ্ছে। এমনিতেই সন্ধ্যার অন্ধকার বেশ গাঢ় হতে চলেছে। ভারতীয় বাহিনী বিধ্বস্ত বিমানের নিয়ন্ত্রণ নিতে আক্রমণ চালায় কিনা অথবা অপারেশনরত মুজাহিদদের নজরে পড়ে যাই কিনা এমন ভয় ছিল মনে। পেছনে ফিরে দেখি এলিয়েদা ও আমার মাঝে দূরত্ব বাড়ছে। আমি তার জন্য দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করলাম। সে তেমনি হেঁটে আসছে। মোটেও যেন তাড়া নেই। সে ধীরভাবে কাছে এসে বললো, আমি ঠিক আছি, আমার জন্য ভাবতে হবে না। তুমি এগোও।

বাঙালি জেদী মেয়ের মতোই কথা যেন। ভাষা ও পরিবেশের কারণে ভিন্ন ভিন্ন দেখালেও মানুষের বেসিক মনো-অনুভূতির প্রকাশ প্রায় একই রকম। ইংরেজিতে তুই-তুমি-আপনি এসব কেবল মাত্র (ইউ) একটি শব্দেই প্রকাশ করা হয়। এ পর্যন্ত এলিয়েদার কথার ধরন বুঝে মনে হয়েছে, এতদিন আমাদের সম্পর্কে 'আপনি' সম্বোধনটাই বলবৎ ছিল। কিন্তু আজকের তার প্রতিটি কথাই আমাকে সম্বোধনের ক্ষেত্রে 'তুমি' বলে মনে হচ্ছে।

বললাম, তুমি আমার ওপর রেগে আছো! তুমি বুঝতে পারছো না এ স্থানটা আমাদের জন্য এখন মোটেও নিরাপদ নয়। শিগগিরই আমাদের তাঁবুতে ফিরতে হবে।

: তুমি নিজে কাপুরুষ বলে প্রত্যেককেই তোমার মতো ভীরু মনে করো? তোমার কাছে মানুষের কোমল অনুভূতির কোনই মূল্য নেই। তোমাকে একটু ব্যতিক্রম ভেবেছিলাম, আর তুমিই আমাকে এমন অবজ্ঞা দেখালে যে, আমি যেন একটা অচ্ছুৎ! আকস্মিক বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার আনন্দটাই তুমি বরবাদ করে দিলে!

মিস এলিয়েদা! প্লিজ বুঝতে চেষ্টা করো! বিপদ থেকে রক্ষা পেয়ে তোমরা যে ধরনের সেলিব্রেট এনজয় করো আমাদের কাছে তা পাপ! আমরা বিপদ থেকে রক্ষা পেয়ে মহান আল্লাহর শুকরিয়া জানানোকেই কর্তব্য মনে করি। মানুষের ওপর বিপদ যিনি দেন তিনিই আবার রক্ষা করেন।

এবার সে আমার পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বললো, তুমি ধর্মীয়ভাবে গোঁড়া তা জানলেও এতটা ধর্মান্ধ এমনটা জানা ছিল না! তুমিই না সেদিন বলেছিলে, তোমাদের আল্লাহ মানুষের ওপর কখনোই জুলুম করেন না! ইসলাম একটি সাম্য-মৈত্রীর ধর্ম, ভারসাম্যপূর্ণ এক শাশ্বত আধুনিক জীবনব্যবস্থা!

সত্য এবং ন্যায়ের ধর্ম ইসলাম অবশ্যই এক শাশ্বত জীবনব্যবস্থার নাম। মানুষের সার্বিক কল্যাণের জন্যই মহান স্রষ্টা দুনিয়ার জিন্দেগীতে সঠিক পথে চলার জন্য কিছু নিয়ম-নীতি, বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন। আসলে দুনিয়াটা হলো মানুষের জন্য একটা পরীক্ষা ক্ষেত্র। এখানে মানুষ স্রষ্টার বিধান মতো

চললো কি না– তার পরীক্ষা শেষে আখেরাতে তাকে পুরস্কার অথবা দণ্ড দেয়া হবে।

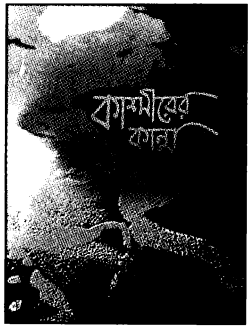
তাহলে তুমি বলতে চাও দুনিয়াতে মানুষ স্বাধীন, যেভাবে খুশি সেভাবেই চলতে পারবে! তবে ওইদিন না বলেছিলে, আল্লাহর হুকুম ছাড়া দুনিয়াতে কিছুই ঘটে না! বিষয়টি কি ডাবল স্ট্যান্ডার্ড বলে মনে হচ্ছে না?

তুমি একটা জটিল বিষয়ের অবতারণা করেছ। এটা বেশ ব্যাখ্যাসাপেক্ষ প্রশ্ন। তুমি যদি স্রষ্টার বিধান মহাগ্রন্থ আল-কুরআন এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস অনুশীলন করতে, তাহলে এসব জিজ্ঞাসার জবাব তুমি নিজে থেকেই পেয়ে যেতে। সংক্ষেপে আমি শুধু এটুকু বলতে চাই, বিশ্বজাহানের মহান প্রজ্ঞাময় স্রষ্টার দৃষ্টির আড়ালে সৃষ্টিজগতের বিন্দুমাত্রও নয়। তবে মানুষকে নির্দিষ্ট কিছু স্বাধীনতা প্রদান করা হয়েছে এবং এটুকু স্বাধীনতা সে কিভাবে ভোগ করলো স্রষ্টা শুধু তারই হিসাব নেবেন। সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব দিয়ে মানুষের কল্যাণের জন্যই মানুষের জীবন চলার বিধান আল্লাহ পাক নবীদের মাধ্যমে দুনিয়াতে অবতীর্ণ করেছেন। দেখে বুঝে সত্য-সুন্দরকে গ্রহণ করার জন্য বিবেকও দিয়েছেন আল্লাহ। অতএব, দুনিয়াতে কৃতকর্মের দায়ভার অবশ্যই মানুষকে বহন করতে হবে। আর সেই সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার সংগ্রামই করে মুসলমানরা। তাই আল্লাহর বিধানের বাইরে চলার মওকা নেই মুসলমানদের।

ডা. এলিয়েদা এবার কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেলো। কিছুক্ষণ আগের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার জন্য যাকে এতক্ষণ অপমানিত ও ক্ষুব্ধ দেখাচ্ছিল এখন তাকে দেখে মনে হচ্ছে সে ঘটনা যেন ভুলে গেছে সে। ক্ষুব্ধ রুষ্ট অপমানিত এলিয়েদাকে এখন দেখাচ্ছে ভাবুক এবং চিন্তাক্লিষ্ট। হঠাৎ প্রশ্ন করলো, মুসলমানরা প্রত্যেকেই কি তোমার মতো এমন নির্মোহ, সংযমী এবং স্রষ্টাভীরু?

বললাম, সত্যিকার আল্লাহভীরুতার খুব কম গুণাবলীই আমার মাঝে বিদ্যমান। আমার চেয়ে অনেক বেশি মুত্তাকী-পরহেযগার লোকের দেখা আমি অনেক পেয়েছি। ইসলামের ইতিহাস পাঠ করলে তুমি জানতে পারবে কত বড় বড় সাধক-মনীষী যুগে যুগে পৃথিবীর বহু স্থানে জন্মেছেন। হ্যাঁ, ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়। তবে আল্লাহর বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ এবং অশিক্ষার ফলে অনেক মুসলমানের মধ্যে সত্যিকার ঈমানদারের গুণাবলী খুঁজে পাওয়া যায় না। এমন লোকের সংখ্যাও মুসলমান সমাজে নেহায়েত কম নয়।

পূর্বদিকে ধোঁয়ার কুণ্ডলি, অন্যদিকে পরিষ্কার আকাশে তারার মেলা। হাত ঘড়িতে চোখ বুলিয়ে দেখি মাগরিবের আযান হয়ে যাওয়ার কথা বেশ কিছুক্ষণ আগেই। পাহাড়ি পথ বেয়ে দ্রুত পা চালালাম তাঁবুর উদ্দেশে, যাতে নামাযটা কাযা না হয়ে যায়।



আট

একটা বড়সড় পাথরের ওপর বসে গতকালের কথাই ভাবছিলাম। পাহাড় থেকে তাঁবুতে যেতে যেতে আরো অনেক কথাই হয়েছিল এলিয়েদার সাথে। ইসলাম সম্পর্কে জানার একটা কৌতূহল এলিয়েদার মাঝে লক্ষ্য করেছি প্রথম থেকেই। বেশ ক'দিন আসরের নামায পড়তে দেখেছে সে আমাকে। আমাদের প্রার্থনার রীতি দেখে সে বেশ বিস্মিত হয়েছে। গতকালের পর সে একবারও আমার সাথে দেখা করেনি। এলিয়েদার আজকের অনুপস্থিতিতে কেন যেন মনের গহীনে একটু ব্যথার উদ্রেক হলো।

আমি যেখানে বসে আছি তা থেকে একশ' গজ দূরেই বিধ্বস্ত ভারতীয় জঙ্গি বিমানের ধ্বংসাবশেষ পড়ে আছে। মুজাহিদদের তথ্য কেন্দ্রের বরাত দিয়ে আজকের পত্রিকা লিখেছে– প্যারাস্যুটে অবতরণকালে জঙ্গি বিমানের পাইলটসহ একজন মেজর ও দু'জন ক্রু মুজাহিদদের হাতে বন্দি হয়েছে। সেনাদের হাতে বন্দি মুজাহিদদের মুক্তির লক্ষ্যে এদের নিয়ে দরকষাকষি হবে।

আবার সেই বিধ্বস্ত বিমানটির দিকে তাকালাম। এখন পর্যন্ত এর ধ্বংসাবশেষ মুজাহিদরা সরিয়ে নেয়নি। ভারতীয় বাহিনীও এ পর্যন্ত ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার অভিযান চালিয়ে সফল হয়নি। তবে তারা হিংস্র হায়েনার মতো মরিয়া হয়ে আক্রমণ চালাবে বলে গুজব শোনা গেছে। একটি মানুষও আমার চোখে পড়লো না এ পর্যন্ত। তবে এতদূর আসা আমার উচিত হয়নি বলে মনে হচ্ছে। কেননা, যে কোনো সময় এখানে আক্রমণ পাল্টা আক্রমণ শুরু হয়ে যেতে পারে।

আসলে আনমনে হাঁটতে হাঁটতে কখন যে এতদূর এসে পড়েছি খেয়ালই করিনি। পকেট থেকে মিনি ক্যামেরা বের করে দুটি ছবি তুললাম। তারপর বিপরীত দিকে হাঁটা শুরু করলাম।

বিজন এ পাহাড়ি উপত্যকায় হাঁটতে হাঁটতে কেন জানি মনের মধ্যে একটা গা ছমছমে ভয় উঁকি দিয়ে ওঠলো। শুকনো পাতায় পা পড়লেও চমকে এদিক সেদিক তাকাই। না, কিছুই চোখে পড়ছে না। হতে পারে আমার আশপাশেই ওঁত পেতে বসে আছে কোন মুজাহিদ অথবা ভারতীয় সৈন্য। মনের মধ্যে আরেকটা আশঙ্কা দানা বেঁধে ওঠলো। বিধ্বস্ত বিমানটির আশপাশে ভূমি মাইন পুঁতে রাখা বিচিত্র কিছু নয়। এমনি বিপদসংকুল পরিবেশে আমার বিচরণ দেখে নিজের এই নির্বুদ্ধিজনিত দুঃসাহসিকতায় নিজেই বিস্মিত হলাম।

পাহাড়ের এই উপরিভাগটায় বিচিত্র বৃক্ষরাজির সমারোহ। সবুজে সবুজে ছেয়ে আছে গাছ-গাছড়া লতাগুল্ম। পাখির টিটি শব্দে চমকে ওঠলাম। গাছের ডালে বসে আছে বেশ কিছু টিয়া পাখি। বাংলাদেশের খুব পরিচিত কিছু কিছু পাখিও এখানে দেখা যায়। তার মধ্যে কাক অন্যতম। মনে হয় কাক পৃথিবীর সব দেশেই আছে। সেদিন এলিয়েদাকে ময়না ও টিয়া পাখি দেখিয়ে বলেছিলাম, আমাদের দেশে এ দুটি পাখিই পোষা হয় এবং বাংলা ভাষায় এদের বিভিন্ন কথাও শেখায় পাখিপ্রেমিকরা। এলিয়েদা বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলে বলেছিল, সত্যিই কি পাখিরা মানুষের মতো কথা বলতে পারে? আমি বলেছিলাম, হ্যাঁ, আমি নিজের কানে শুনেছি ময়না ও টিয়া পাখির কথা বলা। বেশ কিছু শব্দ ওরা আত্মস্থ করতে পারে।

এলিয়েদা জানতে চেয়েছিল কাশ্মীরে পাখি পুষে কথা শেখানো হয় কি না।

জবাবে বলতে হলো, আমার জানা নেই। নিত্য অশান্ত এই অঞ্চলের মানুষের মধ্যে এমন শখের কাজ করার মওকা কোথায়?

পশ্চিম আকাশে লাল বলের মতো সূর্যটা ক্রমেই যেন নিস্তেজ হয়ে আসছে। সন্ধ্যার অন্ধকার এখনই গ্রাস করবে পাহাড়ি উপত্যকাকে। পা চালিয়ে হাঁটছি তাঁবুতে ফিরে যেতে। একা একা ঘুরতে তেমন ভালো লাগেনি আজ।

টিলা থেকে নামতে শুরু করেছি। আমার ডানে বামে অপেক্ষাকৃত সমতল ঢালু ভূমি। গাছ-গাছড়াও এদিকটায় বেশ কম। হঠাৎ বাম পাশে একটা মস্ত পাথরে আমার চোখ আটকে গেল। সেখান থেকে বেরিয়ে আসছে কালাশনিকভ রাইফেলধারী তিন যুবক। মুখে দাড়ি, মাথায় পাগড়ি ও পরনের পোশাক দেখে বুঝতে অসুবিধা হলো না যে ওরা মুজাহিদ। তারা আমার থেকে চল্লিশ পঞ্চাশ

হাত সামনের দিকে পাথরের গায়ের সাথে দাঁড়িয়ে আছে। আমার সামনে তাদের পেছনের দিক থাকায় তারা আমাকে দেখতে পায়নি। তাদের দেখে কিছুটা ভয়ের সঞ্চার হলো আমার মনে। আমাকে দেখে ফেললে নিশ্চিত ধরে নিয়ে যাবে তাদের ক্যাম্পে অথবা ধমক দিয়ে ছেড়েও দিতে পারে। আমি ঝামেলা এড়াতে ডান দিকে ঢালু পথে নেমে যাবো এমন সিদ্ধান্ত নিলাম। ডান দিকে তাকিয়ে আমার চক্ষু তলবড়া হয়ে গেলো। দেখি উদ্যত মেশিনগান হাতে দু'জন ভারতীয় সেনা একেবারে আমার ত্রিশ হাতের মধ্যে এসে পড়েছে। ভয়ে আমার কণ্ঠতালু শুকিয়ে কাঠ। শরীরের লোমকূপ খাড়া হয়ে ওঠলো। বেশি কিছু ভাববার সময় পেলাম না। ততক্ষণে মুজাহিদদের সোজা এসে পড়েছি আমি। এতক্ষণ যে ভারতীয় সেনারা আমাকে কেন গুলি করেনি সেটাই বিস্ময়ের ব্যাপার।

হঠাৎ বাম দিকে গড়িয়ে একটা মোটা বৃক্ষের আড়ালে গিয়ে পড়লাম। আমার থেকে মাত্র পাঁচ হাত দূরেই মুজাহিদরা দাঁড়িয়ে আছে পেছন ফিরে। আসলে আমি যেখান দিয়ে আসছিলাম তার দু'দিকে বেশ ঢালু থাকায় সম্ভবত ভারতীয় সৈন্যরাও মুজাহিদদের দেখতে পায়নি। আমি গড়িয়ে পড়লেও চোখ আমার স্থির ছিল ভারতীয় সৈন্যদের দিকে। এতক্ষণে ওদের মেশিনগানের নল আমার দিকেই তাক করা ছিল। ট্রিগার চাপতে যা দেরি, কিন্তু ওরা ওপরে উঠে মুজাহিদদের এমন অসতর্ক দেখে তাদের অস্ত্রের মুখ মুজাহিদদের দিকে তাক করলো। আমি গাছের আড়াল থেকে চিৎকার করে মুজাহিদদের সতর্ক করে দিলাম। উদ্যত কালাশনিকভসহ তিন জনই ফিরে তাকালো পেছন দিকে। সম্ভবত ভারতীয় সৈন্যরাও আমাকে সশস্ত্র ভেবে দু'দিকে দু'জন এটেনশান হয়ে হাঁটু গেড়ে অস্ত্র তাক করলো। এই সুযোগে দু'জন মুজাহিদ দুদিকে পাথরের বিপরীতে শরীরটাকে ঠেলে দিতে পারলেও একজন সরতে পারলো না। ঠিক এ মুহূর্তেই গাছের গোড়ায় আমাকে লক্ষ্য করে একজন সৈন্য এক পশলা গুলি ছুঁড়লো। আমি ছিটকে গিয়ে পাথরের পাশে মুজাহিদ যুবকটিকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলাম জমিনে। ততক্ষণে দ্বিতীয় সৈন্যটিও গুলি ছুঁড়েছে আমাদের লক্ষ্য করে। কয়েকটি গুলি আমার মাথার ওপর দিয়ে পাথরের গায়ে আছড়ে পড়লো। আমি উপলব্ধি করছি, আমি সংজ্ঞা হারাচ্ছি। মুজাহিদ ভাইটিকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবার সময় পাথরে আমার মাথায় আঘাত লেগেছে নাকি গুলিবিদ্ধ হয়েছি তা অনুমান করতে পারলাম না। সংজ্ঞা হারানোর মুহূর্তে কেবল চেয়ে দেখলাম, পাথরের আড়াল থেকে দু'জন মুজাহিদ ভাইয়ের গুলিতে ভারতীয় সৈন্য দুটি কাটা গাছের মতো আছড়ে পড়ছে জমিনে।

* * *

কত ঘণ্টা পর আমি জ্ঞান ফিরে পেয়েছি জানি না। মাথায় প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করছি। গোটা শরীর এতো অবসন্ন হয়ে আছে যে, হাত দুটিও নাড়াতে পারছি না। কপালে বিশেষ করে দুই ভ্রূ'র নিচে ব্যথাটা যেন একটু বেশি। চোখজোড়া খুলতে চেষ্টা করলাম। মনে হলো দু'চোখের পাতা ঠিক যেন সুপারগ্লু দিয়ে আটকানো। চোখজোড়া মেলতে কষ্ট হচ্ছে। ঠিক এ সময় একটি কোমল হাতের স্পর্শ পেলাম কপালে। তারপর মাথায় আলতোভাবে হাতখানা সঞ্চালিত হলো। বেশ কিছুটা আরাম বোধ করলাম। বাড়িতে জ্বরটর হলে মা এভাবে মাথায় হাত বুলাতেন। আমার মনে হচ্ছে আমি যেন গ্রামের বাড়িতে জ্বরের ঘোরে শুয়ে আছি। আর মা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। চুলে বিলি কেটে দিচ্ছেন, আর আমি আরামে-আবেশে চোখ দুটি মুদে আছি। কিন্তু এই স্পর্শটুকু স্থায়ী হলো না। আমি দেখার জন্য আবার চোখ মেলে চাইতে চেষ্টা করলাম। খুব কষ্ট করে চোখের পাতা ফাঁক করলাম ঠিকই, কিন্তু দু'চোখে তখন তপ্ত অশ্রুর বান বইছে যেন। সিক্ত চোখে ঝাঁপসা দৃষ্টিতে দেখলাম আমার চারপাশে অসংখ্য বিছানায় সারে সারে রোগী শুয়ে আছে। কারো হাতে ব্যান্ডেজ, কারো বা একটা হাত অথবা পা কাটা। তাতে প্লাস্টার করা। কারো কারো হাত-পা আবার বেঁধে রাখা আছে সিটের সাথে। মাথাটা আমার এলোমেলো হয়ে গেলো। দৃষ্টি ঘুরাতেই দেখতে পেলাম আমার বেডের পাশেই দাঁড়িয়ে আছে এক অচেনা তরুণী। কেবল মুখাবয়ব বাদে সমগ্র শরীর তার কালো পোশাকে আবৃত্ত। মায়াবী দুটি চোখ দিয়ে যেন আমাকেই দেখছে।

কাতরকণ্ঠে বিড়বিড় করে বললাম, পা-নি..., পানি খাব।

তরুণী আমার কথা শুনতে পেরেছে কিনা জানি না। এত ক্ষীণ কণ্ঠ আমার– আমার কথা যেন আমিই শুনতে পেলাম না।

যন্ত্রণায় আমি আবার চোখ বন্ধ করলাম। তরুণীটি এবার জানতে চাইলো আমি কি বলছি। তার ভাষা উর্দু শুনে আমার চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছিল। উর্দুতেই বললাম, আমি কোথায়?

আল্লাহর শোকর! আপনি জ্ঞান ফিরে পেয়েছেন। আপনি এখন হাসপাতালে এবং নিরাপদ। প্রথমবার আপনি কি কিছু চেয়েছিলেন?

বললাম, বড্ড তেষ্টা পেয়েছে। একটু পানি পান করবো। কিন্তু আমি হাসপাতালে কি করে এলাম। কেনই বা এলাম?

সে সব পরে হবে। আমি এক্ষুণি ডা. ইবরাহিম ও এলিয়েদাকে নিয়ে আসছি। তাঁরা আপনার জ্ঞান ফেরার অপেক্ষায় অধৈর্য হয়ে আছেন। ওনারা এলে আপনাকে প্রয়োজনে পানি খেতে দেবেন। অল্পক্ষণ একটু ধৈর্য ধরুন, প্লিজ!

চোখ মেলে চেয়ে দেখি তরুণী আর এখানে নেই। ডা. এলিয়েদা ও ডা. ইবরাহিমের কথা শুনে আমার চিন্তার স্রোত কিছুটা স্বচ্ছ হয়ে এলো। মনে পড়ছে আমি এখন কাশ্মীরের কারগিল উপত্যকায়। একটি স্বেচ্ছাসেবী মেডিকেল টিমের সাথে এসেছি আইবিএ'র এসাইনমেন্টে। এরপর আস্তে আস্তে সব মনে পড়লো। মনে পড়লো ভারতীয় জঙ্গি বিমান ভূপাতিত হবার কথা, একা একা পাহাড়ে ঘুরে বেড়ানোর কথা, ভারতীয় সৈন্যদের গুলি ছোঁড়ার কথা, মুজাহিদদের গুলিতে ওদের নিহত হওয়ার কথা এবং আমি যে আহত হয়েছি তা সব এবার মনে পড়ছে।

ততক্ষণে ডা. ইবরাহিম, সেই তরুণী এবং ডা. আবদেল রহমান আমার বেডের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। ডা. ইবরাহিম আমাকে প্রশ্ন করলেন, হ্যালো, মি. হাসান! এখন কেমন বোধ করছেন?

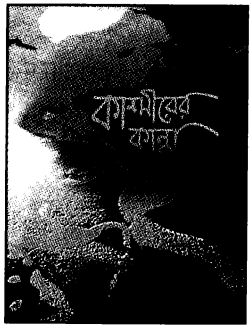
আমি চোখ মেলে চাইলাম তাদের দিকে। আবার চোখের কোণ বেয়ে তপ্ত অশ্রু গড়িয়ে পড়লো গাল বেয়ে। তেমনি ক্ষীণ স্বরে বললাম, মাথায় প্রচণ্ড পেইন হচ্ছে। শরীর খুবই অবসন্ন।

ডা. ইবরাহিম আমার বাম হাতের শিরায় পুশকৃত স্যালাইনের নলটা হাতে নিয়ে বললেন, আল্লাহর শোকর। আপনি সুস্থ হয়ে ওঠবেন ইনশাআল্লাহ! আর হ্যাঁ, পানি চেয়েছিলেন, কিন্তু দুঃখিত, এ মুহূর্তে পানি পান করা চলবে না। কোন অসুবিধা হবে না ইনশাআল্লাহ। একটু ধৈর্য ধরে থাকুন, দেখবেন তৃষ্ণা এমনিতেই কমে গেছে।

এই বলে তিনি স্যালাইনের ব্যাগে কি একটা ইনজেকশন পুশ করলেন। তারপর তরুণীর দিকে চেয়ে বললেন, মিস সুমাইয়া, হাসানের চোখ মুখটা ঠাণ্ডা পানিতে ন্যাকড়া ভিজিয়ে একটু পরিষ্কার করে দাও। কিছুক্ষণ পর কিছু সলিড খাবার দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

ডা. ইবরাহিম আমার মাথায় কতক্ষণ হাত বুলালেন। আবেশে আমি চোখ বন্ধ করে ফেলি। ঠাণ্ডা কাপড়ের স্পর্শে আবার চোখ মেলে চাইলাম। একটি পাত্রে পানিতে ভিজিয়ে ন্যাকড়া চিপে আমার চোখ মুখ মুছে দিচ্ছে সেই তরুণী।

ডা. ইবরাহিম ও আবদেল রহমান এখানে নেই। আশ্চর্য আরামে আবার চোখ বন্ধ করলাম।



নয়

মাথার ব্যথাটা কিছু কমেছে বটে, কিন্তু মনের গভীরে চরম অনিশ্চয়তার বিষাদময় যে কালো মেঘ জমাট বেঁধেছে তার পরিণতি কি তা কেবল বিধাতাই জানেন। কতদিন এই বিদেশ-বিভূঁইয়ে বিপদসংকুল পাহাড়ি উপত্যকায় আমাকে নিঃসঙ্গ কাটাতে হবে জানা নেই। ডা. ইবরাহিম গতকালই আমাকে আরেক দফা চেকআপ করে রিপোর্ট দিয়েছেন, অন্তত চার সপ্তাহ বেড রেস্টে থাকতে হবে। কোন অবস্থাতেই যেন দীর্ঘ ভ্রমণের চিন্তা মাথায় না আনি। মাথার চামড়া ভেদ করে একটা গুলি ছুটে গিয়েছিল। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে প্রাণে বেঁচে গেছি। কিন্তু পাথরের গায়ে ঠোক্কর লেগে নাকি মস্তিষ্কের বিরাট ক্ষতি হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছি। তবে এখনো বিপদ মুক্ত নই। দীর্ঘ বিশ্রামে কেবল মস্তিষ্কের সূক্ষ্ম কোষগুলো স্বাভাবিক হয়ে আসবে। এ অবস্থায় ভ্রমণ বা অধিক নড়াচড়ায় অন্ধত্ব, এমন কি মস্তিষ্ক অকার্যকর হবার শঙ্কা রয়েছে। কত সাবলীলভাবে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ইবরাহিম আমাকে এ কথা জানাতে পারলেন।

কাল যখন আমাকে কথাগুলো বলছিলেন তখনও হয়তো কারোরই জানা ছিল না যে, আজই তাদেরকে এখান থেকে চলে যেতে হবে। সিডিউল মতো আরও দু'দিন এখানে থাকার কথা। বিশেষ প্রয়োজনে দু'চারদিন দেরিও করতে পারতেন। কিন্তু আজ সকালে সংবাদপত্রের খবর পড়ে এবং মুজাহিদদের পরামর্শে এখানে তাদের থাকা আর মোটেই নিরাপদ মনে করলেন না। গত সপ্তাহে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরে যান। মুজাহিদরা তখনই বুঝতে পেরেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন এমন কিছু নওয়াজের কাছ থেকে আদায় করে ছাড়বেন, যাতে কাশ্মীর যুদ্ধে

মুজাহিদদের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়তে পারে। কিন্তু এমন ভয়ঙ্কর সিদ্ধান্তের কথা কেউ কল্পনায়ও আনেনি। নওয়াজ শরীফের কথামতো যদি পাকিস্তানী সৈন্যকে এই অঞ্চল থেকে সরিয়ে নেয়া হয়, তাহলে এই কারগিল মুজাহিদরা আর কতদিন দখলে রাখতে পারবে তাতে বিস্তর সংশয় রয়েছে। কেবল ময়দানে লড়াইয়ের জন্য নয়, কাশ্মীরে পাকিস্তানী সৈন্যদের অংশগ্রহণ মুজাহিদদের প্রেরণারও উৎস। তাই পাকিস্তানী সৈন্যদের কারগিল থেকে তুলে নেয়ার সিদ্ধান্তে মুজাহিদ বাহিনী এমন কি পাকিস্তানের সেনাবাহিনীতেও চাপা গুঞ্জন চলছে। এ অবস্থায় কোন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাও এখানে আর নিরাপদ নয়। তাই আজ সকালে আমাদের মেডিকেল টিম নিরাপদে ফিরে যাবার আশায় ইসলামাবাদে রওয়ানা হয়ে যায়।

ডা. ইবরাহিম আমাকে সাবধান করে বলেছেন, মি. মাহমুদ, ইউ আর এ লাকিম্যান। কারণ আপনার মস্তিষ্কের সূক্ষ্ম রক্তনালীতে এক জায়গায় কিছুটা রক্ত জমাট বাঁধার প্রক্রিয়া চলছিল। আমি প্রাথমিক চেকআপের পর আপনার জ্ঞান ফিরে আসার ব্যাপারে বেশ শঙ্কিত ছিলাম। আল্লাহর শোকর। এ ধরনের আঘাতে প্রতিবন্ধী হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু আপনি প্রাথমিক আশঙ্কা থেকে মুক্ত হয়েছেন বটে। বাট বি কেয়ারফুল। এ মুহূর্তে আপনার সফর কোন অবস্থাতেই সম্ভব নয়। জীবন-মৃত্যু আল্লাহর হাতে। মুজাহিদ কমান্ডার শেখ ওসামার সাথে আমার বিস্তারিত কথা হয়েছে। আপনার নিরাপত্তা এবং শুশ্রূষার ভার নিতে পেরে বরং খুশিই হয়েছেন। কারণ নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে নাকি তিনিসহ তিন মুজাহিদের জীবন আল্লাহ পাক আপনার উসিলায় রক্ষা করেছেন। তিনি এ মুহূর্তে প্রচণ্ড রকমের ব্যস্ত। তথাপি শিগগিরই ছুটি নিয়ে আপনার সাথে মিলিত হবেন। এই অস্থায়ী মেডিকেল সেন্টার যতদিন সম্ভব এখানে রাখবেন বলেছেন। নিরাপত্তার আশঙ্কা বোধ করলে তা স্থানান্তরিত করবেন। তবে আপনার ব্যাপারে তিনি সম্ভাব্য সব রকম সহযোগিতা করবেন এবং ইসলামাবাদ পৌঁছানো পর্যন্ত আপনার হেফাজতের জিম্মা তিনি নিয়েছেন।

আপনাকে একটা ব্যাপারে বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করে যাচ্ছি। কোন অবস্থাতেই জেদের বশে কিংবা অস্থির হয়ে অন্তত তিন সপ্তাহ পূর্ণ বেড রেস্ট না নিয়ে সফরে বের হবেন না। আমি আশাবাদী, আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠবেন ইনশাআল্লাহ। আর হ্যাঁ, সম্পূর্ণ সুস্থবোধ করলেও কিন্তু তিন সপ্তাহের আগে সফরের চিন্তা মাথায় আনবেন না। এই মেডিকেল সেন্টারের সেবিকা মুজাহিদ কমান্ডার শেখ ওসামার বোন সুমাইয়াকে সব বুঝিয়ে বলে যাচ্ছি, আশাকরি আপনার কোন তকলিফ হবে না। সি ইজ ভেরী জেন্টেল এন্ড সিনসিয়ার। তার কর্মদক্ষতা ও সেবার মানসিকতা আমাদের মুগ্ধ করেছে। ওষুধপত্র যতদূর সম্ভব

দিয়ে যাচ্ছি এবং এখানকার ডাক্তারদেরও সাজেস্ট করে যাচ্ছি। কখন কি দরকার হবে তাও বুঝিয়ে দিয়ে যাচ্ছি।

আমি ফ্যাল ফ্যাল চোখে ডাক্তার ইবরাহিমের কথা শুনে একটা ঢোক গিললাম। এবার আমার দিকে এগিয়ে এলেন নাইজেরিয়ান ডাক্তার আবদেল রহমান। তিনি বললেন, উই আর ভেরি সরি, মি. মাহমুদ। আপনাকে ছেড়ে যেতে আমাদের কষ্ট হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু কোন উপায় যে নেই। জানি না, আর কোনদিন দেখা হবে কিনা, তবে আপনার সান্নিধ্য দীর্ঘদিন মনে থাকবে।

বুকের ওপর রাখা আমার হাত দুটি তার নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে বিদায়ের শেষ উষ্ণতা বিনিময় করলেন। বিড়বিড় করে বললেন, আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন। আল্লাহ হাফেজ।

সকলেই আস্তে আস্তে চলে গেলেন তাঁবুতে। তাঁরা চলে যাবার পর মনে হলো এলিয়েদা কেন দেখা করতে এলো না। বিদায় নেয়ার সৌজন্যটুকুও কি সে দেখাবে না আমার সাথে! তাহলে কি সত্যিই সে সিরিয়াস রাগ করে আছে! কিন্তু কেন, কেন সে আমার ওপর এত অভিমান করে থাকবে? কোন অধিকার বলে সে এতটা কঠোর আচরণ দেখালো আমি বুঝতে পারলাম না। কিন্তু আমিই বা এসব ভাবছি কেন? এলিয়েদা কে যে, তার এরূপ আচরণে আমি কষ্ট পাব। তবু মনের কোন অজানা স্থানে যেন বিষাদের একটা সুর রিন রিন করে বেজে ওঠলো। চোখ বন্ধ করে ডা. ইবরাহিমের কথাগুলো ভাবছিলাম। যদি কথামতো আমাদের ইসলামাবাদ ব্যুরো অফিসে খবরটা পৌঁছায়, তবে সতীর্থ সাংবাদিক বন্ধুদের কি প্রতিক্রিয়া হবে জানি না। এ পর্যন্ত দেশে কোন খবর পাঠাতে পারিনি। না জানি মা আমার জন্য চিন্তায় কতটা ব্যাকুল হয়ে আছেন। হায়! এখান থেকে যদি একটা টেলিফোন করতে পারতাম! কিংবা একটা চিঠি দিতে পারতাম মায়ের কাছে, তাহলে অন্তত মনটাকে কিছুটা প্রবোধ দিতে পারতাম। কিন্তু এখানকার প্রতিটা ম্যাসেজ সে যে কোন মাধ্যমেই হোক, পাঠাতে গেলে রাজধানী শ্রীনগরে সেন্সর হবে। শুনেছি ফরেন সার্ভিস টেলিফোনও নাকি রেকর্ড করা হয়। সন্দেহজনক কোন কিছু পেলে আর রক্ষা নেই। তাই এমন আশা করা বৃথা।

বেডের কাছে কে যেন এসে দাঁড়ালো। চোখ বন্ধ রেখেও আমি অনুমান করতে পারলাম, কেউ আমার কাছে এসেছে। চোখ মেলে দেখি মিস সুমাইয়া দাঁড়িয়ে। মেয়েটার শুধু মুখখানাই দেখেছি। এমন মায়াবী চোখ, মুখের গড়ন, কোন প্রকার প্রসাধন ছাড়াই রক্তাভ ঠোঁট যেন গোলাপের পাপড়ি জোড়া। কাশ্মীরের মেয়েরা এমনিতেই খুব সুন্দরী। এর প্রমাণ কাশ্মীর এসে পেয়েছিও। তবে অভিজাত সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েদের খুব কমই চোখে পড়েছে। কিন্তু সুমাইয়ার চেহারায়

আলাদা ধরনের এক ব্যক্তিত্বের ছাপ আমি স্পষ্ট লক্ষ্য করেছি। অপ্রয়োজনে একটা কথাও সে বলে না। আমার প্রতি তার আন্তরিকতার একটা তাগিদ আমি অনুভব করেছি ইতোমধ্যে। হতে পারে তার ভাইকে বাঁচাতে গিয়ে আমার এ দশা হয়েছে, তা জেনেই হয়তো এমন আন্তরিকতার প্রকাশ দেখিয়ে থাকবে।

জ্ঞান ফিরে পাবার পর এলিয়েদা একদিন আমার পাশে মোটামুটি দীর্ঘ সময় কাটিয়েছিল। তার কাছেই জেনেছি, দীর্ঘ আটচল্লিশ ঘণ্টা আমি অজ্ঞান ছিলাম। সুমাইয়া সম্পর্কেও সে বেশ প্রশংসা করেছে। সেই আমাকে জানিয়েছিল, সুমাইয়া মাত্র সেকেন্ডারী পাস হলেও মোটামুটি ভালোই ইংরেজি বলতে পারে। রক্ষণশীল পরিবারের সন্তান বলেই পরিবারের পক্ষ থেকে সরকার নিয়ন্ত্রিত একাডেমিক পড়াশোনা এর বেশি করতে দেয়া হয়নি তাকে। তবে মাদরাসার কিতাবাদি সে নিজে নিজে পড়েছে এবং তার বিদূষী মায়ের কাছে অনেক দুর্বোধ্য কিতাবাদি পড়ে সম্যক জ্ঞান লাভ করেছে। এখানে মুজাহিদদের সেবার লক্ষ্যে এই মেডিকেল সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হবার পর নার্সিংয়ের জন্য তিন মাসের বিশেষ প্রশিক্ষণ নিয়েছে এখানকার ডাক্তারের কাছ থেকেই। এমনি সম্ভ্রান্ত পরিবারের আরো সতের জন মেয়ে নার্সিং ট্রেনিং শেষ করে এখানে যুদ্ধাহত মুজাহিদদের সেবা করে যাচ্ছেন। তিন শিফটে পাঁচ জন করে ভাগ করে দেয়া হয়েছে এবং অতিরিক্ত দুই জনকে রাখা হয়েছে ছুটিছাটার ব্যবস্থা রক্ষা করার লক্ষ্যে। সুমাইয়া তাদেরই একজন।

আমাকে চোখ মেলতে দেখে মৃদু স্বরে একটা সালাম দিয়ে আমার বেডের পাশে দাঁড়ালো। সালামের জবাব দিলাম অনুচ্চ স্বরে। তারপর জানতে চাইলো এখন কেমন বোধ করছি। বললাম, ভালো। আপনার ডিউটি আজ বুঝি বিকেলে?

না, সকালেই ছিল। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে ভাইজান এখানে আসবেন শুনেই থেকে গেলাম।

মনে পড়লো ডাক্তার-নার্সসহ রোগীদের মধ্যেও একটা আনন্দের হিল্লোল বইছে যেন সকাল থেকে। কারণ একজন মুজাহিদ কমান্ডার আসবেন বিকেলে– এটা এখানকার সবার কাছেই একটা খুশির বিষয়।

বললাম, আপনার ভাইজান বুঝি মুজাহিদ কমান্ডার? তিনি এটা পরিদর্শন করতে আসছেন?

বারে, পরিদর্শন করতে আসবেন কেন? তাঁর এখানে আগমন তো আপনাকে উপলক্ষ করেই।

তাই নাকি! আমি তো চরম সৌভাগ্যবান তাহলে, কিন্তু তিনি এ তকলিফ স্বীকার করতে গেলেন কেন?

তা তো বলতে পারবো না। আপনাকে তো তিনিই এখানে নিয়ে এসেছিলেন। এ কয়দিন হয়তো ছুটি নিতে পারেননি। তাই আজ আসছেন। শুনেছি এই সেন্টারও নাকি স্থানান্তরিত করা হবে। এ জায়গায় এখন আর মুজাহিদদের রেখে চিকিৎসা করানোর মতো নিরাপদ বোধ করছেন না। ভাইজান এসে সবার সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেবেন। আপনার ব্যাপারে ওনাকে বেশ পেরেশান বলে মনে হচ্ছে।

স্রেফ কর্তব্যের তাগিদে আমি শুধু একটু উপকার করতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু আমার মতো একজন সামান্য মানুষের জন্য তিনি এতটা করবেন তা ভাবতে পারিনি।

ভাইজান বলেছেন, আপনি আমাদের এই জেহাদের একজন উঁচু মাপের কর্মী। আপনার কলম নাকি তাদের অস্ত্রের লড়াইয়ের চেয়েও অনেক কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, একজন মুজাহিদের কাছে আরেকজন মুজাহিদের জীবনের মূল্য কত বেশি।

আমি গর্বিত আমাকে মুজাহিদদের কাতারে শামিল করার জন্য। কিন্তু আমি জানি আমার শক্তি কতটা ক্ষুদ্র। আপনার ভাইজান এসব কথা কখন আপনাকে বলেছেন?

আপনাকে হাসপাতালে রেখে খুব অল্প সময়ের জন্য তিনি বাড়িতে গিয়েছিলেন। ভাইজানের কাছে আপনার কথা শুনে আমার আম্মি রোজ আপনার সুস্থতার জন্য দোয়া করছেন। আমি আনন্দিত যে, কেবল আপনারই জন্য আমরা ভাইজানকে স্বল্প সময়ের জন্য হলেও কাছে পাচ্ছি। তিনি এত বেশি ছোটাছুটি করেন যে, বছরে গড়ে একটা মাসও বাড়িতে কাটান না। সেই ছেলেবেলা থেকেই তিনি বাড়ি ছাড়া হয়েছেন। জানি না তিনি কোনোদিন বাড়িতে বসবাস করবেন কি না। না কি আব্বাজানের মতো তিনিও সারাজীবন লড়াইয়ের ময়দানেই অতিবাহিত করবেন। জালিমের বিরুদ্ধে আমাদের আর কত খুন দিতে হবে আল্লাহই জানেন।

সুমাইয়ার মায়াবী ডাগর দুটি চোখ অশ্রুতে পূর্ণ হয়ে ওঠলো। আমি কি বলবো ভাষা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। তার অশ্রুভেজা চোখের দিকে চেয়ে এতক্ষণের চিনচিনে মাথাব্যথার কথা ভুলে গেলাম। আমার মায়ের জন্য যে অস্থিরতা অনুভব করছিলাম তাও ভুলে গেলাম। আমি তার বেদনাভরা মুখের পানে চেয়ে নির্বাক হয়ে গেলাম।

আমাকে কিছু বলতে না দেখে প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে বললো, দুপুরে ওষুধটা খেয়েছিলেন কি?

বললাম, খেয়েছি।

এমন সময় একজন বেয়ারা 'কমান্ডার শেখ ওসামা এসে পড়েছেন' বলতে বলতে বিশাল করিডোরের এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত হেঁটে গেলো। রোগীদের মধ্যেও যেন একটা চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়লো।

একে একে সমস্ত বেড ঘুরে সকল রোগীর খোঁজ খবর নিলেন এবং সর্বশেষ এলেন আমার কাছে এ সময়ের সাড়া জাগানো মুজাহিদ কমান্ডার শেখ ওসামা। যা ভেবেছিলাম তাই। তিনি তো আমার দেখা সেই নওজোয়ান, যার সুচিন্তিত কর্মদক্ষতার প্রমাণ আমি পেয়েছিলাম মসজিদে সেদিন জুমার নামায পড়তে গিয়ে। ঘন কালো কুচকুচে শ্মশ্রুমণ্ডিত এক সুপুরুষ। সুন্দর মুখশ্রী, আয়ত নয়নযুগল থেকে যেন আলো ঠিকরে পড়ে। কাছে এসেই সালাম দিয়ে আমার কপালে হাত রাখলেন। বাম হাত দিয়ে ধরলেন আমার বাম হাত। হৃদয়ের উষ্ণতা বিনিময় হলো তার সাথে। আমি বিস্মিত পলকহীন চোখে তাকালাম তাঁর দিকে। সালামের জবাব দিয়ে বললাম, আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ পাক আবার আমাদের মিলিত করলেন। আমার পরম সৌভাগ্য, আপনার মতো একজন মুজাহিদকে কাছে থেকে দেখার সুযোগ পাচ্ছি।

আপনি সাংবাদিক, তাই ভাষার ব্যঞ্জনায় ব্যক্তির বন্দনাও এমন বাঙময় হয়ে ওঠে। আসলে পান্থজনই পান্থজনের দেখা পায়, ভ্রমর যেমন মধু সংগ্রহে গিয়ে অপর ভ্রমরের দেখা পায়। তারপর বলুন, আপনার তবিয়ত কেমন?

আল্লাহর শোকর! আমি এখন অনেক ভালো। মনে হয় হাঁটা-চলাও করতে পারবো। তবে মাঝে মধ্যে মাথার ব্যথাটা একটু বেড়ে যায়।

আল্লাহ আপনাকে পূর্ণ সুস্থতা দান করুন। আপনার উসিলায় তিন জন মুজাহিদের জীবন রক্ষা পেয়েছে। ঠিক ওই মুহূর্তে আপনি সতর্ক করে না দিলে আল্লাহ হয়তো শাহাদাতের তামান্না পুরো করে দিতেন।

আপনারা তো স্রেফ শাহাদাতের তামান্না নিয়েই ময়দানে অবতীর্ণ হননি; বরং বিজয়ের লক্ষ্যেই শাহাদাতের তামান্না লালন করছেন। আপনাদের শাহাদাতের বাসনাই যদি কেবল পুরো হয় তো ন্যায় প্রতিষ্ঠা করবে কে?

বড় ভারিক্কি কথা বলেছেন দেখি। সত্যি, ওইদিন যদি দুশমনরা আমাদের খতম করে দিতো তাহলে কারগিল আরো বড় বরবাদির শিকার হতো সন্দেহ নেই। আপনি জীবনবাজি রেখে যে উপকার মুজাহিদদের করেছেন তার বদলা কেবল আল্লাহই দিতে পারেন।

কিন্তু সে সুযোগ আর দিচ্ছেন কই। আপনাদের সেবা শুশ্রূষার প্রতিদানের যে বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছেন, আল্লাহর অনুগ্রহের ঢালি তো আর শূন্য থাকছে না।

হো হো করে হেসে ওঠলেন শেখ ওসামা। তাঁর হাসির গমকে অনেকেই এদিকে সাগ্রহে তাকিয়ে রইলো। সুমাইয়াও সম্ভবত হেসে ফেলল আমার এমন কথা শুনে। শেখ ওসামা এবার স্বাভাবিক হয়ে বললেন, আমাদের এই মেডিকেল সেন্টারটি এখানে রাখা আর নিরাপদ বোধ করছি না। পাকিস্তানী সৈন্য প্রত্যাহার শুরু হচ্ছে আজ থেকে। আমরাও এবার কারগিল রক্ষার মরণপণ সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে যাচ্ছি। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের সকল মুজাহিদকে সুসংহত করে কারগিলের নিরাপত্তা জোরদারের প্রস্তুতি চলছে। খুব শীঘ্রি দু'তিন দিনের ছুটিও পাচ্ছি আমি। চূড়ান্ত লড়াইয়ে নামার আগে কমান্ডার পর্যায়ের বেশ কয়েকজনকে বাধ্যতামূলক এ ছুটি দেয়া হয়েছে। এখানকার রোগীদের বেশিরভাগই উন্নতির দিকে। আল্লাহর রহমতে নতুন রোগী নেই বললেই চলে। তাই যাদের সম্ভব রিলিজ দিয়ে বাকীদের অন্তত আরও চার পাঁচ কিলো ভিতরে শিফ্‌ট করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আগামীকাল থেকেই শিফ্‌টিং কার্যক্রম শুরু হচ্ছে।

আমি কিছুটা চিন্তিত হয়ে পড়লাম। এ অবস্থায় আমাকে কোথায় ছেড়ে দেয়া হবে– এই আশঙ্কায় আমার চোখে মুখে একটা ভীতির ছায়া পড়ে যাচ্ছিল। এ সময় শেখ ওসামা বললেন, আমাদের বাড়ি এখান থেকে প্রায় চার কিলো উত্তরে। ডা. ইবরাহিমের সাথে আপনার সম্পর্কে বিস্তারিত কথা হয়েছে। আমি চাই আগামীকালই আপনি আমাদের গরীবালয়ে তশরিফ রাখুন।

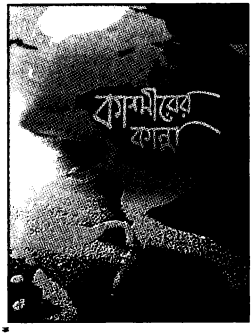
আমি একটু বিব্রত হয়ে তাঁর দিকে তাকালাম। তিনি আবার বললেন, আপনার কোন আপত্তি না থাকলে আগামীকাল দুপুরে আমাদের পিকআপ ভ্যান আপনাকে বাড়িতে পৌঁছে দেবে। অবশ্য আপনার আপত্তি না থাকলেই আমি প্রীত হবো।

আমি কোন ভাষা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। আপত্তি থাকার তো প্রশ্নই ওঠে না। তবে এভাবে বলে আমাকে সম্মানিত করা হচ্ছে, এটা ঠিকই বুঝতে পারলাম। তিনি সরাসরি নির্দেশ না দিয়ে আমার মতামতকে গুরুত্ব দিলেন সৌজন্যবশতই। মহৎ লোকদের কথায় মহত্ত্বের ছাপ থাকে, এটাই তো স্বাভাবিক।

বললাম, আমার আপত্তির কি থাকতে পারে। তবে আপনাদের এতটা তকলিফ দিচ্ছি ভেবে নিজেকে বেশ অপরাধী মনে হচ্ছে।

আমরা তকলিফ মনে করলে তো! তাহলে এ কথাই রইলো। আগামীকাল বাদ জোহর আপনি প্রস্তুত থাকবেন। আমি ছুটি পেলেই বাড়িতে ওয়াপস যাবো। চলি, আল্লাহ হাফেজ।

মুজাহিদ কমান্ডার এগিয়ে গেলেন। সাথে চললেন সঙ্গী দু'জন মুজাহিদ। সুমাইয়াও ভাইকে এগিয়ে দিতে গেল পেছন পেছন।



দশ

শেখ ওসামাদের বাড়িটা দেখতে পুরনো কেল্লার মতো। হতে পারে কোন সময় এটা কোন সামরিক চৌকি ছিল। চারদিকে উঁচু দেয়াল। গায়ে ছত্রাক, পলেস্তারা ঝরে ঝরে ইটের লাল আবরণ দৃশ্যমান। ভেতর বাড়িতে তিনটি দালান ঘর। একটিতেই তাদের আবাস। সুমাইয়ার সাথে কথা বলে জেনেছি, এই বাড়িটি তার দাদা আজমল শেখ কিনেছিলেন। তিনিও ছিলেন আযাদ কাশ্মীরের একজন লড়াকু সৈনিক। '৪৭-এ রাজা হরি সিংয়ের আমলে ৬ নভেম্বর অর্ধশতাধিক বাসভর্তি যে সব কাশ্মীরী মুসলমানকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল, তাদেরই সহযাত্রী ছিলেন আজমল শেখ। ভাগ্যের জোরে তিনি সে সব আক্রান্ত বাসে চড়েননি। পরে তিনি পালিয়ে গিয়েছিলেন স্ত্রী পুত্রকে নিয়ে পাকিস্তানে। সেখানে স্ত্রী পুত্রকে রেখে তিনি যুদ্ধে চলে গিয়েছিলেন। ছেলেও সেখানে বড় হয়। তাকে বিয়ে দেয়া হয় পাকিস্তানেই। পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হয়ে এলে তারা আবার নিজেদের এলাকায় ফিরে এসে এই বাড়িটি ক্রয় করে বসবাস শুরু করেন। কিন্তু শান্তির মুখ যে কাশ্মীরবাসী এই একবিংশ শতাব্দীতেও দেখতে পাবে না তা হয়তো জানা ছিল না আজমল শেখের। যৌবনের প্রতিটা মুহূর্ত কেটেছে লড়াইয়ের ময়দানে, বৃদ্ধ বয়সে একটু শান্তি খুঁজে পেতে নিজ ভূখণ্ডে ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু শান্তি প্রতিষ্ঠা না করে শেষ পর্যন্ত অশান্তির জ্বলন্ত লাভা দেখে দেখেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন তিনি।

সুমাইয়ার আব্বা-আম্মা অবস্থা প্রতিকূল দেখে গ্রামে তার নানার বাড়িতে হিজরত করেন। শেখ ওসামা একটু বড় হলে লেখাপড়া করতে চলে যান করাচীতে। তার

আব্বা তখনও আযাদী লড়াইয়ের একজন সচল সৈনিক। এরপর পরিস্থিতি আবার কিছুটা শান্ত হলে পাঁচ বছরের সুমাইয়াকে নিয়ে ফিরে আসেন এ বাড়িতে। এর মধ্যে ঝিলাম নদী দিয়ে অনেক পানি গড়িয়েছে। লড়াই করে করেই একদিন তাদের পিতা শহীদ হলেন। তখন শেখ ওসামার করাচীর পাঠ কেবল শেষ হয়েছে। পিতার শহীদ হবার খবর শুনে তিনি বাড়িতে না এসে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সোজা চলে যান আফগানিস্তানে। সেখানে ট্রেনিং শেষে দীর্ঘ দিন সাফল্যের সাথে লড়াই করে ক'বছর হলো নিজের মাতৃভূমিকে পৌত্তলিকদের হাত থেকে উদ্ধার করতে চলে আসেন আপন ঘরে। এখানকার বিভীষিকাময় পরিস্থিতির কথা আগেই তিনি শুনেছিলেন। তাই প্রস্তুত হয়েই এক প্লাটুন আগ্রহী মুজাহিদ নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু পরিস্থিতি বাইরে থেকে যতটা না শুনেছিলেন বাস্তবে তা ছিল আরও ভয়াবহ। এ পর্যন্ত স্বস্তিতে একটা মাসও তিনি বাড়িতে মা ও বোনের সাথে কাটাতে পারেননি। একটার পর একটা লড়াই লেগেই আছে।

মুজাহিদদের কারগিল ও দ্রাস উপত্যকায় বিস্ময়কর বিজয় এক চরম রোমাঞ্চকর দুঃসাহসিক অভিযানের ফল। দু'বছর ধরে চেষ্টা করেও কোন কিনারা করতে পারেননি তারা। গত বছর নভেম্বরে শীত যখন জেঁকে বসতে শুরু করেছে তখন সম্মিলিত মুজাহিদ ফ্রন্ট যৌথ বৈঠকে বসে কারগিল ও দ্রাস মুক্ত করার লক্ষ্যে। সিদ্ধান্ত হয় শীতে বরফ জমতে শুরু করলে ভারতীয় বাহিনী পাহাড়ের চূড়া থেকে নেমে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যায়। তখন পাহাড়ের পাদদেশে স্থানে স্থানে নিয়মিত কয়টি টহল ব্যাঙ্কার ছাড়া শক্তিশালী কোন ইউনিট কাজ করে না। এই সুযোগেরই সদ্ব্যবহার করতে হবে। উত্তর পশ্চিম কোণ বরাবর আক্রমণ চালিয়ে কোনক্রমে বরফের সাগর ডিঙিয়ে উপরে উঠে যেতে পারলে এই শীতে অভিযান চালিয়ে ওরা আর সফল হতে পারবে না।

সিদ্ধান্ত নেয়া হলো ঠিকই, কিন্তু এই বরফের দুনিয়ায় মুজাহিদরাই বা টিকে থাকতে পারবে কতদিন? কারাই বা এমন দুঃসাহসিক অভিযানে যেতে রাজি হবে? এমনি নীরবতা যখন কমান্ডারদের গোপন বৈঠককে আরও শীতল করে তুলছিলো, ঠিক তখনই একজন কমান্ডার দাঁড়িয়ে কথা বলতে লাগলেন। তিনি সকলকে উদ্দেশ করে বললেন, বন্ধুরা! আল্লাহর পথে জেহাদে নেমে মৃত্যু ভয়ে চুপ করে থাকার মতো অথবা মৃত্যু ভয়ে অভিযান চালানো থেকে বিরত থাকার মতো বদনসীবী আর কি হতে পারে? ইসলামের বিজয়েতিহাসের সবক কি আমরা এত সহসাই ভুলে গেলাম? প্রবল পরাক্রান্ত রোম ও পারস্য বিজয়, মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয়, ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ারের

বাংলা বিজয়, এসব তো কোন সিদ্ধান্তহীনতার ফসল নয়; বরং দুঃসাহসিক অভিযানের খুনরাঙা সোনালী বিজয়। সাগর পাড়ি দিয়ে যারা নৌকা ভেঙে পানিতে ভাসিয়ে দেয়, যাতে করে বিজয় ছাড়া পেছন ফিরে যাবার আর কোন পথ না থাকে, আমরা তো সেই সব মরণজয়ী মুজাহিদদেরই উত্তরসূরী। আমাদের ভয় কোথায়? অভিযান শুরু করলে আল্লাহর মদদ অবশ্যই পাবো। কিন্তু তা না করে যদি আমরা সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগি তাহলে বিজয় তো দূরের কথা, বরবাদির অতল গহ্বরে আমাদেরকে পচে মরতে হবে।

প্রিয় সাথীরা! পৌত্তলিকদের জুলুম বরদাশ্‌ত করে বেঁচে থাকার চেয়ে হিম শীতল শুভ্র বরফের বিছানা কি আমাদের জন্য আরামদায়ক নয়? মহান আল্লাহ যদি এ অভিযানে আমাদের শাহাদাত কবুল করে থাকেন তো ভয়ের কি আছে? আমার জিম্মায় যেসব জানবাজ মুজাহিদ ভাই রয়েছেন তারা আমার এই সিদ্ধান্তে একমত। আল্লাহর নামে আপনারাও এই অভিযানে শরীক হোন, ইনশাআল্লাহ বিজয় আমাদের সুনিশ্চিত।

এই ভাষণ যিনি দিলেন তিনি শেখ ওসামা। দীর্ঘদিন সাফল্যের সাথে আফগানিস্তানে লড়াই করেছেন। তাঁর এই তেজোদ্দীপ্ত ভাষণে অন্যান্য কমান্ডারও সরব হয়ে ওঠলেন এবং অভিযানের পক্ষেই মতামত দিলেন।

সিদ্ধান্ত হলো, যথাসম্ভব সহিংসতা এড়িয়ে পাহাড় চূড়ায় আরোহণের চেষ্টা করা। এরপর উপরে বিজয় নিশান উড়িয়ে গোটা উপত্যকাকে দুশমন মুক্ত করা। পাকিস্তানী সৈন্যরাও নিচে থেকে তাদের সহযোগিতা করার আশ্বাস দিলেন। শীতের সাথে বসবাস করে অভ্যস্ত মুজাহিদরা চাহিদামতো পোশাক, শরীর উষ্ণ রাখার জন্য কাংরি, কয়লা এবং অগ্নিপোকরণ সংগ্রহ করে একদিন আল্লাহর নামে বিভিন্ন দল উপদলে বিভক্ত হয়ে একযোগে দ্রাস ও কারগিল অভিযান শুরু করলো। শীতের শুরুতে যতই বরফ পড়তে শুরু করেছে, ভারতীয় সৈন্যরা প্রাণের ভয়ে ততই লোকালয়ের দিকে পিছু হটতে লাগলো। বিক্ষিপ্ত কিছু সংঘর্ষ হয়েছে বটে, কিন্তু দুশমনরা এসব হামলাকে সাধারণ হামলা হিসেবেই মনে করে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারেনি। দুশমনদের কেউ কেউ পরিস্থিতি আঁচ করতে পারলেও কেবল চাকরির জন্য জীবন দিতে হবে এবং এ খবর উপর মহলে জানালে বরং নিজেদের মরণের পথ নিজেদেরই সুগম করা হবে ভেবে চুপ থাকলো।

একদিন বিজয়ের পতাকাও উড়ানো হলো। ভারতীয় সৈন্যরা তখন দিশেহারা ক্রুদ্ধ হায়েনার মতো নিচে পড়ে গজরাতে লাগলো। হিমাঙ্কের নিচে যেখানে তাপমাত্রা, আল্লাহর মদদে কেবল মুজাহিদরাই সেখানে টিকতে পারে, কোন পৌত্তলিকের পক্ষে তা কল্পনাও করা যায় না।

শীত পর্যন্ত অপেক্ষা করে দুশমনরা স্থলপথে সফল হতে না পেরে এখন আকাশ পথে আক্রমণ চালাতে শুরু করেছে। কিন্তু পাহাড়ের উপরে অবস্থানের ফলে আক্রমণে মুজাহিদরা অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক অবস্থানে থাকায় শীত কমার সাথে সাথে তাদের দখলদারিত্ব বিস্তৃত হতে শুরু করে। ইতোমধ্যে তিনটি ভারতীয় জঙ্গি বিমান ভূপাতিত করতে সমর্থ হয়েছে মুজাহিদ গ্রুপ। এদিকে ভারতীয় বাহিনী ক্ষুধার্ত বাঘের মতো হিংস্রতার পাশাপাশি চাণক্যনীতির মাধ্যমে মার্কিন প্রেসিডেন্টকে দিয়ে পাকিস্তানী সৈন্য প্রত্যাহারে নওয়াজকে রাজি করিয়ে নেয়। এই সংবাদ মুজাহিদদের জন্য হতাশার উদ্রেক করলেও অর্জিত বিজয় তারা বিনাযুদ্ধে ছেড়ে দিতে পারে না। এ ভূমি তাদের, এই জমিনে তাদের পূর্বপুরুষদের খুন ঝরেছে। এই মাটির সন্তান যারা তাদের দেহে খুন থাকতে পৌত্তলিকদের হাতে আবার এই জমিনের নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দেয়া হবে কাপুরুষতা। তাই কারগিল এবং দ্রাসের ব্যাপারে হিম্মত তাদের টুটেনি; বরং নওয়াজের পাক সৈন্য প্রত্যাহারের ঘোষণা তাদের খুনকে আরও চাঙ্গা করে তুলেছে। মুজাহিদ কমান্ডার শেখ ওসামার সাথে কথা বলার সময় এ প্রত্যয়ই তার চোখ মুখ থেকে ঠিকরে পড়তে দেখা গেছে।

আসরের নামায পড়ে সুমাইয়াদের বৈঠকখানা ঘরের বারান্দায় একটা বেতের চেয়ারে বসে শ্রীনগর টাইমস-এর পাতা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ছিলাম। কিছু নোটও করছি ডাইরিতে। আমার চরম অসুস্থতার সময় আমার ডাইরি, ক্যামেরা, রেকর্ডার এবং সামান্য পোশাকের ছোট্ট ব্যাগটা সুমাইয়ার হেফাজতে ছিল। হাসপাতালে জ্ঞান ফিরে পেয়ে যখন এসবের খোঁজ করছিলাম তখন সেগুলো আমাকে দেখিয়ে সে বলেছিল, ডাক্তার বলেছেন আপনি সম্পূর্ণ রিলাক্সে থাকতে। এখন কিছু চিন্তা করা, লেখা বা পড়া চলবে না। তাদের বাড়িতে আসার সময় সেসব সঙ্গে করে আনা হয়েছে এবং আমাকে ব্যবহারের জন্য দেয়া হয়েছে।

যুদ্ধাহত মুজাহিদদের অস্থায়ী মেডিকেল সেন্টার থেকে আমাকে তাদের বাড়িতে আনা হয়েছে পিকআপ ভ্যানে করে। পরম যত্নের সাথে মুজাহিদরা আমাকে গাড়ির আরামদায়ক বিছানায় তুলে দেন। ধীরে ধীরে চালিয়ে পাহাড়ি চড়াই উৎরাই পেরিয়ে কাঁচা সরু রাস্তা দিয়ে আমাকে পৌঁছে দেয়া হয় এ বাড়িতে। আসার সময় আমার মনে বেশ অস্বস্তি হচ্ছিল। ভেবেছিলাম এমন অজানা-অচেনা মানুষজনের বাড়িতে অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকা কত দুর্বিষহ জানি হয়! কিন্তু এ বাড়িতে মানুষ বলতে সুমাইয়া ও তার আম্মা। বার তের বছরের একটি চাকর আছে। নাম আইয়ুব। আমি আসার পর আমার সার্বিক খেদমতে ছেলেটিকে লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। আমার কখন কি দরকার পর্দার আড়ালে থেকে সুমাইয়া অথবা তার আম্মা এই ছেলেকে দিয়ে খবর নেন। ছেলেটির সাথে প্রাণ খুলে কথা

বলা যায় না। সে আঞ্চলিক সুরে উর্দু বলে আর আমিও তো ভাঙ্গা ভাঙ্গা উচ্চারণে বলি। ছেলেটি যেমন ভাষাজ্ঞানের স্বল্পতা দেখে মজা পায়, তেমনি আমিও তার আঞ্চলিক উচ্চারণের উর্দু শুনে মজা পাই।

আমার মুখে কলমের ক্লিপ, কি জানি চিন্তা করতে গিয়ে সামনের দিকে তাকালাম। দেখি কমান্ডার শেখ ওসামা আমার সামনে দাঁড়িয়ে। আমাকে গভীরভাবে পরখ করছেন যেন। পরশু আমাকে রেখে চলে যাবার সময় বলে গিয়েছিলেন শীঘ্রই চার পাঁচ দিনের ছুটি নিয়ে বাড়িতে আসবেন। হতে পারে আমাকে সঙ্গ দেয়ার জন্য, কিংবা বিরামহীন লড়াইয়ের ময়দানে থাকার ক্লান্তি দূর করতে অথবা সামনের কঠিন যুদ্ধের জন্য মানসিকভাবে একটু প্রস্তুতি নিতে তাঁর এ বিশ্রাম। তবে যে জন্যই হোক তিনি যে ক'দিন বাড়িতে থেকে তাঁর মা ও বোনকে সঙ্গ দিয়ে তাদের কতটা খুশি করবেন তা ভাবতে গিয়েও আমার মনটা আনন্দে ভরে ওঠলো।

কমান্ডার শেখ ওসামাকে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আমি কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে ওঠলাম। দাঁড়িয়ে সালাম দিলে তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে জোর করে বসিয়ে দিয়ে বললেন, আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন। এখন আপনার তবিয়ত কেমন? খুব কষ্ট হচ্ছে, তাই না? আল্লাহর ইচ্ছাই এমন যে আপনার মতো একজন মেহমানের মেজবান হবে আমাদের মতো এক গরীব পরিবার।

বাধা দিয়ে বললাম, আল্লাহর দোহাই, এভাবে বলবেন না। আপনারা আমার জন্য যে তকলিফ স্বীকার করেছেন, যে ঋণের ভারে আমাকে আবদ্ধ করেছেন তা কোন কালেই শোধ হবার নয়। আপনাদের বাড়িতে অবস্থানের এই সুন্দর দিনগুলো নিঃসন্দেহে আমার জীবনের এক স্মরণীয় অধ্যায় হয়ে থাকবে।

আপনি বসুন, আম্মিজানের সাথে একটু দেখা করে আসি। আমি চার পাঁচ দিনের ছুটি নিয়ে এসেছি। তবে যে কোন সময় ডাক আসলে চলে যেতে হবে। বলতে বলতে তিনি ভিতর বাড়িতে চলে গেলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই কিছু ফল ও চা নিয়ে হাজির হলেন। আমার দিকে ফলের পাত্রটা এগিয়ে দিয়ে বললেন, শুনেছি সাংবাদিকরা খুব চা পান করে। আমাদের বাড়ির চা নিশ্চয়ই আপনার খুব একটা রুচে না?

আপনার অনুমান মোটেই ঠিক নয়; বরং মনে রাখার মতো চা-ই আমি খাচ্ছি। আজ সকালে আপনাদের বাড়ির পশ্চিমের ফলের বাগানটা ঘুরে ফিরে দেখেছি। আইয়ুবের কাছ থেকে জানলাম বাগানটা আপনাদের।

আল্লাহর ইচ্ছায় এই বাগানটাই আমাদের উপার্জনের একমাত্র মাধ্যম। বাংলাদেশে বুঝি এমন বাগান নেই?

মুচকি হেসে বললাম, বাগান তো দূরের কথা, এসব ফলের কোন গাছই আমাদের দেশে চোখে পড়ে না। সিলেট জেলায় সামান্য কিছু কমলা ফলে, তবে তা এখানকার মতো এত সুস্বাদু হয় না।

আপনাদের সিলেটের চা-বাগানের কথা বেশ শুনেছি। করাচীতে আমাদের সাথে বাংলাদেশী ক'জন ছাত্রও ছিল। তাদের কাছে আপনাদের দেশের কিছু কিছু তথ্য জেনেছি। আপনি কি জানেন, আপনাদের দেশের বেশ ক'জন তরুণ মুজাহিদ আফগান লড়াইয়ে শহীদ হয়েছেন? তাদের দু'জন আমাদের সেক্টরেই লড়াই করতেন। খুবই প্রাণবন্ত, চরিত্রবান খোদাভীরু ছিলেন তাঁরা।

কি ভেবে যেন পেছনের দিকে তাকালাম। দেখি পর্দার আড়ালে সুমাইয়া ও তার আম্মা দাঁড়িয়ে। তাড়াতাড়ি মুখ ঘুরিয়ে নিলাম। শেখ ওসামা বিষয়টা লক্ষ্য করে বললেন, বাড়িতে এলে আম্মিজান এক মুহূর্তের জন্যও আমাকে চোখের আড়াল করতে চান না। সত্যিই মাহমুদ সাহেব, পৃথিবীতে মায়ের ভালোবাসার কোন তুলনা হয় না। কখনো কখনো আম্মি আমাকে লড়াই ছেড়ে স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে বলেন। কিন্তু আপনিই বলুন, পৌত্তলিকদের এই জুলুমের রাজত্বে স্বাভাবিক জীবন যাপন কি সম্ভব?

আমি কিছু বলার আগেই তিনি আবার বলতে লাগলেন, আম্মিজানকে আমি বলি, আল্লাহর কাছে দোয়া করুন। আপনার ছেলে যেন কাশ্মীরকে আযাদ করে খোদার রাজ কায়েম করে স্বাভাবিক জীবন যাপনের লক্ষ্যে ঘরে ফিরে আসতে পারে। মাহমুদ সাহেব, আপনি বলুন তো, আমাদের এই জন্মভূমি কি কোনদিন মুক্ত হবে না?

শেখ ওসামার চোখ দুটি অশ্রুসজল হয়ে ওঠলো। আমি কি জবাব দেব ভেবে পাচ্ছিলাম না। আবেগমথিত কণ্ঠে উচ্চারণ করলাম, আল্লাহ আপনাদের এই বাসনা পূর্ণ করে দিন।

রাতে এশার নামায পড়লাম এই মুজাহিদ কমান্ডারের সাথে। তিনি আসার পর এ পর্যন্ত বেশিরভাগ সময়ই কাটিয়েছেন আমার সাথে বিভিন্ন গল্প গুজব করে। এক সময় যার সাথে সামান্য কথা বলার জন্য আমি লালায়িত হয়ে উঠেছিলাম, আল্লাহর ইচ্ছায় আজ তার বাড়িতেই আমাকে আশ্রয় নিতে হয়েছে। মুজাহিদদের জীবনযাত্রা, তাদের পরিবার-পরিজনদের খবরা খবর তাদের সাথে এতটা একাত্ম হয়ে জানার সুযোগ আমি পাব তা ভাবতেই পারিনি। নামায শেষে শেখ ওসামার সাথে বৈঠকখানায় বসে আবারও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাপ করছি, এ সময় আইয়ুব এসে জানাল, শেখ ওসামাকে আম্মা ভিতরে ডেকে পাঠিয়েছেন।

শেখ ওসামা অল্পক্ষণ পরেই ভিতর থেকে হাসতে হাসতে চলে এলেন। আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, আম্মিজান কেন ডেকেছেন জানেন?

আমিও হেসে জবাব দিলাম, নিশ্চয়ই ওনাদের ছেড়ে আমার সাথে বেশি সময় কাটানোর অভিযোগ জানিয়েছেন।

না, এ জন্যে নয়। আম্মিজান আজ আমাকে নিজের হাতে খাইয়ে দিতে চেয়েছেন। দেখুন দেখি কাণ্ড! এখানে আপনাকে একা খেতে দিয়ে আমি আমার মায়ের সাথে আহার করি! মনে হয় আমিই কেবল পৃথিবীতে একমাত্র মায়ের সন্তান।

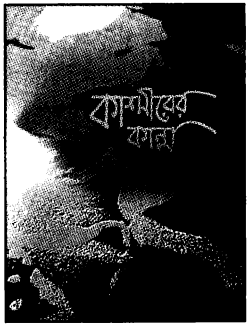
বললাম, তিনি ঠিকই বলেছেন। ওনাকে আপনি নিরাশ করবেন না। কতদিন পর আপনি বাড়ি ফিরলেন। জীবন মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শত্রুদের সাথে লড়াই করেন। মা যে কত ব্যাকুল হয়ে কাল যাপন করেন বাড়িতে তা আমরা কতটা উপলব্ধি করতে পারি বলুন?

কিন্তু এ যে অন্ধ মাতৃস্নেহের কাছে এক ধরনের অবিচার, তিনি সেটা বুঝেন না? আপনি যে নিজের মাকে ছেড়ে এখানে বিদেশে এসে অসুস্থ অবস্থায় আছেন সেটা বিবেচনায় রাখা উচিত।

আপনি ভুল বুঝবেন না। এখানে আপনার আম্মি যে আমার জন্য কতটা তকলিফ করছেন তা আমিই কেবল বুঝতে পারছি। সত্যি বলছি, যদিও তিনি হিজাব রক্ষার্থ আমার সামনে খুব একটা আসেন না, কিন্তু তাঁর স্নেহ-মমতা আমার মায়ের কথা বিলকুল ভুলিয়ে দিয়েছে। আমাদের কথা চলতে চলতেই আইয়ুব খাওয়ার ডিশ নিয়ে হাজির হলো। দস্তরখান পাততে পাততে আইয়ুব বললো– আম্মিজান বলেছেন, আপনাদের সব কথা তিনি পর্দার ওপার থেকে শুনেছেন। তিনি এতটা ভেবে কথাটা বলেননি। তাই এখানেই আপনাদের দু'জনের খাবার পাঠিয়েছেন।

আমি শেখ ওসামাকে অনুরোধ করলাম ভিতরে মায়ের কাছে চলে যেতে। ঠিক এ সময় পর্দার ওপার থেকে তাঁর আম্মা বলে ওঠলেন, বাজাজী, সত্যিই আমি বিষয়টি ভালোভাবে চিন্তা করে এমন প্রস্তাব করিনি। তোমরা এখানে এক সাথে বসে খাও, আমি আড়াল থেকে দেখবো। এটা আমার নির্দেশ এবং সত্যি এতেই আমি খুব খুশি হবো।

কেন জানি আমার চোখ দুটি অশ্রুতে পূর্ণ হয়ে ওঠলো। পাছে তাদের চোখে ধরা পড়ে যাই তাই দ্রুত নিজেকে সংযত করে আহারে মন দিলাম।



এগার

আসরের নামাযের পর শেখ ওসামা আমাকে বললেন, আপনি যে নিজেকে সম্পূর্ণ সুস্থ বলে দাবি করছেন তার একটা পরীক্ষা হয়ে যাক। কি বলেন?

আমি হেসে বললাম, আমার জানা নেই আপনি কেমন পরীক্ষার কথা বলছেন। আপনার মতো একজন মহান মুজাহিদের কাছে পরীক্ষা দেয়ার কোন যোগ্যতাই আমার নেই। তবু পরীক্ষার ধরনটা জানতে পারলে একটু প্রস্তুতি অন্তত নেয়া যেতো।

মাহমুদ সাহেব! ঘাবড়াবার কিছু নেই। যদি দুই তিন মাইল পথ হাঁটার সঙ্গতি আপনার থাকে তো আমার সঙ্গে চলুন। কাশ্মীরের প্রতিটি ধূলিকণা আযাদীর জন্য হাহাকার করছে। এ চিৎকার শুনে যারা সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করে আযাদীর পথকে সতেজ এবং চাঙ্গা করে তুলেছে, তেমনি এক আযাদী পাগল শহীদের খুনরাঙা মাটির স্পর্শ পেতে চলুন আমার সঙ্গে। আপনি আন্তর্জাতিক মিডিয়ার একজন কর্মী। আপনাকে এই জমিনের পরতে পরতে লুকিয়ে থাকা মর্মান্তিক ইতিহাসের বিশাল বেলাভূমির দু'একটা বালিকণার সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে চাই। গোটা কাশ্মীর যদি কখনও মুক্ত হয়, আযাদ কাশ্মীরের ইতিহাস যখন নতুন করে লেখা হবে, হতে পারে আপনার এই অভিজ্ঞতা সঞ্চিত লেখনি সেই ইতিহাসের একটা ক্ষুদ্রতম উপাদান হয়েও কাজে লাগতে পারে। আপনার চোখে দেখা এমনই দু'একটা ঘটনা হয়তো হাজারও ঘটনার সাক্ষী হিসেবে ইতিহাসে জায়গা করে নিতে পারে।

আমি তাঁর দূরদর্শিতাসম্পন্ন কথা শুনে বিমোহিত হয়ে পড়লাম। তাঁর চোখের ওপর আমার বিস্মিত দৃষ্টির পলক পড়ছে না। তিনি আবার বলতে লাগলেন,

আমার কথা শুনে আপনি অবাক হচ্ছেন, না? আমার আপনার হায়াত কতদিনের জানা নেই। তবে এ কথা নিশ্চিত করে বলা যায়, এই জমিনে খোদার রাজ কায়েমের লক্ষ্যে যে পরিমাণ মুসলমানের খুন ঝরেছে, জুলুম নির্যাতনের যে পাহাড় এখানে গড়ে উঠেছে, মজলুমের যে পরিমাণ আহাজারি ধ্বনিত হয়েছে ইথারে ইথারে, তাতে এখানে কুরআনের দীর্ঘস্থায়ী শাসন কায়েম হতে আর বেশি দেরি হবার কথা নয়। কারণ দীনের মহীরুহ গড়ে ওঠতে শহীদের খুনরাঙা মাটির চেয়ে উর্বর মাটি আর কি হতে পারে?

একটু দম নিয়ে বললেন, যাবেন চলুন। সেই সাথে দুই তিন মাইল হেঁটে পরীক্ষা হয়ে যাক দীর্ঘ সফরের জন্য আপনি কতটুকু সুস্থ হয়ে ওঠেছেন।

আমি একটা ঢোক গিলে বললাম, আপনার সাথে কাশ্মীরের ভূমিতে চলতে পারাটা আমার জন্য গর্বের বিষয়। আমি প্রস্তুত, চলুন দেখি আপনার পরীক্ষায় আমার ফলাফল কি আসে।

দুই আড়াই মাইল হেঁটে আমরা একটা নতুন তৈরি মসজিদ ও মাদরাসায় এসে হাজির হলাম। এর উত্তর পাশে ঘন জঙ্গল। একটা বিশাল মাঠের পশ্চিম পাশে মসজিদ এবং উত্তর-পূর্ব দিকে এল প্যাটার্নের লম্বা মাদরাসা ঘর। রাস্তার বিপরীতে আঙ্গুর ও আপেলের বাগান। নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক পরিবেশে গড়ে ওঠা মাদরাসার বিশাল মাঠে ছোট ছোট ছেলেরা খেলা করছে। শেখ ওসামাকে জিজ্ঞেস করলাম, জায়গাটার নাম কি?

তিনি জবাব দিলেন, গত চার বছর আগে এই অঞ্চলটা আমাদের কব্জায় আসার পর এর নামকরণ করা হয়েছে জাহানাবাদ। আগে এর নাম ছিল কৃষ্ণপুর।

মাদরাসার গেটে দেখলাম উর্দু এবং ইংরেজিতে লেখা জাহানাবাদ নূরজাহান মাদরাসা। আমরা প্রাচীরঘেরা মাদরাসার গেট দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলাম। শেখ ওসামার কাছে আবার জানতে চাইলাম, নূরজাহান কে? তাঁর নামেই এই জায়গাটারও নামকরণ করা হয়েছে কি না?

জবাবে বললেন, হ্যাঁ, নূরজাহানের নামেই এর নামকরণ হয়েছে। এই মহীয়সী কুমারী সম্পর্কে পরে আপনাকে বিস্তারিত বলবো। আগে ঘুরে ফিরে দেখে নিন মাদরাসা চত্বরটি।

দু'জনই মাদরাসা চত্বর ঘুরে মসজিদের দিকে অগ্রসর হচ্ছি, ঠিক এ সময় মাগরিবের আযান পড়লো। আমাদের সাথে মাদরাসার দু'জন শিক্ষকও মিলিত হলেন। দেখে মনে হলো শেখ ওসামাকে তাঁরা যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছেন। সালাম এবং কুশল বিনিময়ের পর আমাদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে মাদরাসার বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের খবরা খবর জানালেন শেখ ওসামাকে। ভাই ওসামা আমার সম্পর্কে তাদের কাছে কি যেন বললেন। তারপর থেকেই সব কথা আমার সামনেই তাঁরা

অকপটে আলোচনা করছেন। তাঁদের আলোচনার রেশ ধরে বুঝতে পারলাম, মাদরাসায় দীনী শিক্ষার পাশাপাশি ছাত্রদের এমন কি নতুন মুজাহিদদেরও এখানে সামরিক ট্রেনিং দেয়া হয়।

মার্চের শেষ সপ্তাহ হলেও এখনো সন্ধ্যার পর থেকে বেশ ঠাণ্ডা পড়ে। আমার আনা পোশাক ওসামাদের বাড়িতে ওঠার পর খুব কমই পরা হয়েছে। কারণ আমার পোশাক এখানকার আবহাওয়া ও পরিবেশের সাথে সম্পূর্ণই বেমানান। তাই মেজবানদের অনুরোধে শেখ ওসামার কিছু পোশাক আমি নিয়মিতই ব্যবহার করছি। আজও তাঁরই একটা লম্বা ঢিলেঢালা পোশাক পরেছি। এখানকার ভাষায় একে ফেরন বলে। মাগরিবের নামায শেষ হয়েছে। মাদরাসার ছাত্ররা নামায পড়ে মসজিদ ত্যাগ করেছে। অন্যান্য মুসল্লীও। দুই রাকাত নফল পড়ে ভাই ওসামার সাথে তসবিহ পাঠ করছি। এ সময় মসজিদের ডান দিকের কোণে আমার দৃষ্টি পড়লো। মোমবাতির মৃদু আলোয় লক্ষ্য করলাম, একজন প্রৌঢ় বসে অর্ধনির্মীলিত চোখে এক ধ্যানে যিকির করছেন। এতটুকু দূরে বসেও লক্ষ্য করলাম তাঁর চুল দাড়ি সব সাদা। মোনাজাত শেষে তাকিয়ে দেখি তিনি সেখানে নেই। শেখ ওসামাও কেবল মোনাজাত শেষ করেছেন। এ সময় পঁয়ত্রিশ চল্লিশ বছর বয়সের একজন লোক ক্র্যাচে ভর দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করলেন। আমাদের উদ্দেশ করে বললেন, হযরত মির্জা সাহেব তাঁর কামরায় আপনাদের জন্য এন্তেজাম করছেন।

শেখ ওসামা চোখ ইশারায় আমাকে ওঠতে বলে তিনিও ওঠে দাঁড়ালেন। আমরা এক পা কাটা ক্র্যাচওয়ালা লোকটির অনুসরণ করে মসজিদের সামনের একটি কামরায় উপনীত হলাম। ঘরে ঢুকেই চিনতে পারলাম, হযরত মির্জা সাহেব মসজিদে দেখা সেই বৃদ্ধ লোকটিই।

শেখ ওসামা বৃদ্ধ লোকটির কদমবুসি করার সাথে সাথেই তিনি তাঁকে জড়িয়ে ধরে কপালে চুমো খেলেন। আমিও সশব্দে সালাম দিয়ে হাত দুটি বাড়িয়ে দিলে শেখ ওসামা আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, মাহমুদ সাহেব! উনি আমাদের একজন মুরব্বী, যাঁদের দোয়া এবং প্রেরণায় আমরা জেহাদের ময়দানে হিম্মত পাই।

ঘরে বসার মতো কোন আসন নেই। একটা টেবিলের ওপর কুরআন হাদীস ও বিভিন্ন ধর্মীয় কিতাবাদি রাখা। একটা সাধারণ চৌকিতে বিছানা পাতা। বৃদ্ধ লোকটি আমাদের বিছানায় বসতে আহ্বান করলে নিঃশব্দে বসে পড়লাম। আমাদের এ ঘরে যিনি নিয়ে এসেছেন তিনি বেরিয়ে গেলেন।

মির্জা সাহেব শেখ ওসামাকে লক্ষ্য করে বললেন, বেটা, কতদিন পর তোমাকে দেখলাম। এই বুড়োটার কথা বুঝি তোমার মনে পড়ে না? তোমাকে দেখে যে দিলে কতটা শান্তি পাই তা বুঝাতে পারবো না।

আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম বৃদ্ধ লোকটির কোটরাগত উজ্জ্বল চোখ দু'টিতে দু'ফোঁটা অশ্রু চিকচিক করছে। বয়সের তুলনায় মনে হলো একটু বেশিই বুড়ো হয়ে গেছেন তিনি। চুল-দাড়ি সাদা বগি পাটের মতো দেখালেও চামড়ায় ভাঁজ পড়েনি। দেহের তুলনায় মনের ওপর যে অনেক বেশি ঝড় বইয়েছে তা তাঁর কপালের বলিরেখা আরও বেশি করে মনে করিয়ে দেয়। শেখ ওসামা এই বৃদ্ধের সাথে বেশ অন্তরঙ্গ হয়ে জেহাদের বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যত কর্মকৌশল সম্পর্কে বিস্তারিত আলাপ আলোচনা করলেন। এ ফাঁকে মাদরাসার এক ছাত্র ঝুড়িভর্তি কিছু ফলমূল দিয়ে গেলো। বৃদ্ধের আদেশে আমরা তা খেলামও কিছু।

শেখ ওসামা বললেন, চাচাজান! সেবার আপনার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাবার পর একদিনের জন্যও ছুটি নিইনি। তাই আপনার সাথে দেখা করতে পারিনি। লড়াইয়ের ময়দানে আপনাদের কথা মনে করেই তো প্রেরণা লাভ করি। আর আপনাদের ভুলে যাওয়া তো আমার অস্তিত্বকেই ভোলার শামিল। দোয়া করুন, আপনারা বেঁচে থাকতেই যেনো পুরো কাশ্মীরকে আল্লাহ পাক মুক্ত করে দেন।

বেটা, আমার দোয়া হামেশা তোমাদের ওপর থাকে। তোমাদের জন্য দোয়া করা ছাড়া আল্লাহর কাছে আমার আর চাইবার কি আছে বলো? তবু অনেকদিন তোমাকে না দেখলে মনের ভিতর কেমন যেন তোলপাড় শুরু হয়।

চাচাজান, করিম খান ভাইকে দেখলাম। উনি এখানে কতদিন?

অনেকদিনই তো হয়ে গেলো। তুমি চলে যাবার মাসখানেক পরই তাকে ডেকে এনে মাদরাসায় শিক্ষকতার কাজে লাগিয়ে দিলাম। তুমি তো জানই ছেলেটা কত দুঃখী। নির্মমভাবে পরিবারের সবাইকে হারিয়ে এবং জুলুম নির্যাতনে একেবারে পঙ্গু হয়ে হতাশায় হাবুডুবু খাচ্ছিলো। কেবল অবশিষ্ট একখানা পা নিয়ে যখন জীবনের প্রতি একেবারে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলো, তখন এখানেই ডেকে আনলাম ওকে। আমার মতো আরেক দুঃখীজনের কাছে এসে ছাত্রদের পড়িয়ে এখন কিছুটা সান্ত্বনা খুঁজে পেয়েছে বলে মনে হয়।

খুব ভালো করেছেন চাচাজান। ওর দিকে ভালো করে তাকাতেও কষ্ট হয়। আজ তাহলে ওঠার এযাজত দিন। সঙ্গের মেহমানটির অসুস্থতার কথা তো আপনাকে বললামই। ওনাকে নিয়ে বাড়িতে পৌঁছতে রাত হয়ে যাবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে কখন আমার প্রতি কি নির্দেশ আসে বলা তো যায় না। হতে পারে এটাই আপনার সাথে শেষ দেখা।

বৃদ্ধ লোকটি আমাদের গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। দু'জনকেই বুকের কাছে টেনে নিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে কি যেন দোয়া করলেন। আমরাও আল বিদা বলে রাস্তায় নেমে পড়লাম।

পথে চলতে চলতে শেখ ওসামাকে জিজ্ঞেস করলাম, একটি পা কাটা ক্র্যাচওয়ালা লোকটিই করিম খান কিনা?

তিনি গম্ভীর মুখে বললেন, হ্যাঁ, তাঁর নামই আবদুল করিম খান। যার হাতে এক সময় আমাদের মতো কালাশনিকভ, রকেট লাঞ্চার, গ্রেনেড, মেশিনগান অথবা ভূমিমাইন শোভা পেতো, যার চোখের তারায় এখনো স্বাধীনতার জন্য লড়াই করার আকুতি জ্বলজ্বল করে জ্বলে– অসহায় পঙ্গু অবস্থায় তার হাতে আজ শিক্ষার কলম ওঠেছে। জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে আজ নতুন নতুন মুজাহিদ তৈরির বিনিময়ে হৃদয়ের দগদগে ক্ষত সারাবার মলমের কাজ করছেন।

বললাম, তাঁর সম্পর্কে কিছু কি আমাকে বলা যায়?

দেখলাম শেখ ওসামার মুখাখানা আরও গম্ভীর রূপ ধারণ করেছে। হয়তো বা তাঁর চোখের পাতাও কেঁপে ওঠেছে। গাঢ় একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলতে লাগলেন, মাহমুদ সাহেব! কাশ্মীরের প্রতিটি শিশু জন্ম নিয়েই প্রত্যক্ষ করেছে তার মা সম্ভ্রম হারাবার ভয়ে কাতর। তার বোন সদা-সর্বদা ইজ্জত লুণ্ঠনের ভয়ে এখানে সেখানে আত্মগোপন করে আছে। তার বাবা, ভাই, চাচা, মামা কিংবা অন্য কোন স্বজন প্রিয়জন পাড়া প্রতিবেশীর লাশ আসছে। জানাযা হচ্ছে, শোকের মাতমে বাতাস প্রকম্পিত হচ্ছে। অথবা সে শুনতে পাচ্ছে উঠতি বয়সী কোন যুবককে ধরে নিয়ে গেছে ভারতীয় বাহিনী। খবর আসছে নির্যাতনের, কখনো বা তার কানে পৌঁছে যাচ্ছে তারই কোন সহোদর পাহাড় গিরি কন্দরের কোথাও যুদ্ধরত মুজাহিদ শহীদী ঈদগাহে জামাত ভারি করার প্রস্তুতি নিচ্ছে, অথবা হিজরত করেছে প্রতিবেশী নির্ভরশীল আশ্রয়স্থল পাকিস্তানে কিংবা দূর প্রবাসে।

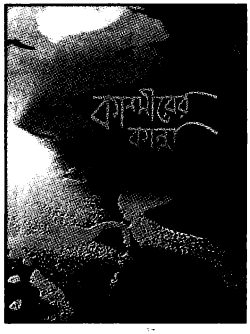
স্বাধীনতার আকুতি নিয়ে জন্ম নেয়া এসব শিশু বড় হয় প্রতিবাদী মানসিকতা নিয়ে। এক সময় মনের অজান্তেই সেই যুবকটি যোগ দেয় প্রতিরোধ যুদ্ধে। কারণ সে যখন দেখতে পায়, তার জাতি শৃঙ্খলিত, আধিপত্যবাদী ভারতের ব্রাহ্মণ্যবাদী হায়েনারা হিংস্র সাম্প্রদায়িকতা ছড়িয়ে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিচ্ছে বসতির পর বসতি, খুন-গুম-ধর্ষণ লুণ্ঠনে নিজ জন্মভূমি ক্ষত-বিক্ষত, তখন বিবেকবান কোন যুবকই তো আর ঘরে বসে থাকতে পারে না। তেমনি লাখ লাখ প্রতিবাদী শহীদী জামাতের একজন মুজাহিদ আবদুল করিম খান। সোপুরে তাঁর বাড়ি। কয়েক দিনের ছুটি নিয়ে বাড়িতে এসেছিলো। আর তখনই তাঁকে ধরার জন্য ভারতীয় বাহিনী সে গ্রামে ক্র্যাক ডাউন বসায়। ছুটিতে আসার কারণে মুজাহিদ বাহিনীর সাথে যোগাযোগও ছিলো বিচ্ছিন্ন। বিশেষত সোপুর ভারতীয় সেনাদের নিয়ন্ত্রণে থাকায় মুজাহিদদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করারও কোন উপায় ছিল না। ক্র্যাক ডাউনের প্রথম দিনেই ভারতীয় গোয়েন্দাদের ইঙ্গিতে ধরা পড়লেন তিনি। একই সাথে ধরে নিয়ে গেলো তার যুবতী স্ত্রী ও বিবাহযোগ্যা বোনটিকেও। এ সময় তাঁর বৃদ্ধ বাপ-মা গগনবিদারী চিৎকার দিয়ে হামলে পড়ে তাদের ওপর। হায়েনারা চোখের নিমিষে ব্রাশ ফায়ার করে বৃদ্ধ

পিতা-মাতাকে জান্নাতে পাঠিয়ে দেয়। নরপিশাচ ভারতীয় সৈন্যরা তাদের ক্যাম্পে নিয়ে আবদুল করিম খানের চোখের সামনে তার স্ত্রী ও বোনটিকে পালাক্রমে ধর্ষণ করে। হাত পা বাঁধা আবদুল করিম খান এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে চোখ বন্ধ করেও নিস্তার পায়নি হায়েনাদের হাত থেকে। চোখ বন্ধ করলেই আঙ্গুলে নখের গোড়ায় সুঁই ফুটিয়ে দিয়ে তাকে চোখ মেলতে বাধ্য করেছে। করিম খানের উপর জুলুম-নির্যাতনের এখানেই শেষ নয়। এই দৃশ্য দেখে সে যখন সম্পূর্ণ জ্ঞান হারিয়ে ফেললো তখন হিংস্র পশুরা তার পুরুষাঙ্গ এবং ডান পা কেটে তাকে রাস্তায় ফেলে দিয়ে আসলো।

শেখ ওসামার চোখ দুটি ভিজে ওঠেছে, তার কণ্ঠও জড়িয়ে আসছে। আমি অসহায়ের মতো কতক্ষণ নীরব রইলাম। কিন্তু শরীরের সব লোমকূপ তখন অজানা শিহরণে খাড়া হয়ে ওঠলো। মনে হচ্ছে এ মুহূর্তে এসব শয়তানদের বিরুদ্ধে লড়তে লড়তে যদি আমার মৃত্যু হয়ে যেতো তবু যেন মনে পূর্ণ শীতলতা পেতাম না। ব্যাগ্রকণ্ঠে বললাম, তারপর?

শেখ ওসামা একটা ঢোক গিললেন। তারপর নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বললেন, আল্লাহর ইচ্ছায় আবদুল করিম খান জীবিত ফিরে আসতে পেরেছেন। কিন্তু তার স্ত্রী ক্যাম্প থেকে ফিরে এসে আত্মহত্যা করে সব কষ্টের অবসান ঘটালেন। আর সেই বোনটি, সেও আযাদীর বিনিময়ে নরপিশাচদের ভোগের সামগ্রী হয়ে সাত দিনের মতো ক্যাম্পে জীবিত ছিলো। জানোয়ারদের পীড়নে নিজের জীবনটাই হয়ে ওঠেছিলো একটি দুর্বিষহ বোঝা। হয়তো বা সে মৃত্যুই কামনা করেছিলো। আল্লাহ পাকও তাকে শহীদী কাফেলায় শরীক করে নিলেন।

শেখ ওসামার এই কাহিনী বর্ণনায় রাতের নীরবতা যেন আরও স্তব্ধ হয়ে গেলো। আমাদের ব্যথাতুর মনের প্রতি সমবেদনা জানাতে পায়ের শব্দে শব্দে রাতের পোকারাও তাদের গান থামিয়ে দিচ্ছে। আকাশে তখন শুক্লপক্ষের চাঁদ। হালকা কুয়াশা পড়ছে। মেঠো পথ দিয়ে যেতে যেতে কেবলই মনে হচ্ছে, চাঁদের আলোও যেন কেমন ফেকাসে লাগছে। কুয়াশার জন্য নাকি ভাই ওসামার এই কাহিনীর বর্ণনায় চাঁদের আলো এমন মলিন হয়ে ওঠেছে তা বুঝে ওঠতে পারলাম না। আমাদের বাংলাদেশেও এই চাঁদ আলো ছড়াচ্ছে। সেখানকার চাঁদের আলো নিশ্চয়ই এমন মলিন হবার কথা নয়। কেননা, এখানকার প্রকৃতি যে নিষ্ঠুর পৈশাচিকতা ও নারকীয়তা প্রত্যক্ষ করেছে, আর নিত্যদিন প্রত্যক্ষ করে চলেছে, সেখানে তা কল্পনাও করা যায় না। তাই একই চাঁদের আলো ভূ-পৃষ্ঠের সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়লেও অন্যখানে তা এখানকার মতো ফিকে হয়ে দেখা দেয়নি নিশ্চয়ই।



বার

মুজাহিদ কমান্ডার শেখ ওসামাকে এত কাছে পেয়ে মনটা আমার আনন্দে ভরে ওঠলো। ওসামাকে কাছে পেয়ে বাড়িতে তাঁর আম্মা ও একমাত্র ছোট বোনটি যত না খুশি হয়েছে তার চেয়ে ঢের খুশি হয়েছি আমি। আমার কাশ্মীর মিশনে সবচেয়ে মূল্যবান যেসব উপাদান এই কমান্ডারের সান্নিধ্যে এসে লাভ করেছি, তাঁর অসম্ভব সুন্দর ব্যবহার, বুদ্ধি এবং প্রজ্ঞার প্রখরতা দেখে আমি এর চেয়েও বেশি চমৎকৃত হয়েছি। যেচে কিছু বলার লোক তিনি নন। আফগানিস্তানে লড়াইয়ের ময়দানে সফলতার সাথে কাটিয়েছেন দুটি বছর। তারপর থেকে কাশ্মীরে এসে নিজের মাতৃভূমি উদ্ধারের লড়াইয়ে লেগে আছেন। কত স্মৃতি আর রোমাঞ্চকর অনুভূতির অভিজ্ঞতা যে তাঁর রয়েছে, সেসব আমি যদি জানতে না চাইতাম তাহলে তিনি হয়তো কখনোই বলতেন না। তিনি যেন বিরক্ত না হন সেভাবেই মওকা মতো তাঁর মুখ থেকে শুনেছি শিহরণ জাগা দুর্ধর্ষ রোমাঞ্চকর কাহিনী– যার প্রতিটি প্লট নিয়ে তৈরি হতে পারে একেকটি কালজয়ী উপাখ্যান।

করিম খানের ঘটনা শোনার পর তাঁর নিজের দেখা কোন ঘটনা বা বিশেষ মুহূর্তের কথা জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, লড়াইয়ের ময়দানে এমন হাজারো ঘটনা রয়েছে যেগুলো একের পর এক মনের পর্দায় ভেসে ওঠে। ছুটির তো মওকা নেই। তবু মাঝে মাঝে যখন সামান্য বিশ্রামে থাকি, নীরবে নিজের জীবন এবং বর্তমান জগত সম্পর্কে ভাবি অথবা আত্মসমালোচনায় মগ্ন হই, তখন কত না ঘটনা চোখের সামনে ভেসে আসে। এ মুহূর্তে আপনাকে কোনটা বলি, তা থির করতে পারছি না।

কিছুক্ষণ তিনি চুপ করে রইলেন। মনে মনে সম্ভবত চিন্তা করছিলেন কোন ধরনের ঘটনায় আমি খুশি হবো। তারপর বললেন, কারগিল যুদ্ধের সূচনালগ্নের একটি ঘটনা শুনুন। অধিকৃত কাশ্মীরের বারামূলা নামক স্থানে চলছিলো নিষ্ঠুরতম হত্যাযজ্ঞ। জ্বলছিলো বসতি, লোকালয়গুলো বিরান করার জন্য ভারতীয় বাহিনী পোড়ামাটি নীতি কার্যকর করছিলো। আমি ছিলাম সে অঞ্চলে। খবর এসেছে কারগিল আক্রমণের জন্য আমার সাথীদের নিয়ে এগিয়ে যেতে। সে সময়কার ঘটনা।

প্রায় দু'দিন ধরে সাথীদেরসহ উপোস করছি। জঙ্গল থেকে বেরিয়ে একাই গ্রামে প্রবেশ করলাম কিছু খাবার সংগ্রহের আশায়। কিন্তু নিয়তি আমার অনুকূলে ছিল না। এক বাড়ি থেকে প্রয়োজনীয় খাবার সংগ্রহ করে সাথীদের পৌঁছে দিলাম। বাড়িওয়ালা একান্ত ইচ্ছা প্রকাশ করলেন রাতে তাঁর সাথে আহার করতে। গ্রামবাসী এসব মুসলিম পরিবারে মুজাহিদদের কদর সীমাহীন। তিনি বললেন, একজন মুজাহিদ কমান্ডারের মেজবান হয়ে এক সাথে আহার করার ইচ্ছা তাঁর দীর্ঘ দিনের। ভদ্রলোকের কোন ছেলে সন্তান নেই। পাঁচ বছরেরও কম বয়সের একটি মেয়ে বাড়িতে। বড় মেয়েকে বিয়ে দিয়েছেন আরও আগেই। জামাইসহ ওরাও বেড়াতে এসেছে। আমি এই লোকটির আন্তরিক আহ্বান উপেক্ষা করতে পারলাম না। তাই কথামতো রাতে খেতে আসলাম।

এমনিতেই ক'দিন ধরে গ্রামটিতে ভারতীয় বাহিনীর নির্যাতন চলছিলো। কি করে জানি খবর রটে গেলো এ গ্রামে মুজাহিদ ঢুকেছে। আমি এসবের কিছুই জানতাম না। ফলে যা হবার তাই হলো, শিকার হলাম ক্র্যাক ডাউনের।

রাতে আহারাদির পর ফিরে যাবার কোন পথ পেলাম না। এক পর্যায়ে হামলা হলো বাড়িতে। বাড়ির সবক'টি পরিবারের ওপর চালানো হলো সীমাহীন নির্যাতন। পালাক্রমে নারী পুরুষের ওপর চালাচ্ছিলো অমানবিক অত্যাচার। আমাকে এসবের মুখোমুখি হতে দেননি গৃহকর্তা। ঘরের এক কোণে বিশাল এক ঢোলার আড়ালে লুকিয়ে রাখলেন আমাকে। আমি কালাশনিকভ আগেই লোড করে রেখেছিলাম। কিন্তু পরিবারটির কথা এবং গ্রামবাসীর কথা ভেবে এ্যাকশানে যাবারও কোন সুযোগ আমার ছিলো না। আন্তরিকভাবে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করলাম। পেলামও।

ভারতীয় সৈন্যরা ঘরে প্রবেশ করে যখন তছনছ করছিলো এবং বড়দের ওপর শারীরিক নির্যাতন চালাচ্ছিলো, ঠিক তখনই হঠাৎ গৃহকর্তার পাঁচ বছরেরও কম বয়সী কন্যাটি লাফ দিয়ে খাটের উপর দাঁড়িয়ে শ্লোগান দিতে শুরু করলো– 'হাম কিয়া চাহতে? আযাদী! আযাদী কা মতলব কিয়া? লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।' (আমরা কি চাই? আযাদী। আযাদীর উৎস কি? লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ)।

মাসুম শিশুটির প্রতিবাদী উচ্চারণ ও উচ্চারিত ভাষা শুনে বিস্মিত ফোর্স কমান্ডার শিশুটিকে বাইরে উঠোনে নিয়ে গেলো ব্রিগেড কমান্ডারের সামনে। কোন মুজাহিদ নয়, যোদ্ধা নয়, বয়স্ক কোন মানুষ নয়, শ্মশ্রুমণ্ডিত কোন যুবক নয়। হিজাবধারী কোন মহিলাও নয়, একটি মাসুম শিশুকে দেখে ব্রিগেড কমান্ডার হতবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, একে কেনো নিয়ে এসেছো? সৈনিকের কথা শুনে কমান্ডার শ্লেষের হাসি হেসে শিশুটিকে জিজ্ঞাসা করলো, বাচ্চা, তুমি কি বলছো? একই শ্লোগান পুনঃ উচ্চারণ করলো শিশুটি। কম্পিত হৃদয়ে আনমনে ব্রিগেড কমান্ডার কতকটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে ওঠলো– যে জাতির শিশুরা জেহাদ ও আযাদীর শ্লোগান নিয়ে কথা বলতে শেখে, সে জাতিকে আমরা কেন, দুনিয়ার কোন সৈনিক বা অস্ত্র পরাভূত করতে পারে না। আমাদের সরকার অযথা সময় ক্ষেপণ করছে। আর আমরা এখানে একটি পরাজিত যুদ্ধ মহড়াকে দীর্ঘায়িত করছি।

ঢোলার আড়ালে দাঁড়িয়ে আমি শিশুটির শ্লোগান ও কমান্ডারের কথা স্পষ্ট শুনতে পেলাম। কমান্ডারকে বেশ শিক্ষিত এবং দূরদর্শী লোক বলেই মনে হলো। সম্ভবত আল্লাহর ইচ্ছাই এমন ছিলো। কি মনে করে ব্রিগেড কমান্ডার সৈন্যদের নিয়ে এ বাড়ি থেকে নিষ্ক্রান্ত হলো। আমি বেরিয়ে এলাম আড়াল থেকে। বাচ্চাটি আমাকে জড়িয়ে ধরতে চাইলে তাকে কোলে তুলে নিলাম। চুমোয় চুমোয় ভরে দিলাম তার কচি কোমল মুখটি। সে খুশিতে একবার আমার দাড়িতে হাত বুলায় আরেকবার আমার হাতের কালাশনিকভে।

যে কোনো উপায়ে হোক বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে মনস্থির করলাম। গৃহকর্তা বাধ সাধলেন। বললাম, দেখলেন তো আপনার এই ভাগ্যবান মাসুম বাচ্চাটির উসিলায় আল্লাহ পাক কেমন করে আমাদের রক্ষা করলেন। আমার মৃত্যু যদি এ মুহূর্তে লেখা না থাকে তো দেখবেন হাজার হাজার সৈন্যের ভেতর থেকে মহান আল্লাহ পাক কেমন করে আমাকে নিরাপদে বের করে নেন।

আমার কথা শুনে ভয়ে গৃহকর্তার মুখখানা কেমন ফেকাসে হয়ে গেলো। আমাকে দমাতে নিরাশ হয়ে অবশেষে বললেন, সৈন্যরা অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে বেষ্টনী তৈরি করেছে। প্রতি পাঁচ মিটার অন্তর একজন করে সৈন্য পাহারা দিচ্ছে। তবে এক স্থানে পানির নালা আছে, তার দু'পাশের পাহারাদার দু'জনের মাঝখানে একটু বেশি ফাঁকা দেখেছি। যদি বেরুতেই হয় তো এর মধ্য দিয়েই বের হতে পারেন। এছাড়া বের হবার বিকল্প কোন পথ নেই।

মনে মনে ভাবলাম, ক্র্যাক ডাউন ক'দিনের জন্য দিয়েছে কে জানে। মুজাহিদদের খবর যখন পেয়েছে তখন খুঁজে বের না করা পর্যন্ত ওরা ক্র্যাক ডাউন তুলে নেবে না। এতক্ষণে নিশ্চয়ই সাথীদের কানেও এ খবর পৌঁছে

গেছে। সুচিন্তিত কমান্ড ছাড়া আবার কোন আক্রমণে নেমে পড়ে কিনা এটা যেমন চিন্তার বিষয়, তেমনি আমার জন্য গোটা গ্রামবাসীর ওপর দুর্ভোগ দীর্ঘায়িত হোক এটাও বরদাশত করা যায় না। তাই আবারও অনেক দোয়া পড়ে আল্লাহর গায়েবী সাহায্য প্রার্থনা করে তাদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

দুই সৈন্যের মধ্য দিয়ে বের হওয়া অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ব্যাপার। আগেই লোড করা কালাশনিকভ হাতে তুলে নিয়ে শরীরে কোট চাপিয়ে টুপি খুলে নালার দিক দিয়ে রওয়ানা দিলাম। মনে মনে ভাবলাম, যদি ধরা পড়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়, তবে ওদের ওপর সোজা গুলি করবো। শাহাদাতের আগে যে ক'জন নিয়ে যেতে পারি তাই লাভ।

পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে আস্তে আস্তে সৈন্যদের মধ্য দিয়ে চলতে লাগলাম। আল্লাহর রহমতে অন্ধকারে আমার কোটের চমক দেখে সৈন্যরা ধোকায় পড়ে যায়। তারা আমাকে তাদের অফিসার মনে করে জিজ্ঞেস করে, কোথায় যাচ্ছেন স্যার?

আমি বুঝতে পারলাম, তারা ধোকায় পড়েছে। কণ্ঠে দৃঢ়তা এনে বললাম, আমি প্রস্রাব করে আসছি, এ দিকে খেয়াল রেখো। কারও পক্ষে ধারণা করাও সম্ভব নয়, মুজাহিদরা এত সাহসী হতে পারে এবং কালাশনিকভ হাতে নিয়ে সৈন্যদের মধ্য দিয়ে এভাবে পথ অতিক্রম করতে পারে। আমি গ্রাম থেকে বের হয়ে আল্লাহর রহমতে নিরাপদে পার্শ্ববর্তী পাহাড়ের ঝোপের আড়াল দিয়ে সাথীদের নিকট পৌঁছে গেলাম।

শেখ ওসামার শ্বাসরুদ্ধকর এই কাহিনী শেষ হলে আমার মনের একান্ত গহীন থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে এলো– সুবহান আল্লাহ!

আমাদের পথ শেষ হয়ে এলেও শেখ ওসামার কথা বলা শেষ হলো না। আমরা দরজার সামনে এসে নক করলে সুমাইয়া এসে দরজা খুলে দিল। তার ভাইজানের সাথে যে আমিও আছি, সম্ভবত এ কথাটা তার মনে আসেনি। তাই নেকাব পরা ছাড়াই দরজা খুলে আমাকে দেখতে পেয়ে মুহূর্তেই পর্দার আড়ালে পালিয়ে গেলো। হিজাব ছাড়া মেয়েটিকে এর আগেও দু'একবার দেখেছি, তবে বেশ দূরে থেকে। আজ এত কাছে থেকে মুহূর্তের জন্য দেখেই বুঝে নিলাম সুমাইয়া কতটা সুন্দরী। উন্নত নাসিকা, আয়ত নয়নযুগল, চিকন রক্তাভ গোলাপ পাপড়ির ন্যায় ওষ্ঠদ্বয় এবং দীঘল কেশের এই অষ্টাদশী যুবতীকে না দেখলে বলে বুঝানো যাবে না কতটা যতনে পরিপূর্ণ শিল্প সুষমায় আল্লাহ পাক এই তরুণীকে গড়ে তুলেছেন। আজকে এই এক পলকের দেখাতেই আমার কাছে মনে হয়েছে এর আগে এতটা সুন্দরী নারী আমি আর দ্বিতীয় কাউকে দেখিনি। হাসপাতালে এই সুমাইয়াই আমার কপালে হাত দিয়েছে, বাহুতে ইনজেকশান পুশ করেছে, মুখমণ্ডল ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দিয়েছে, আজ ভাবতে গিয়েও মনের কোন অজানা গহীনে যেন পুলক অনুভব করছি।

কমান্ডার ওসামা আগে আগে এবং পেছনে আমি ঘরে প্রবেশ করলাম। এশার নামায পথেই এক মসজিদে পড়ে এসেছি। ঘরে ঢুকে পুরাতন সোফায় গাটা এলিয়ে দিলাম। এ সময় পর্দার ওপার থেকে ওসামার মায়ের কণ্ঠ ভেসে এলো। শেখ ওসামাকে লক্ষ্য করে বললেন– বেটা, তোমার কেমন বিবেচনা বল তো! অসুস্থ বিদেশী মেহমানকে নিয়ে এত রাত অবধি বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছ?

শেখ ওসামা ভেতরের ঘরে প্রবেশ করতে করতে বললেন, আম্মি, ওনাকে নিয়ে জাহানাবাদ গিয়েছিলাম। মির্জা চাচাজানের সাথে অনেক দিন দেখা নেই। বেচারা আমার জন্য বেশ পেরেশান থাকেন বোঝা যায়।

ভাইয়ের প্রতি দুষ্টুমি মাখা ব্যঙ্গাত্মক সুরে এবার সুমাইয়া বললো, মির্জা চাচাজান না ছাই। উনি গিয়েছেন নূরজাহান ভাবীর কবর জিয়ারত করতে।

শেখ ওসামা শাসনের সুরে বললেন, দেখলেন আম্মি, আপনার মেয়েটা দিন দিন কেমন বেয়াড়া হয়ে ওঠছে? আল্লাহর পথে যারা দুনিয়া ছেড়ে চলে গিয়েছে তাদের সম্পর্কে এমন কথা আর বলবি, বল? বলবি আর?

পর্দার আড়াল থেকে তাদের দেখা যায় না, তবে স্পষ্ট বুঝতে পারলাম ওসামা বোনের কান ধরে মলা দিচ্ছেন অথবা আদরমাখা শাসনের সুখকর কোন পীড়ন করছেন। সুমাইয়া ন্যাকামির সুরে বলছে, উফ্ ভাইয়া! লাগছে তো! ছাড়ুন, আর বলবো না। দেখুন আম্মি, আপনার ছেলে আমাকে ভারতীয় সৈন্যের মতো আঘাত করছে।

তাদের আম্মা বললেন, তোমরা কি শুরু করেছো, পাশের ঘরে মেহমান বসা সে কথা ভুলে গেছো নাকি? মায়ের শাসনে ভাইবোনের ঝগড়া নিমিষেই মিটে গেলো।

রাতের খাওয়া শেষে আমি ডাইরি আর কলম নিয়ে বসতে গিয়ে দেখলাম শেখ ওসামা পত্রিকার পাতায় নজর বুলাচ্ছেন। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ২৬ শে মার্চ আপনাদের স্বাধীনতা দিবস, না?

বললাম, হ্যাঁ, আপনাদের কাগজে নিউজ এসেছে নাকি?

হ্যাঁ, আন্তর্জাতিক পাতার টুকরো সংবাদে ছেপেছে একটু। এবার নাকি বেশ ঘটা করে পালিত হয়েছে দিবসটি।

খেতে বসার সময় থেকেই প্ল্যান করে আছি জাহানাবাদের নূরজাহান সম্পর্কে জানতে চাইবো ওসামার কাছে। বিশেষ করে সুমাইয়ার মুখে নূরজাহান ভাবী কথাটা শোনার পর আমার জানার আগ্রহটা আরও তীব্র হয়েছে। অথচ উনি বললেন, বিয়ে করার মতো সময় সুযোগ হয়ে ওঠেনি এখনও। বিদেশে থেকে স্বদেশের সংবাদ সে দেশের সংবাদপত্রে দেখেও তেমন আগ্রহ বোধ করলাম না

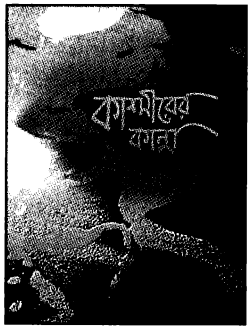
দেখে শেখ ওসামা বললেন, কি ভাবছেন? এই যে দেখুন, আপনাদের ইনডিপেনডেন্টস ডে'র রিপোর্ট।

পত্রিকাটা হাতে নিয়ে চোখ বুলালাম সংবাদের ওপর। আন্তর্জাতিক পাতায় টুকরো খবরের কলামে সাদামাটা একটা নিউজ। অথচ এটিও চোখ এড়িয়ে যায়নি শেখ ওসামার। হতে পারে আমি এখানে বলেই বাংলাদেশের নিউজটার প্রতি তাঁর নজর পড়েছে। অবশ্য দুপুরেই পত্রিকাটা আমি যেটুকু দেখার দেখে নিয়েছি। পত্রিকা বিবিসি ও এএফপি'র বরাত দিয়ে ছেপেছে ছোট এই নিউজটি। পড়া শেষ করে বললাম, ওসামা ভাই! জাহানাবাদের নূরজাহান সম্পর্কে কিন্তু এখনো কিছু বলেননি আমাকে। আপনি কথা দিয়েছিলেন পরে বলবেন।

দেখলাম ফর্সা সুন্দর মুখখানায় কেমন যেন একটা বিষাদের ছায়া নেমে এলো। একই সাথে মুখচ্ছবিতে কেমন একটা লাজুক অনুভূতির ঢেউও খেলে গেলো। আমার কথায় কষ্টকর শুকনো একটু হাসিও ছড়িয়ে পড়লো তাঁর মুখে। বললেন, কাল আমার ছুটি শেষ। এর আগেও যে কোন সময় খবর আসতে পারে এবং চলেও যেতে পারি। কথা যখন দিয়েছি তখন না বলেও তো আর উপায় নেই। মিডিয়ার লোক হিসেবে কথা আদায় করার কৌশল আপনি ভালোই আয়ত্ত করেছেন।

তিনি কেন এ কথা বললেন বুঝতে পারলাম না। বললাম, বিশ্বাস করুন, আপনার বাড়িতে এসে অন্তত মিডিয়ার লোক হিসেবে এসব জানতে চাইছি না। আর সাংবাদিকসূলভ কোন প্রশ্নও কিন্তু করিনি। আপনার কাছে যে হৃদ্যতা ও আন্তরিকতা আমি পেয়েছি, তাতেই আমার এই সাহস জন্মেছে আপনাকে প্রশ্ন করার। এ ব্যাপারে বলতে যদি আপনার কোন প্রকার বাধা থাকে তো আমি কিছুই মনে করবো না। তবু এমন ভুল অন্তত আমাকে বুঝবেন না যে, আমি পীড়াপীড়ি করে আমার স্বার্থে এসব আদায় করে নিচ্ছি।

শেখ ওসামা আমার কাঁধে একটা হাত দিয়ে বললেন, না না। আমি কোন ভুল বুঝিনি আপনাকে। আসলে নূরজাহানের ঘটনা কাশ্মীর লড়াইয়ে থাকা এ যাবতকালে আমার সবচেয়ে স্মরণীয় এবং রোমাঞ্চকর ঘটনা। আমার পরিবারের লোকজন ছাড়া কারও কাছে এ পর্যন্ত বলার মতো পরিবেশও তৈরি হয়নি। আসলে এসব বলবো কোথায়, কাকে? প্রতিটি মানুষের জীবনে কোন না কোন ঘটনা থাকে যা তাকে আজীবন আলোড়িত করে। কর্মে প্রেরণা যোগায় এবং অবসরে প্রিয়জনদের কাছে বলে মনে সুখ পায়। জাহানাবাদ বা নূরজাহান তেমনি একটি স্মরণীয় নিকট অতীত আমার কাছে। আপনাকে বলছি, শুনুন তাহলে।



তের

আজ থেকে সাত বছর আগের কথা। করাচী জামেয়া থেকে দাওরা শেষ করেছি কেবল– ঠিক এ সময়ই বাড়ি থেকে খবর এলো আব্বাজান শহীদ হয়েছেন। আমাদের গ্রামের দু'গ্রাম পরে কৃষ্ণপুরে শহীদদের গোরস্তানে তাঁকে দাফন করা হয়েছে। ভারতীয় সৈন্যদের ভয়ে আমাদের পারিবারিক গোরস্তানে নিয়ে দাফন করাও সম্ভব হয়নি। ভেবেছিলাম এবার অন্তত কিছু দিনের জন্য হলেও বাড়িতে যাবো এবং পরবর্তী কর্মের জন্য আব্বা-আম্মার সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেবো। ঠিক এ সময় এমন একটা দুঃসংবাদে মনটা আমার ভেঙ্গে চৌচির হয়ে গেলো। আব্বার শাহাদাতের খবর আমাকে যতটা না ব্যথিত করেছে, তার চেয়েও বেশি কষ্ট পেলাম তাঁকে শেষবারের মতো দেখতে না পেয়ে, নিজেদের কবরস্তানে তাঁকে দাফন করা যায়নি শুনে। হায় আল্লাহ! কবে আমরা স্বাভাবিক জীবন ফিরে পাবো!

এমনই হাজারো চিন্তা মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল। এ সময় আমাদের গ্রামের পরিস্থিতিও ভালো নয়। নিশ্চিন্তে গিয়ে যে এমন দুঃসময়ে আমার আম্মা ও এগার বছরের ছোট বোনটিকে একটু সান্ত্বনার কথা শোনাবো তারও সুযোগ নেই। একে তো আমি নওজোয়ান, তাছাড়া আমার লেবাস ও চেহারা দেখে মুজাহিদ সন্দেহ করা বিচিত্র কিছু নয়। আর আমার আব্বা এমন একজন মুজাহিদ ছিলেন যাঁর নাম ও সাহসী লড়াইয়ের কথা ভারতীয় বাহিনী, গুপ্তচর কারোরই অবিদিত ছিল না। তাই বাড়ি ফেরার চিন্তা মাথা থেকে তুলে রেখে যুদ্ধের ট্রেনিং এবং লড়াই করতে আফগানিস্তান চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিলাম। বন্ধুরা আমার কথা শুনে

পাঁচ জন আমার সহগামী হতে সিদ্ধান্ত নিলো। তাদের মধ্যে তিন জন অধিকৃত কাশ্মীরের এবং একজন করে আযাদ কাশ্মীর ও পাকিস্তানের।

বাড়িতে আম্মার কাছে চিঠি লিখে জানালাম, আব্বাজানের শাহাদাতের খবর পেলাম। বর্তমানে বাড়িতে আসা কতটা ঝুঁকিপূর্ণ তা আপনি বুঝবেন। আমি আফগানিস্তান চলে যাচ্ছি। আমার জন্য দোয়া করবেন যেন আপনাদের জন্য আযাদীর পয়গাম নিয়ে আসতে পারি। ছোট সোনা বোনটিকে নিয়ে ধৈর্যের সাথে অপেক্ষা করুন, আমি শিগগিরই আশপাশের গ্রাম ক'টি মুক্ত করতে ফিরে আসবো ইনশাআল্লাহ।

একদিন ফরজ অন্তে আল্লাহর কাছে অনেক কান্নাকাটি করে দোয়া মোনাজাত করলাম, হে রাব্বুল আলামীন! সম্মানের জিন্দেগী অথবা শাহাদাত কবুল করো। আর আমাদের আশপাশের অন্তত পাঁচখানা গ্রাম মুক্ত না করা পর্যন্ত দুনিয়া থেকে তুলে নিও না। হে আল্লাহ! তোমাকে চেনার, তোমার কিতাব বোঝার এবং তোমার পথে চলার বোধ যখন আমায় দান করেছো তো পৌত্তলিকদের অধীনতা থেকে মুক্ত হবার মতো কিছু কাজ আঞ্জাম দেয়ার তৌফিক দাও! আমার শহীদ আব্বার কসম দিয়ে বলছি, তাঁর এবং তাঁর অনুগামী শহীদদের কবর যেনো পৌত্তলিক শাসিত কোন জমিনে আর বেশি দিন না থাকে। তুমি আমাকে হিম্মত দাও! শত্রুদের সকল বাধার পাহাড় গুঁড়িয়ে যেন তোমার রাজ কায়েমের পথ সুগম হয় আমার জীবনের বিনিময়ে হলেও।

সাথীদের নিয়ে ওই দিন সকালেই রওয়ানা হলাম আফগানিস্তানের পথে। আমাদের মাদরাসায়ই বিভিন্ন মুজাহিদ গ্রুপের প্রাইমারী শিক্ষা গ্রহণ করেছি। আফগানিস্তানে বিশেষ ব্যবস্থাধীনে সাধারণত এক বছরের ট্রেনিং আমাদের দেয়া হলো মাত্র পাঁচ মাসে। ট্রেনিংয়ে আমাদের সাফল্যে কমান্ডার বেশ খুশি।

আসলে যাদের মন পরিপূর্ণ জ্বলন্ত আগুন, ফিজিক্যাল ট্রেনিং তাদের আর কতটুকুই বা প্রয়োজন? ছোট থেকে ভারি অস্ত্রের ব্যবহার, প্রয়োগ ও প্রয়োগের কৌশল রপ্ত করে আমরা কেবল কমান্ডারের দৃষ্টিই আকর্ষণ করলাম না; বরং অল্পদিন যুদ্ধ করেই তাদের বিশেষভাবে মুগ্ধ করে দিলাম। টানা প্রায় দু'বছর যুদ্ধ করলাম সাফল্যের সাথে। ইতোমধ্যে আমি প্রমোশন পেয়ে মেজর জেনারেলের সম্মানেও ভূষিত হলাম।

আফগান পরিস্থিতি তখন একটা শুভ পরিণতির দিকে টার্ন করেছে। এ সময় এখানে থাকার চেয়ে নিজ ভূ-খণ্ডের প্রতি আমার মনের টান তীব্রতর হয়ে ওঠলো। তাই একদিন সাহস করে সুপ্রীম কমান্ডারকে মনের কথাটা জানালাম। তিনি আমাকে সাদরে অনুমতিই কেবল দিলেন না; বরং পাকিস্তান ও কাশ্মীরের এমন চৌত্রিশ জন মুজাহিদের আমীর নিযুক্ত করে পাঠালেন যারা আমারই মতো

কাশ্মীরের রণাঙ্গনে যাবার জন্য দীর্ঘ দিন ধরে মনে ইরাদা পোষণ করে আসছিলেন। তাদের ষোল জন অধিকৃত কাশ্মীরের, চৌদ্দ জন আযাদ কাশ্মীরের এবং চার জন পাকিস্তানের অধিবাসী।

একদিন প্রত্যূষে নাশতা সেরে সাথীদের নিয়ে রওয়ানা হলাম নিজের জন্মভূমির উদ্দেশে। সে এক আবেগময় রোমাঞ্চকর অনুভূতি। কত চড়াই-উৎরাই, গিরি-কন্দর পাড়ি দিয়ে অবশেষে পৌঁছুলাম কাশ্মীরে। স্বদেশের মাটিতে পা রেখে স্বস্তি র নিঃশ্বাস নিলাম বুক ভরে, ভুলে গেলাম কষ্টকর সফরের কথা। মন-প্রাণ ব্যাকুল হয়ে ওঠলো কখন আমরা জেহাদের শুভ সূচনা করবো। আমাদের হাত কেবলই নিশপিশ করতে লাগলো শত্রুসেনাদের ওপর হামলা চালাতে। কিন্তু তখনও সময় হয়নি, অর্থাৎ সুপ্রিম কমান্ড থেকে কোন নির্দেশ আমরা পাইনি।

এখানকার সুপ্রিম কমান্ডের সাথে পূর্বেই যোগাযোগ করে আসা হয়েছে। তাদের নির্দেশিত স্থানেই আমরা এন্তেজামে আছি। এখানকার মুজাহিদ ছাউনিতে আমাদের আরাম করার নির্দেশ এসেছে। পরবর্তী কর্মপন্থা তাদের নির্দেশেই নির্ধারিত হবে।

অবশেষে অপেক্ষার পালা শেষ হলো। সেদিন যোহরের নামায পড়ে তাঁবুতে ফিরে যাব, ঠিক তখনই সুপ্রিম কমান্ডারের নির্দেশ এলো। আমাদের জন্য আক্রমণের দিকনির্দেশনা এবং আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণ করে দেয়া হলো। খুশিতে সকলেই এক সাথে জড়ো হয়ে পরামর্শ করে নিলাম। কাশ্মীরে এটিই আমাদের প্রথম অভিযান। আল্লাহর ইচ্ছায় অভাবিত সফলতা পেলাম। এরপর আর থেমে থাকা নয়, একের পর এক অভিযান আর সাফল্য আমাদের পায়ে এসে আছড়ে পড়লো। হারালাম অনেক সাথীকে, যোগ হলো অনেক নতুন সাথী। এভাবেই চলতে লাগলো আমাদের অভিযান।

একদিন সুপ্রিম কমান্ডার ওয়ারলেসে ম্যাসেজ পাঠালেন কৃষ্ণপুর আক্রমণ করার জন্য। আমি যেন দীর্ঘ দিন এই নির্দেশের অপেক্ষায়ই ছিলাম। আমার লক্ষ্য কারগিলের উত্তর-পশ্চিম গ্রামগুলোর ওপর। কারণ এই কৃষ্ণপুরেই আমার শহীদ আব্বা হুজুর চির নিদ্রায় শায়িত। মনে মনে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলাম, কৃষ্ণপুর মুক্ত করেই যেন আব্বা হুজুরের কবর জিয়ারত করতে পারি। আজ সে ইচ্ছা পূর্ণ হতে চলেছে। আক্রমণের জন্য সুপ্রিম কমান্ডারের নির্দেশ মতো এবং নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে একটা ছক তৈরি করলাম। তারপর আমাদের এক অন্যতম সাথী কৃষ্ণপুরের বাসিন্দা ভাই মির্জা আবদুর রহমানকে বললাম, দেখো তো কোথাও কোন ত্রুটি আছে কি না? আমাদের পরিকল্পনা সঠিক পথে এগুচ্ছে কি না?

মির্জা আবদুর রহমান প্ল্যানটা ভালো করে দেখে হৃদয়ের গভীর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। আমি কিছুটা হকচকিয়ে গেলাম। তার মুখের দিকে তাকিয়ে

দেখি মুখখানায় বিষাদের ছায়া। সে কিছু বলছে না দেখে বললাম, কোন সমস্যা? প্ল্যানটা কি তোমার পছন্দ হয়নি?

আবারো যেন একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে গেলো আবদুর রহমান। বললো– না, কৃষ্ণপুর আক্রমণের জন্য এর চেয়ে সঠিক প্ল্যান আর কি হতে পারে?

: তাহলে! তোমাকে এমন পেরেশান দেখাচ্ছে কেন?

জবাবে আবদুর রহমান যা বললো তা শুনে আমারও মনটা দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে গেলো। অতি কষ্টে আবদুর রহমান জানালো, তার পিতা ভারতীয় অনুগত চর। আবদুর রহমান নিজে একজন জানবাজ মুজাহিদ হলেও তার ছোট বোনটা নাকি পিতার আদর্শেই বড় হয়েছে। বিশেষত সরকার পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্কুল কলেজগুলোতে সেক্যুলারিজমের নামে ধর্মহীন সিলেবাস চালু থাকায় কাশ্মীরী জনগোষ্ঠীর একটা বিশেষ অংশ সরকারী সুযোগ সুবিধা লাভের আশায় সে শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে নিজেদের দীন ধর্ম তাহজিব তামাদ্দুনের চিন্তা থেকে পিছিয়ে পড়ছে। আবদুর রহমানের পরিবারটি আসলে সেক্যুলার শিক্ষার আড়ালে পৌত্তলিক কালচার মিশ্রিত শিক্ষা-সংস্কৃতির শিকার। তার বোনটিও নাকি কলেজে ফোর্থ ইয়ারের ছাত্রী। ফলে সে মুসলিম পারিবারিক ঐতিহ্যের বাইরে অনেকটাই খোলামেলা। এমন কি তারা বাপ-বেটিতে নাকি মুজাহিদদের এই মুক্তি সংগ্রামেরও বিরোধিতা করে যাচ্ছে।

আবদুর রহমানের কষ্টের উৎসটা সত্যিই বেদনাদায়ক। মাদরাসায় পড়তে গিয়ে স্বজাতির এই চরম দুঃসময় সে চিহ্নিত করতে পেরেছে। তার অন্তর্দৃষ্টি খুলে যাওয়ায় আজ সে পিতার বৈরী, প্রতিপক্ষ হিসেবে চিহ্নিত। তাই পড়াশোনা শেষ করে বাড়িতে না গিয়ে জেহাদের ময়দানেই দীর্ঘ সময় কাটিয়ে দিচ্ছে। প্রায়শই তাকে গুম মেরে বসে থাকতে দেখেছি, কিন্তু কোন প্রশ্ন করার ইচ্ছা হয়নি এতদিন। কারণ মনে মনে ভাবতাম, জিন্দেগির সকল স্বপ্ন সাধ ভুলে স্বদেশকে আযাদ করতে অস্ত্র হাতে ময়দানে নেমে আসা কতটা হিম্মতওয়ালা মানুষের পক্ষে যে তা সম্ভব তা আমার চেয়ে বেশি আর কে উপলব্ধি করতে পারে। হায় আল্লাহ! জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সময় যৌবনের এই দুর্দান্ত গতিলগ্নে যারা নিজ বাড়ি-ঘর, আত্মীয়-পরিজন ফেলে পাহাড়ে জঙ্গলে অস্ত্র হাতে আযাদীর আবাদ করে চলেছে তাদের তুমি কবুল কর। এ জন্যই তাকে এর আগে কখনও ঘাঁটাতে চাইনি।

আমরা যে ঘাঁটিতে আক্রমণের পরিকল্পনা করেছি তা এবং তার অগ্রবর্তী অপর একটি ঘাঁটির মধ্যবর্তী স্থানেই আবদুর রহমানের বাড়ি। আমরা যদি আল্লাহর ইচ্ছায় এই অভিযানে সফল হই তাহলে আমাদের পরবর্তী টার্গেট হবে অগ্রবর্তী ঘাঁটি। আর ভারতীয় দালাল হিসেবে আবদুর রহমানের পিতা হলেন আমাদের

প্রতিপক্ষ। লড়াইয়ের নিয়ম অনুযায়ী এ ধরনের চরদের সাথে কিরূপ আচরণ করার নির্দেশ আছে তা আবদুর রহমানের অজানা নয়।

আবদুর রহমানের দু'কাঁধে দুটি হাত রেখে তার বিষাদময় মুখের প্রতি দৃষ্টি দিলাম। আবদুর রহমান অশ্রুপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালো আমার চোখের দিকে, আবার পরক্ষণে তা নামিয়ে নিলো। কিছুটা আবেগতাড়িত হয়েই আমার মুখ থেকে বের হলো– আবদুর রহমান! তুমি না একজন আল্লাহর পথের সৈনিক!

আমার কথা শেষ হতে দেয়নি সে, তাড়াতাড়ি বললো, কমান্ডার! মেরে পেয়ারে দোস্ত! আল্লাহর দোহাই, তুমি আমাকে ভুল বুঝো না। তকদীরে যদি এমনই লেখা থাকে তো দেখো, পিতার ওপর গুলি ছুঁড়তে আমার অস্ত্র একবারও কাঁপবে না! তুমি দেখো, আমার আঙ্গুল ট্রিগার টানতে তোমার নির্দেশেরও অপেক্ষা করবে না। আমি এই ভেবে পেরেশান হয়েছি যে, আমি এমনই এক বুজ দিল পিতার সন্তান যে কিনা আজ আমাদের এক চরম দুশমন!

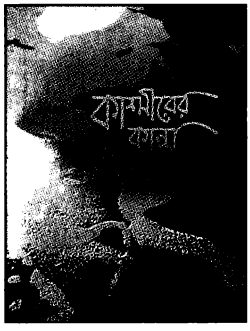
আবদুর রহমানের কাঁধে ঝাঁকি দিয়ে তার বাষ্পরুদ্ধ মুখখানা আমার বুকে চেপে ধরলাম। ভাই আমার, শান্ত হও! আমরা মিছেই অধিক ভেবে চলেছি। তোমার এই আশঙ্কা অমূলকও তো হতে পারে! মহান আল্লাহ সর্বজ্ঞ, অসীম প্রজ্ঞাময় এবং পরম দয়ালু। আমি দোয়া করছি আল্লাহ যেন তাকে সুপথে ফিরিয়ে আনেন। আর তোমাকে কথা দিচ্ছি, এ ব্যাপারে আমি সম্ভব সব ব্যবস্থা নেয়ার চেষ্টা করবো।

এতক্ষণ আবদুর রহমান আমার বুকে মুখ লুকিয়ে চোখের নোনতা অশ্রু বিসর্জন দিচ্ছিল। আমার কথা শুনে হঠাৎ সে কঠিন হয়ে মুখ তুলে তাকালো আমার দিকে। বললো, এমন কথা কখনো মুখে এনো না কমান্ডার! তুমি কখনোই এমন কোশেশ করতে যাবে না যা তোমার কর্তব্যের বাইরে! আল্লাহ যা ফয়সালা করে রেখেছেন তাই হোক!

মৃদু হেসে বললাম, তুমি আমার কর্তব্যবোধ সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করো আবদুর রহমান?

এবার সে প্রায় আর্তনাদ করে ওঠলো। বললো, খোদার কসম! তুমি আমাকে ভুল বোঝো না কমান্ডার! আমি সে কথা বলিনি! সে ফুঁপাতে লাগলো। বাষ্পরুদ্ধ মুখ থেকে তার কথা সরছে না।

আমি তাকে অতি আদরে আমার বুকে চেপে ধরলাম। বললাম, আবদুর রহমান, প্রাণের ভাই আমার! আমি তো ঠাট্টা করছিলাম। তোমাদের মতো আল্লাহর পথের সৈনিকদের ভুল বোঝার আগে যেনো আমার মৃত্যু হয়। প্লিজ, তুমি একটু শান্ত হও! প্রিয় ভাই আমার!



চৌদ্দ

কৃষ্ণপুরের প্রথম শত্রু ক্যাম্পের অভিযানও আমাদের জন্য সাফল্য বয়ে আনলো। এর ঠিক আগে যে অভিযানটি পরিচালনা করেছিলাম সেটি ছিল এ অঞ্চলের ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর (আইবি) একটি কেন্দ্র। কালের কলংক আইবি প্রতিষ্ঠানের অপতৎপরতার কুখ্যাতি কম বেশি আপনারও জানা থাকার কথা। মূলত কাশ্মীরে আইবি কর্মকর্তাদের কাজ হলো, মুজাহিদদের মাঝে পরস্পর দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করা এবং জনসাধারণের মনে মুজাহিদদের প্রতি অনাস্থা জন্ম দেয়া। এরাই সাধারণ স্থানীয় ভারতীয় দালালদের ব্যবহার করে বেশি।

যা হোক, এক সন্ধ্যায় প্রয়োজনীয় অ্যামুনিশন সংগ্রহ করে প্রত্যেককে নিজ নিজ দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে আমি নিজে মিসাইল থ্রো করার জন্য প্রস্তুতি নিই। আবদুর রহমান ভাইকে বলেছি, সে যেন আগে রকেট নিক্ষেপ করে। আমার মিসাইল থ্রো করার কথা তার পরে। পরিকল্পনা মোতাবেক আবদুর রহমান ভাই সর্বপ্রথম রকেট নিক্ষেপ করলো। রকেট সোজা গিয়ে টার্গেট মতো ক্যাম্পে আঘাত হানে। পর মুহূর্তেই আমি মিসাইল নিক্ষেপ করলাম। চোখের পলকে ক্যাম্পটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলো। এবার অন্য সাথীরাও লাঞ্চারের মাধ্যমে গ্রেনেড ছুঁড়তে শুরু করে।

আক্রান্ত ক্যাম্প থেকে আবদুর রহমানের বাড়ির বিপরীত দিকে দু'আড়াই কিলোমিটারের মধ্যে ভারতীয় সৈন্যদের আরো কয়েকটি ক্যাম্প রয়েছে। আমার

আশংকা ছিল, গোলাগুলির শব্দ শুনে তারা বীরত্ব দেখানোর চেষ্টা করে বসে কি না। তাই দুশমনদের আগমনের পথে আগেই পিকাগান সজ্জিত কয়েকজন মুজাহিদ মোতায়েন করে রাখি।

আমার অনুমান সত্য প্রমাণিত করে কয়েকজন সৈন্য এদিকে আসার চেষ্টা করলে মুজাহিদরা তাদের ওপর প্রচণ্ড ফায়ারিং করে। এতে তাদের কয়েকজন সৈন্য মারাও যায়। মাত্র বার মিনিটের মতো আমাদের এ হামলা অব্যাহত থাকে। এরপর পরিকল্পনা মতো আমরা পিছু হটতে লাগলাম।

নিরাপদে জঙ্গলে প্রবেশ করে এক স্থানে বসে আমি ওয়ারলেস অন করলাম। হাসপাতালে অপারেশন থিয়েটারের সামনে অপেক্ষমাণ রোগীর আত্মীয়-স্বজনদের মতো আমাদের অভিযানের ফলাফল জানার জন্য অস্থির হয়ে পড়ি। ওয়ারলেসে কিছুক্ষণ চেষ্টার পর শত্রু পক্ষের ওয়ারলেস লাইন পেয়ে গেলাম। শুনতে পেলাম, ক্যাম্প কমান্ডার হেড কোয়ার্টার প্রধানের কাছে সাহায্য তলব করছে। নিজেদের সাইত্রিশ জন সৈন্যের মৃত্যু ও অনেকে ধ্বংসাবশেষের নিচে চাপা পড়ে থাকার সংবাদ দিয়ে সে বললো, এই ক্যাম্পে আমাদের অবস্থান আর সম্ভব হচ্ছে না। আশপাশের ক্যাম্পগুলোতে যেন বলে দেয়া হয়, তারা যেন 'সন্ত্রাসীদের' ওপর কড়া দৃষ্টি রাখে এবং গতিবিধি দেখে রাখে। ওরা যে গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নেবে, দিনের আলোয় ঘেরাও করে আমরা ওদের গ্রেফতার করবো।

জবাবে হেড কোয়ার্টার প্রধান অগ্নিশর্মা হয়ে তাদের ব্যর্থতার জন্য গালি-গালাজ শুরু করলো। এবার একটু রসিকতা করে ওয়ারলেসে তাদের লক্ষ্য করে বললাম, কি ভাই, কেমন বুঝলে?

জবাবে তাদের অপারেটর গলার স্বর ঈষৎ চড়িয়ে বলতে লাগলো, আমি জানি তুমি আফগানী, কিন্তু তোমরা আমাদের মারছ কেন? মারতেই যদি হয় তো, নরসীমাকে মার। আমাদের গরীব ছেলে-মেয়েদের এতীম করে তোমাদের লাভ কী?

বললাম, তাই নাকি! ভালো করে শুনে রাখ, আমি কাশ্মীরী। আফগানী নই। তোমাদের নরসীমা তো আমাদের মজলুম ভাইবোনদের রক্ত ঝরানোর জন্য এখানে আসে না। হ্যাঁ, আফগানী ভাইয়েরা যদি এসেও থাকে তো তারা এসেছে তোমাদের আগ্রাসী জবর-দখল থেকে তাদের ভাইদের রক্ষা করতে। তোমাদের মতো জুলুম করতে নয়। আমার কথা শুনে অপারেটর অশ্রাব্য গালি-গালাজ শুরু করে দিলে আমি সেট বন্ধ করে দিই।

এমন সময় একজন সাথী আমার নিকট এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলতে লাগলো, ভাই আবদুর রহমান জখমী হয়েছেন। তাঁর জখম মারাত্মক। তবে বাকীরা নিরাপদে ফিরে এসেছেন। আবদুর রহমানকেও ধরাধরি করে কাছাকাছি নিয়ে আসা হয়েছে। শীঘ্রই চলুন।

আমার এতক্ষণের প্রফুল্লতার রেশ কেটে গিয়ে মুখে বিষাদের ছায়া নেমে এলো। কষ্টে আমার অন্তরটা যেন মোচড় দিয়ে ওঠলো। তক্ষুণি ছুটে গেলাম আহত আবদুর রহমানের কাছে। তার অবস্থা সত্যিই সংকটাপন্ন। নিকটে হাঁটু গেঁড়ে বসে তার মস্তকটা আমার কোলে তুলে নিয়ে দ্রুত চিকিৎসার এন্তেজাম করতে নির্দেশ দিতে যাচ্ছিলাম। আবদুর রহমান আমাকে হাত ইশারায় থামিয়ে দিয়ে টেনে টেনে বললো, দোস্ত! তুমি অভিজ্ঞ যোদ্ধা। বুঝিয়ে বলার দরকার নেই। আমার সময় শেষ। অনর্থক পেরেশান হয়ো না। আমি খুশি যে, তোমার মতো একজন খোদাপ্রেমিক সফল মুজাহিদের কোলে মাথা রেখে শেষ নিঃশ্বাস নিতে পারছি।

তার এই কষ্টজড়িত কণ্ঠের প্রতিটি কথা আমার অন্তরকে বিদীর্ণ করে দিচ্ছিল। সান্ত্বনা দেবার ভাষা আমি হারিয়ে ফেললাম। কেবল উষ্ণ আলিঙ্গনে তাকে আরো জোরে চেপে ধরে কপোলে চুমো খেলাম। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললাম, ভাই আমার! আমাকে ফাঁকি দিয়ে আগেই তুমি চলে যাচ্ছ!

আবদুর রহমানের কণ্ঠ আরো জড়িয়ে আসছে। বললো, তুমি আমাকে সত্যিকার ভালোবাসলে আমার এ শাহাদাতে তুমি খুশি হতে পারছো না কেন? তুমি আল্লাহর কাছে আমার শাহাদাত কবুলের জন্য দোয়া করবে না?

গুলি বেঁধা বুক থেকে তার দরদর ধারায় রক্ত গড়িয়ে কামিজ ভিজে যাচ্ছে। আমি হাত দিয়ে চেপে ধরলাম ক্ষতস্থানটি।

আবদুর রহমান টেনে টেনে বললো, রক্ত বেরুতে দাও! এই জমিন শহীদের খুনে আরও উর্বর হয়ে ওঠুক। ভাই ওসামা! আফসোস! আমি তোমাদের আর কোন সাফল্যের অংশীদার হতে পারবো না। একটা অনুরোধ রাখবে ভাই আমার?

বললাম, বলো কি করতে হবে আমায়?

আমার লাশটা যে করেই হোক বাড়িতে দিয়ে এসো। হতে পারে আমার এ লাশ আমার আব্বাকে সুপথে ফিরিয়ে আনতে পারে। আমি যে তাঁর একমাত্র পুত্র। আমার আব্বা আম্মা ও একমাত্র বোনটিকে সুপথে ফিরিয়ে আনার একটু কোশেশ তুমি করো ভাই। আমি জানি, আমার মৃত্যু তাদের কিছুটা হলেও

বিচলিত করবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, অল্প ক'দিনেই তোমরা শুধু কৃষ্ণপুরই মুক্ত করবে না; বরং গোটা কারগিল সহসাই তোমাদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে। বিদায় দোস্ত, সমুদয় কসুর মার্জনা করো। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ...!

আমার দু'চোখে অশ্রুর বন্যা। চাপা কান্না সামলে নিয়ে পড়লাম ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। হঠাৎ লক্ষ করলাম, শহীদ আবদুর রহমানের তাজা খুন থেকে যেন এক অপার্থিব সুগন্ধ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। আমি আবেগমথিত কণ্ঠে ঘোষণা করলাম, বন্ধুরা! শুনে রাখ, মির্জা আবদুর রহমান শহীদ হয়েছেন। এই দেখো, তাঁর খুন থেকে কেমন সুগন্ধ ছড়াচ্ছে। তাঁর প্রতি বিন্দু খুনের বদলা আমরা এই জমিনেই নিবো ইনশাআল্লাহ! আবদুর রহমানের লাশ তাঁর শেষ ইচ্ছামতো বাড়িতেই দাফন করা হবে। আর আজ রাতে আমরা কৃষ্ণপুরের দ্বিতীয় ঘাঁটিতে আক্রমণ করবো। তোমরা তৈরি হয়ে নাও। আমি সুপ্রিম কমান্ড থেকে অনুমতি আদায় করে এক্ষুণি পার্শ্ববর্তী মুজাহিদ ক্যাম্প থেকে আরও অ্যামুনিশন ও মুজাহিদ আনিয়ে নিচ্ছি।

আমার ঘোষণায় মুজাহিদদের মধ্যে একটা রোমাঞ্চকর গুঞ্জরন শুরু হয়ে গেল।

* * *

আসন্ন শীত মওসুমের মধ্যে কারগিলের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধিকার লাভের লক্ষ্যে পরিচালিত আমাদের প্রতিটি আক্রমণ ছিল পরিকল্পিত। অর্থাৎ এখন থেকে বিক্ষিপ্ত কোন আক্রমণ নয়; বরং আমাদের দখলকৃত এক ইঞ্চি জমিনও ছেড়ে না দিয়ে যতটুকু রক্ষা করতে পারবো ঠিক আক্রমণ হবে ততটুকু এরিয়ার মধ্যেই। সে হিসেবে আইবি ক্যাম্প ও কৃষ্ণপুরের প্রথম ক্যাম্পটি এখন আমাদের দখলে। শত্রুরা নিশ্চয়ই আজ রাতে দ্বিতীয় কোন ক্যাম্পে আক্রমণের আশঙ্কা করবে না। তাদের এই অপ্রস্তুত অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করবে মুজাহিদরা– এমন একটা ধারণা নিয়েই দ্বিতীয় ক্যাম্প আক্রমণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি।

সুপ্রিম কমান্ডারের কাছ থেকে অনুমতি নিতে খুব একটা বেগ পেতে হয়নি। অ্যামুনিশন ও মুজাহিদের সংখ্যা আশানুরূপ না পেলেও আমার আকুতি, আবেগ ও প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তিকে অবমূল্যায়ন করেননি সুপ্রিম কমান্ড। সিদ্ধান্ত হলো– আমিসহ আট জন মুজাহিদ শহীদ আবদুর রহমানের লাশ নিয়ে তাদের বাড়িতে যাব। প্রায় পৌনে দুই কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত দ্বিতীয় ক্যাম্পটি আক্রমণের দায়িত্ব দেয়া হলো ভারতীয় বাহিনীর কাছে যমদূত বলে খ্যাত আবদুল

ওয়াহেদকে। আমি পরিকল্পনা প্রণয়ন করে আবদুল ওয়াহেদসহ প্রত্যেককে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণ ও ধরনসহ নিজ নিজ দায়িত্ব বুঝিয়ে দিলাম।

এক সাথে মার্চ করে যাত্রা শুরু হলো আমাদের। মির্জা আবদুর রহমানের লাশের খাটিয়া রাখা হলো বাহিনীর মাঝামাঝি। টান টান উত্তেজনা আর আক্রমণের রোমাঞ্চকর অনুভূতি নিয়ে মোটামুটি একটা বড়সড় কাফেলা অল্প সময়ের মধ্যেই কৃষ্ণপুরের মাঝামাঝি আবদুর রহমানদের বাড়ির নিকটবর্তী হলাম। সবাইকে থামার ইঙ্গিত করে পুনরায় একটা ছোটখাট ব্রিফিং দিই। আমার সহগামী হিসেবে আট জনের একটি ছোট দল বাদে সবাই রওয়ানা দিল পূর্ব দিকে অবস্থিত ভারতীয় সেনা ক্যাম্পের প্রতি। সবার গমন পথের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে লাশ নিয়ে আমরা এগিয়ে গেলাম আবদুর রহমানদের বাড়ির আঙ্গিনায়।

তখন মধ্যরাত, চারদিক নিস্তব্ধ। ভারতীয় বাহিনীর দালালী করে গ্রামের মধ্যে মির্জা বাড়িটি বেশ দর্পের সাথেই মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। প্রাচীরঘেরা দোতলা দালান বাড়ি। বাড়িতে বিদ্যুৎ আছে। চারদিকে জৌলুসের সাক্ষ্য বহন করছে প্রতিটি বস্তু। গেটের সামনে যেতেই দারোয়ান ভেতর থেকে হকচকিয়ে জানতে চাইলো, কে? কী চাই?

আমিই কথা বললাম প্রথম। বললাম, গেট খুলে দাও। ভিতরে কাজ আছে।

ভিতর থেকে আওয়াজ এলো, মালিকের হুকুম নেই। গেট খোলা যাবে না।

ধমকের সুরে বললাম, গেট খুলে দিয়ে মালিককে ডাক। অনর্থক সময় ক্ষেপণ করলে আমরা গেট ভেঙ্গে ফেলতে বাধ্য হবো। আমাদের সাথে মির্জা আবদুর রহমানও রয়েছে। শীঘ্রই খুলে দাও দরজা।

দারোয়ান মনে হয় ভয় পেয়ে গেছে। বলল, আপনারা একটু অপেক্ষা করুন। আমি মালিককে ডেকে আনছি। সম্ভবত তাকে ডাকতে হয়নি, এমনিতেই মির্জা সাহেব নিচে নেমে এলেন। কিছুক্ষণ আগের অভিযানের কথা তাঁর অবিদিত থাকার কথা নয়। এ অবস্থায় তিনি এক্ষুণি ঘুমিয়ে পড়ার কথা নয়। গেটের ওপারে থেকে আমার নাম শুনেই তিনি চিনতে পারলেন এবং গেট খুলে দেবার নির্দেশ দিলেন।

আমাদের দেখে মির্জা সাহেব যতটা না বিস্মিত হলেন তার চেয়েও বেশি অবাক হলেন লাশবাহী খাটিয়া দেখে। সালাম জানিয়ে বললাম, আপনাদের আবদুর রহমান ফিরে এসেছে, তবে তার জীবনের বিনিময়ে কৃষ্ণপুরকে আযাদী দিয়ে

গেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সমগ্র কৃষ্ণপুর হানাদারমুক্ত ঘোষণা করা হবে ইনশাআল্লাহ। আবদুর রহমানের শেষ ইচ্ছা তার লাশটা যেন আপনাদের কাছে হস্তান্তর করি।

প্রথম দর্শনে মির্জা সাহেবকে যতটা স্পর্ধিত গর্বিত কর্তৃত্বপরায়ণ বলে মনে হয়েছিল, আমার কথা শুনে পঞ্চাশোর্ধ্ব এই সুঠাম দেহের মানুষটি হঠাৎ যেন বিধ্বস্ত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলেন। ছুটে গিয়ে ঢাকা দেয়া চাদরের প্রান্ত সরিয়ে প্রিয় সন্তানের মুখখানি দেখে হাউমাউ করে কেঁদে ফেললেন। তাঁর কান্নার শব্দে বাড়িটি যেন দিনের চঞ্চলতা ফিরে পেল। ওপর থেকে মা-মেয়ে ছুটে এলেন খবর শুনে। বিদ্যুতের আলোতে তাদের দেখে মনে হলো তারা যেন চলনে বলনে একটু বেশিই আধুনিক। কলেজপড়ুয়া আবদুর রহমানের যুবতী বোনটার পোশাক আশাক দেখে মনে হবে মুম্বাইর কোন নায়িকা যেন নাইট ড্রেস পরে শ্যুটিং স্পটে নেমে এলো। এদের দেখে কে বলবে যে, এরা কোন অভিজাত মুসলিম ঘরের সদস্য?

বাড়িতে কান্নার রোল পড়ে গেলো। চাকর বাকরসহ বাড়ির প্রতিটি প্রাণী এবং প্রতিবেশীদেরও অনেকেই ছুটে এলো চিৎকার চেঁচামেচি শুনে। আমি কিছুটা গম্ভীর সুরে বললাম, দাফন কাফনের জোগাড় করুন। আমরা অল্পক্ষণের মধ্যেই জানাযা ও দাফন-কাফন সেরে তবে যাবো। আমাদের হাতে সময় খুবই কম, জলদি করুন।

আমাদের প্রতি মির্জা সাহেবের মনোভাব বুঝা গেলো না। তিনি এগিয়ে এসে বললেন, দিনের বেলা দাফন-কাফন করলে হয় না?

কণ্ঠে দৃঢ়তা এনে বললাম, না, হয় না। আপনারা ভুলে যাচ্ছেন এটা কোন সাধারণ মানুষের লাশ নয়। তিনি একজন শহীদ মুজাহিদ। তাঁর লাশের কোনরূপ অমর্যাদা হোক এটা আমরা চাই না। তাছাড়া বেশি জানাজানি হৈ-হাঙ্গামা করলে আপনাদেরও ক্ষতি হতে পারে।

মির্জা সাহেব গুম মেরে গেলেন। এতক্ষণে যেন আমার কথা তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন। বললেন, তাই হবে বাবা, এখনি আমি সব ব্যবস্থা করছি। তার কণ্ঠ কেমন যেন বিধ্বস্ত মনে হলো।

আমরা যখন জানাযা শেষে শহীদ আবদুর রহমানের লাশ কবরে নামাচ্ছিলাম তখন কৃষ্ণপুরের পূর্বপ্রান্তে কিয়ামতের গর্জন শোনা যাচ্ছিল। আমার বুঝতে বাকি রইলো না, কমান্ডার আবদুল ওয়াহেদ তার আক্রমণটি পরিকল্পনা মতোই চালাতে পেরেছে। বিস্ফোরণের প্রতিটি শব্দ শুনে অকুস্থলের দৃশ্যটা আমার চোখে

ভেসে ওঠছিল। আমি মনের চোখে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম, বীর মুজাহিদরা কোথায় কিভাবে অবস্থান নিয়ে আক্রমণ পরিচালনা করছে। তবু লড়াইয়ের ফাইনাল খবরটা জানার জন্য আমার মনটা বেকারার হয়ে ওঠলো।

মির্জা সাহেব উৎকর্ণ হয়ে বিস্ফোরণের শব্দ শুনছিলেন। আমার কাঁধে হাত রেখে বিস্ফারিত নয়নে জানতে চাইলেন, বেটা! কী হচ্ছে এসব? কিছুই বুঝতে পারছি না!

বললাম, কৃষ্ণপুর আযাদ হচ্ছে চাচাজান। ভারতীয় হায়েনাদের জবর-দখল থেকে মুক্ত হচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সব জানতে পারবেন। আমরা এক্ষুণি বিদায় নেব। রাত আর বেশি বাকি নেই।

দশ বার জন প্রতিবেশী ও আট সদস্যের মুজাহিদের ছোট দলটি নিয়ে হৃদয়ের সব আকুতি জানিয়ে মহান আল্লাহর দরবারে আবেগময় একটি মোনাজাত পেশ করলাম। মোনাজাতের ভাষা শুনেই সম্ভবত মির্জা সাহেব আবদুর রহমানের প্রতি আমাদের ভালোবাসার পরিমাণ উপলব্ধি করতে পারলেন। বুঝতে পারলেন আমাদের মিশন, জেহাদের গুরুত্ব এবং তাঁর নিজের বেঈমানীর পরিণতি। তার অন্তর্চক্ষু যেন খুলে গেল। এতদিনের ঝংধরা ঈমানী তেজ যেন নতুন সাড়ায় জেগে ওঠলো আরও দীপ্তিমান হয়ে। মোনাজাত শেষে মির্জা সাহেব আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলতে লাগলেন, বেটা! তুমি শুধু বলে যাও আমার এতদিনের বুজদিলির কাফফারা কী হতে পারে?

বললাম, তওবা এবং তওবা। সেই সাথে কাশ্মীরকে শয়তানের কবল থেকে মুক্ত করতে যদি কিছু সামর্থ্য থাকে তা কাজে লাগানো আর আমাদের জন্য দোয়া। এই তো!

এতদিনের কঠিন এবং কর্তৃত্বপরায়ণ মানুষটার এই অসহায়ত্বের রূপটা আমাকে অভিভূত করে দিল। তিনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন। বললাম, চাচাজান! আপনি কাঁদছেন! আপনি তো চরম সৌভাগ্যবান যে, আপনি একজন শহীদ মুজাহিদ বেটার পিতা। এর চেয়ে সৌভাগ্য একজন মুসলমানের আর কি হতে পারে বলুন?

কয়েকটা সান্ত্বনার বাণী বলে তাকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে বললাম, চাচাজান, আপনি তো জানেন শয়তানদের কোন বিশ্বাস নেই। আবদুর রহমানের কথামতো তার লাশ বাড়িতেই দাফন করা হলো। কিন্তু এ লাশ বা তাঁর কবরের কোন অমর্যাদা আমরা হতে দিতে পারি না। সপ্তাহখানেক তাঁর কবরের সিকিউরিটি হিসেবে ক'টি স্থল মাইন পুঁতে রেখে যাচ্ছি। আপনাদের কেউ যেন

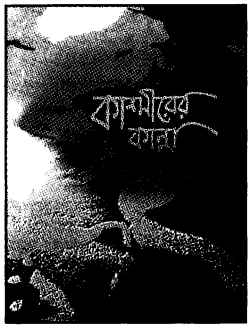
কবরের আশপাশে ক'দিন না যায়। সময় হলে আমরাই তা সরিয়ে নিয়ে যাবো। কোন পৌত্তলিক যেন শহীদের লাশ বা কবরের কোনরূপ অমর্যাদা না করতে পারে তার জন্য এ ব্যবস্থা।

মির্জা সাহেব আমার কথায় ঘাড় কাত করে সায় দিলেন এবং আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, আমার শহীদ সন্তানের কসম! মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত আমার একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান হবে মুজাহিদদের সহযোগিতা করা। কাশ্মীর আযাদ করতে আমার জীবন ও সম্পদ আল্লাহর নামে ওয়াক্‌ফ করে দিলাম।

প্রয়োজনীয় কাজ সেরে আমরা রাস্তার পাশে এসে দাঁড়ালাম। কিছুক্ষণ আগেই গুলির শব্দ বন্ধ হয়ে গেছে। রাস্তায় ওঠেই দু'জন মুজাহিদের সাথে দেখা। কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই তারা বললো, আলহামদুলিল্লাহ! অপারেশন সাকসেস! সবাই ফিরে আসছে। আবদুল ওয়াহেদ ভাই বলেছেন, রাতের অন্ধকার থাকতে থাকতেই আমাদের নিরাপদে চলে যেতে হবে।

আল্লাহর শোকর আদায় করে বললাম, অবশ্যই। ওরা কতক্ষণের মধ্যে পৌঁছুবে? আমার কথা শেষ হবার আগেই দেখি দু'চার জন করে মুজাহিদ এদিকে এগিয়ে আসছে। এমন সময় আবদুল ওয়াহেদ ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে বললো, আল্লাহর শোকর! আমাদের কেউ একটুখানি আহতও হয়নি। শত্রুদের সিংহভাগ মারা গেছে, বাকিরা আহত। এদিকের খবর বলুন!

বললাম, চল যেতে যেতে বলা যাবে। আমি চিন্তা করছি, আগামীকাল দিনের আলোতে ওরা ক্ষুধার্ত হায়েনার চেয়েও হিংস্র হয়ে গ্রামে কোন পৈশাচিকতা শুরু করে দেয় কি না!



পনর

পনেরই আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা দিবস। এদিন ভারত অধিকৃত কাশ্মীরে পালিত হয় কালো দিবস। কড়া নিরাপত্তার ভিতর দিয়ে সরকারি অনুষ্ঠান ছাড়া কোন আনন্দ উৎসব পালিত হয় না। সেদিন চারদিকে থাকে কেবল কালো পতাকার ছড়াছড়ি। কাশ্মীরের জনতা চৌদ্দই আগস্ট তাদের স্বাধীনতা উৎসব পালন করে। সেদিন সকাল থেকেই শুরু হয় আনন্দ উৎসব। জাতীয় পতাকা বুকে জড়িয়ে রাস্তায় নামে যুবক-বৃদ্ধ এমনকি শিশু-কিশোররাও। প্রতিটি ঘরে আযাদীর চিহ্ন চাঁদ-তারা খচিত পতাকা শোভা পায়। রাস্তার মোড়ে মোড়ে দেখা যায় স্বাধীনতার দাবি ও ভারতের বিরুদ্ধে ঘৃণা এবং শাহাদাতের অমর বাণী লিখিত সবুজ ব্যানার টানানো।

সেবারও অন্যান্য বছরের ন্যায় বেশ জাঁকজমকের সাথে চৌদ্দই আগস্ট পালন করা হয়। প্রতিটি মহল্লায় যেন আনন্দের হিল্লোল বয়ে যাচ্ছিল। প্রতিটি ঘরে শোভা পাচ্ছিল উড়ন্ত ঝাণ্ডা এবং রাস্তার মোড়ে সবুজ ব্যানার, যাতে ভারত বিরোধী নানারকম শ্লোগান লেখা। কৃষ্ণপুরের শেষ ঘাঁটিতে হামলার পর তিন দিন পার হয়ে গেলো। এখনও আমরা সীমান্ত চৌকি বসাইনি। কারণ সুপ্রিম কমান্ড জানিয়েছে, কারগিলের পাদদেশ পর্যন্ত মুক্ত করে তবেই সীমান্ত চৌকি বসানো হবে। আর এবারের কঠিন শীতের সময় অবশ্যই পুরো কারগিল দখলে আনতে হবে।

আমিও বেশ খুশিই হলাম এই নির্দেশ শুনে। কারণ কারগিল উপত্যকার পশ্চিম-উত্তর কোণেই আমাদের বাড়ি। যদিও খুবই ইচ্ছা করছিল আব্বাজানের কবর

জিয়ারত করতে। আম্মাজান এবং আমার একমাত্র ছোট বোন সুমাইয়াকে একনজর দেখার জন্য আমার মনটা এক অজানা ব্যথায় টনটন করছিল। তবুও নিজেকে সংযত রেখে সুপ্রিম কমান্ডের নির্দেশ পালন করে গেলাম। কেবলই আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছিলাম যেন গোটা কারগিল মুক্ত করেই বাড়িতে যেতে পারি।

আমাদের এই শিবির থেকে তিন মাইল দূরে শহীদ আবদুর রহমানের বাড়ি। গত তিন দিনে তেমন কোন অস্বস্তির খবর পাইনি। আমাদের গোয়েন্দারা কেবল জানিয়েছে, গ্রামে ক্র্যাক ডাউন বসিয়ে নিরীহ গ্রামবাসীদের লাঞ্ছনা করা হচ্ছে। এমনটা হামেশাই হয়ে থাকে। তাই এ ব্যাপারে ত্বরিৎ কোন ব্যবস্থা নেয়ার প্রয়োজন বোধ করিনি। বিকেল বেলা আবদুল ওয়াহেদকে বললাম, চল কৃষ্ণপুরে আবদুর রহমানের বাড়িটা একবার ঘুরে আসি। নিজেদের চোখে দেখে আসি সেখানকার অবস্থা কি। আবদুল ওয়াহেদ আমার প্রস্তাবে রাজি হলো। তেমন কোন ভারি অস্ত্র সাথে নেইনি। আফগানিস্তানে লড়াইয়ের সময় গনিমতের ভাগ হিসেবে সেখানকার সেক্টর কমান্ডার আমাকে সাইলেন্সারযুক্ত একটি রাশিয়ান রিভলবার উপহার দিয়েছিলেন। প্রয়োজনীয় গুলি লোড করে সেটিই সাথে নিলাম। আবদুল ওয়াহেদ নিল একটি কালাশনিকভ।

আসরের নামায পড়ে বেরিয়েছিলাম। পড়ন্ত বিকেলের ফিকে রোদ গ্রামের সবুজ মাঠে আছড়ে পড়ছিল। মিনিট বিশেক হাঁটার পর একটি পরিচ্ছন্ন সুন্দর স্থানীয় ফল-ফলারির বাগানের ভিতর প্রবেশ করলাম। সরু রাস্তা, দু'পাশে বাগান। বেশ মনোরম এবং গুছানো মনে হচ্ছিল দু'পাশের ফলের বাগান। পরে জেনেছি, এই বাগানগুলো মির্জা সাহেবের গড়া। যে মাদরাসা ও মসজিদে বিকেলে আপনাকে নিয়ে গিয়েছিলাম তার পশ্চিমেই বাগান দুটি এখনও তেমনিই আছে। এসবের সমুদয় আয় এখন এই মসজিদ মাদরাসার খাতে ব্যয় হয়।

আবদুর রহমানদের বাড়ির নিকটবর্তী হলে চোখের সামনে দেখতে পেলাম দু'জন তরুণীকে টেনে হেঁচড়ে চার পাঁচ জন ভারতীয় সৈন্য বিপরীত দিক দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। দিনের আলোয় স্পষ্ট এই দৃশ্য দেখে আবদুল ওয়াহেদকে বললাম, দোস্ত এ্যাকশান! সেও দেখতে পাচ্ছিল এ দৃশ্য। সম্ভবত আমার প্রতিক্রিয়া লক্ষ করছিল সে। তাড়াতাড়ি বাগানের ভিতর দিয়ে নিঃশব্দে দৌড়ে এগিয়ে গেলাম কাছাকাছি। ওরা আমাদের অস্ত্রের রেঞ্জে আছে এখন। একটু থেমে চারদিকের পরিস্থিতি আঁচ করে নিলাম। না, আশপাশে কোথাও অন্য কোন ভারতীয় সৈন্যের অস্তিত্বের প্রমাণ মিলছে না। মুখে আঙ্গুল দিয়ে আবদুল ওয়াহেদকে শব্দ করে ফায়ার করতে নিষেধ করে দ্রুত আমি এগিয়ে গেলাম সামনে। একটি বড় ফলবান বৃক্ষের আড়ালে থেকে সাইলেন্সারযুক্ত রিভলবারটি তাক করলাম। ট্রিগার

টানার সাথে সাথে ফণা তোলা সাপের শীষের মতো শব্দ করে এক ঝাঁক গুলি বেরিয়ে গেলো। মুহূর্তেই লুটিয়ে পড়লো তিন জন শত্রু সেনা। তাদের হাত ফসকে ছিটকে দাঁড়ালো তরুণীদ্বয়। ঘটনার আকস্মিকতায় তারাও থরথর করে কাঁপছে। গুলির শব্দ না হওয়ায় অপর সৈনিকটি সীমাহীন বিস্মিত হয়ে এদিক সেদিক তাকাচ্ছিল। কিছু বুঝে ওঠার আগেই আবার ট্রিগার চাপলাম। গোড়া কাটা গাছের মতো লুটিয়ে পড়লো তার লাশ জমিনে।

আবদুল ওয়াহেদ হাসতে হাসতে কাছে এসে বললো, দোস্ত তাজ্জব অস্ত্রটি তুমি সাথে করে এনেছো সেটা তো আগে বুঝিনি! আমি তো ভেবেছিলাম সাধারণ রিভলবার।

হেসে প্রতিউত্তর দিয়ে এগিয়ে গেলাম তরুণী দু'জনের দিকে। তারা তখন কবুতরের মতো কাঁপছিল। সম্ভবত নরপিশাচদের টানা হেঁচড়ায় গায়ের বসন তাদের সবটুকু গায়ে নেই। পথে হয়তো ছিঁড়ে-ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে থাকবে। একনজর চোখ তুলে তাকালাম ওদের দিকে। ভয় আর লজ্জার আবেশ মাখানো এক আশ্চর্য অভিব্যক্তি ফুটে রয়েছে তাদের মুখাবয়বে। তখনও চিনতে পারিনি এদের একজন আবদুর রহমানের বোন নূরজাহান! সেদিন রাতে তার অপরিসর নাইট ড্রেসে মনে হয়েছিল মুম্বাইর কোন নায়িকা। কিন্তু আজ দিনের আলোতে এতটা কাছে থেকে দেখে মনে হচ্ছে তার রূপ ঐশ্বর্য মুম্বাইয়ের যে কোন নায়িকার চেয়েও কমনীয় এবং শিল্প সুষমাপূর্ণ। বিশ্বাস করুন মাহমুদ সাহেব! আল্লাহ তাআলাকে ভয় করেই মেয়েদের প্রতি একবারের বেশি দৃষ্টি আমি দেইনি কোনদিন। কিন্তু আজ কি যেন হলো! আমার চোখ নূরজাহানের ওপর থেকে সরাতে বেশ দেরিই যেন হলো। উত্তেজনায় উৎকণ্ঠায় তার গোলাপের পাপড়ির মতো ওষ্ঠদ্বয় বাঁশ পাতার মতোই কাঁপছিল। তাদের মুখ থেকে কোন কথা সরছিল না, আমাদেরও।

এ যে আবদুর রহমানের বোন নূরজাহান তা আমি চিনতে না পারলেও সে ঠিকই আমাকে চিনেছিল। আবদুল ওয়াহেদ বললো, আমরা তোমাদের ভাই। তোমাদের বাড়ি কোনটা?

নূরজাহানের সঙ্গিনী কাঁপা গলায় বললো, ও মির্জা বাড়ির শহীদ আবদুর রহমানের বোন নূরজাহান। আমাদের বাড়িও তাদের বাড়ির কাছেই। মেয়েটি সম্ভবত আমাদের মুজাহিদ ভেবেই শহীদ আবদুর রহমানের বোন পরিচয় দিয়েছে।

আবদুল ওয়াহেদ বললো, চল তোমাদের বাড়িতে পৌঁছে দিই।

শঙ্কিত পায়ে আমাদের সাথে তারা বাড়ির পথ ধরলো।

মির্জা বাড়ির পেছনের বাগানেই এক অপরিসর জায়গায় জড়ো হয়েছে গ্রামের বেশ কিছু লোক। এদের মধ্যে নারী-পুরুষ, যুবক-বৃদ্ধ, শিশু-কিশোরও রয়েছে। মুজাহিদ কর্তৃক গ্রামের দু'তিনটি ভারতীয় ক্যাম্প বিধ্বস্ত হওয়া এবং মির্জা সাহেবের আকস্মিক এই পরিবর্তন গ্রামবাসীকে বেশ অনুপ্রাণিত করেছে এবং সাহস যুগিয়েছে। মির্জা সাহেবকে এখন তারা ভয় পায় না, ঘৃণা করে না। এখন তিনি আর সব গ্রামবাসীর মতোই স্বাধীনতাকামী। তাঁর ছেলে আবদুর রহমান শহীদ হয়েছে এবং তাদের বাড়িতেই তাঁর লাশ দাফন করা হয়েছে– এ কথা গ্রামবাসী জেনে গেলেও ভারতীয় বাহিনী হয়তো এখনো টের পায়নি।

নূরজাহান দৌড়ে গিয়ে বাপের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। মেয়েকে জড়িয়ে ধরা অবস্থায় তাঁর দৃষ্টি পড়লো আমাদের ওপর। আমরা সালাম দিয়ে সামনে দাঁড়ালাম। সমবেত গ্রামবাসীও উৎসুক দৃষ্টি মেলে তাকাল আমাদের দিকে। এতক্ষণ এখানে চাপা বিলাপ চলছিল। মির্জা সাহেব মেয়েকে ছেড়ে আমাদের আরও কাছে এলেন। বললেন, বেটা! তোমরা সময় মতোই এসেছো। আমার বর্তমান অবস্থান ওদের কাছে পরিষ্কার না হলেও ওদের তিনটি ক্যাম্প ধ্বংস হওয়ার পরও আমার নির্লিপ্ততা ওদের বেশ ভাবিয়ে তুলেছে। আমাকে এখন তারা বিষছাড়া সাপ মনে করে আমার ওপরই নির্যাতন চালাতে শুরু করেছে। সব জেনে গেলে যে অবস্থাটা কি দাঁড়াবে আল্লাহই ভালো জানেন!

বললাম, উদ্বিগ্ন হবেন না চাচাজান! সে সুযোগ আর তারা পাবে না। দু'একদিনের মধ্যেই আমরা পার্শ্ববর্তী ক্যাম্পগুলো গুঁড়িয়ে দিয়ে সীমান্ত চৌকি বসাব ইনশাআল্লাহ। তিনটি ক্যাম্পে এক সাথে হামলা করতে যে প্রয়োজনীয় অ্যামুনিশন ও মুজাহিদ দরকার তা কেন্দ্রে চেয়ে পাঠানো হয়েছে। আজ কালের মধ্যেই হয়তো এসে পড়বে।

মির্জা সাহেব গ্রামবাসীদের দেখিয়ে বললেন, আজ দুপুরে ক্র্যাকডাউন ওঠানো হয়েছে। গাঁয়ের বউ-ঝিরা পর্যন্ত এবার রেহাই পায়নি। আমার মেয়েকে তো তোমরাই উদ্ধার করে নিয়ে এলে। আর ওই যে দেখছো গাছের গোড়ায় বসে স্বামী স্ত্রী বিলাপ করছে, ওদের ওপর দিয়ে কেয়ামতের প্রলয় বয়ে গেছে।

মির্জা সাহেবের হাত ইশারা দেখে তাকালাম গাছের গোড়ায় বসে থাকা কান্নারত স্বামী-স্ত্রীর দিকে। মির্জা সাহেব বলতে লাগলেন, কাল ক্র্যাক ডাউন বসানোর সময় মুজাহিদ সন্দেহে ওকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। আমি অনুরোধ করলে সে এই গ্রামেরই একজন চাষী তা শনাক্ত করে আজ দুপুরে বাড়ি পৌঁছে দিতে এসে সীমাহীন পৈশাচিকতা চালায়। অফিসার প্রথম প্রস্তাব করে তোমাকে ছেড়ে দিতে পারি এক শর্তে।

সে বলেছিল, কি শর্ত স্যার?

জবাব দিলো– তোমার বড় মেয়েটাকে এক রাতের জন্য স্বেচ্ছায় ক্যাম্পে পাঠিয়ে দিবে।

সারা জীবন সাদাসিধে জীবন কাটানো কাঠখাট্টা চাষী– এমন প্রস্তাব শুনে তার মাথায় আগুন ধরে যায়। রাগে কাঁপতে কাঁপতে এক দলা থুতু অফিসারের মুখে নিক্ষেপ করে প্রচণ্ড এক ঘুষি বসিয়ে দেয়। মাথা ঘুরে ছিটকে পড়ে যায় অফিসার। ওঠে এসে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে রক্তাক্ত করে দেয়। তারপর চোখের সামনে ঘর থেকে ধরে এনে তার বড় মেয়েকে পালাক্রমে রেইপ করে মেরে ফেলে। এরপর পিশাচরা তার হাফেজা দুই নাবালেগা কিশোরীকেও ধর্ষণ করতে শুরু করে। আমি বাধা দিতে গেলে গাদ্দার, কুত্তি বলে গালাগাল দিতে থাকে। এক পর্যায়ে আমার প্রতি বেশ ক্রুদ্ধভাব ও অসন্তোষ দেখিয়ে মুখে সন্দেহজনক ক্রূর হাসি ফুটিয়ে চলে যায়। এর কিছুক্ষণ পরই চার জন 'ব্ল্যাক কেট' (ভারতীয় বাহিনীর বিশেষ প্রশিক্ষিত সদস্য) পাঠিয়ে দেয় এখানে। ওরা এসে আমার বাড়ি-ঘর তছনছ করে, আমাকে শাসিয়ে এবং বেঁধে রেখে নূরজাহান ও পাশের বাড়ির সুইয়াকে ধরে নিয়ে যায়। এরপর তো আপনারাই ওদের উদ্ধার করে নিয়ে এলেন।

আবদুল ওয়াহেদ বললো, ওদের চার জনকেই ওসামা ভাই জাহান্নামে পাঠিয়ে দিয়েছে।

মির্জা সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, সামনা সামনি লড়াই করে ওদের চার জনের কাছ থেকে মেয়েদের উদ্ধার করতে অন্তত চল্লিশ জন সাধারণ সৈন্যের দরকার। অথচ তোমরা ওদের মেরে মেয়েদের উদ্ধার করে নিয়ে এসেছো, এ তো সীমাহীন বিস্ময়ের ব্যাপার। কিন্তু কোন গুলির শব্দ তো শুনতে পাইনি।

আবদুল ওয়াহেদ হেসে এর মাজেজা ব্যাখ্যা করলো।

মির্জা সাহেবের পীড়াপীড়িতে তাদের বাড়িতেও যেতে হলো। সেখানে এক সাথে মাগরিবের নামায পড়ে নাশতাও করলাম। কথা দিয়ে এসেছি আজ রাতের জন্য তাদের বাড়িতে বিশেষ মুজাহিদ প্রহরা রাখা হবে। ব্ল্যাক কেটের চার জন সদস্যের নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ায় ওরা নিশ্চয়ই হাত গুটিয়ে বসে থাকবে না। এ নিয়ে মির্জা সাহেব বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লে আমি মুজাহিদ প্রহরার ব্যবস্থা করার কথা বলে তাঁকে আশ্বস্ত করলাম।

পথে যেতে যেতে আবদুল ওয়াহেদ আমাকে বললো, তোমার জন্য সুখবর আছে ওসামা ভাই!

জিজ্ঞাসু চোখে তার দিকে তাকিয়ে বললাম, কি রকম সুখবর?

বললো, মির্জা সাহেব তোমার সাথে নূরজাহানের বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন আমার কাছে।

মনে মনে ভাবলাম, ঠাট্টা করছে আবদুল ওয়াহেদ। বললাম, মজা করার আর সময় পেলে না তুমি?

মোটেও ঠাট্টা নয় কমান্ডার! সত্যি বলছি। মির্জা সাহেব বলেছেন, আল্লাহ চাহে তো পরিস্থিতি যদি কিছু স্বাভাবিক হয়ে আসে, তাহলে তোমার আম্মার সাথে কথা বলে বিয়ের কাজটা তিনি সেরে ফেলবেন।

আবদুল ওয়াহেদের ভাবান্তরহীন শীতল কথাগুলো শুনে বিশ্বাস হলো সে ঠাট্টা করছে না। মনে মনে ভাবলাম মায়ের কাছে এমন একটা প্রস্তাব আসামাত্রই তিনি তা কবুল করবেন এবং আমাকে প্রয়োজনে জোর করে হলেও তা করিয়ে ছাড়বেন। বিশ্বাস করুন মাহমুদ সাহেব! জন্মের পর থেকে বারুদের গন্ধে গড়ে ওঠা এই জীবনে স্বাভাবিক সুস্থ জীবনের কথা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। কখনও মনে হয়েছে, হায়! আযাদী অঞ্চলের কোন সাধারণ কৃষক পরিবারের গরীব ঘরে যদি আমার জন্ম হতো, স্বাভাবিক সুস্থ পরিবেশে যদি বেড়ে ওঠতাম, ভাবনাহীন শঙ্কাহীন ছোট একটা শান্তির নীড় যদি রচনা করতে পারতাম, মা-বোন ও একটি অভিমান কাতর গাঁয়ের মেয়েকে বিয়ে করে পারিবারিক কোলাহলমুখর একটি জীবন যদি আমার হতো! হায়! রূপ-রস-গন্ধময় পৃথিবীতে একটি দিনও যদি এমন দেখে যেতে পারতাম! তাহলে জীবনটা বোধহয় সার্থক হতো। আবদুল ওয়াহেদের মুখে কথাটা শোনার পর থেকে আবার এমন সব স্বপ্নরা মনের পর্দায় বারবার ভেসে উঠছিল। নূরজাহানের কান্তিময় মুখচ্ছবিও যে দু'একবার মনের আয়নায় উঁকি দেয়নি তাও নয়। কিন্তু আমি তো বারুদের গন্ধে নিঃশ্বাস নিতে নিতে বড় হয়েছি। পিতাকে দেখেছি আজীবন দুশমনদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে। প্রতিবেশীর ঘরে ঘরে হায়েনাদের অত্যাচার নির্যাতনের বীভৎসতা দেখে বড় হওয়ায় বিদ্রোহী এ মনটা এখন অনেক সঞ্চিত তিক্ত অভিজ্ঞতায় বোঝাই হয়ে আছে। এখন গাঁয়ের সাধারণ কোন ঘটনা মনকে আচ্ছন্ন করতে পারে না। পৃথিবীর তামাম মুসলমানের ওপর শয়তানি ষড়যন্ত্র ও জুলুম-নির্যাতনের প্রতিকার নিয়ে ভাবতে অভ্যস্ত যে মন– সেখানে পারিবারিক শান্তিময় ও সুখকর লোভাতুর হাতছানি কতটুকুই বা প্রভাব ফেলতে পারে!

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে আবদুল ওয়াহেদ বললো, কি ব্যাপার, কিছু বলছো না যে!

বললাম, কি বলবো আমি! এমন দুঃসময়ে এসব চিন্তা কোন্ পাগলে করে বলো?

কিন্তু মির্জা সাহেব আমার মাধ্যমে তোমার পক্ষ থেকে একটি জবাব প্রত্যাশা করেন। সময় সুযোগ এলেই হবে, আজকেই তো বিয়ের আসরে বসতে বলছে না কেউ তোমাকে।

বললাম, তেমন সময় সুযোগ যদি আসে তো তখন ভাবা যাবে।

ফিরে এসে দেখি প্রত্যাশার চেয়েও অনেক বেশি অ্যামুনেশন এবং মুজাহিদ এসে পড়েছে শিবিরে। চারদিকে কেমন গমগমা ভাব। আমাদের সাফল্যজনক অভিযান কেন্দ্রীয় কমান্ডকে বেশ খুশি এবং আশ্বস্ত করেছে। তাই পরিকল্পনামতো অভিযান পরিচালনায় সাহায্য চাওয়ামাত্রই পাঠিয়ে দিলেন। আবদুল ওয়াহেদকে নিয়ে সমগ্র শিবির ঘুরে ঘুরে নতুন সাথীদের সাথে পরিচিত হয়ে নিলাম। সিদ্ধান্ত হলো, আজ বিশ্রাম নিয়ে কালই একযোগে তিনটি শত্রু ক্যাম্প ধ্বংস করে সীমান্ত চৌকি বসানো হবে। এশার নামায পড়ে মশওয়ারা শেষ করলাম। তারপর চব্বিশ জনের একটি মুজাহিদ গ্রুপ মির্জা বাড়িতে রাতের প্রহরার জন্য পাঠিয়ে দিলাম।

রাতের আরামের জন্য বিছানায় যাওয়ার আগে বসে বসে অনুচ্চ সুরে কুরআন তেলাওয়াত করছিলাম। এ সময় ওয়ারলেস সেটটার সংকেত বেজে ওঠলো। ও প্রান্ত থেকে প্রেরিত চব্বিশ সদস্যের মুজাহিদ গ্রুপের আমীর বলতে লাগলো, ভাই সর্বনাশ হয়েছে। আমরা আসার আগেই শত্রুরা বাড়িটা তছনছ করে ফেলেছে। মির্জা সাহেবকে ক্ষত-বিক্ষত করে বেঁধে রেখে তার স্ত্রীকে খুন করে নূরজাহানকে তুলে নিয়ে গেছে।

আমার মনে হচ্ছিল পৃথিবীটা যেন অন্ধকার হয়ে এলো, পায়ের মাটি যেন সরে যাচ্ছে। ক্রোধে রক্ত সঞ্চালন বেড়ে গিয়ে মুখখানা আমার রক্তবর্ণ ধারণ করেছে তা না দেখেও বেশ বুঝতে পারলাম। কোন রকমে উচ্চারণ করলাম, তোমরা অপেক্ষা কর, আমি এক্ষুণি আসছি। মির্জা সাহেবের শুশ্রূষা কর।

ও কে হযরত, ওভার বলে সেট অফ করলো।

আরও বিশ জন মুজাহিদ সাথে করে নিয়ে মির্জা বাড়িতে এসে দেখি ভৌতিক এক আবহ সৃষ্টি হয়েছে বাড়িতে। এখন আমি কি করবো বুঝে ওঠতে পারলাম না। আমি জানি, এ অবস্থায় কেন্দ্র এখনই হামলার অনুমতি দিবে না। সব কিছুরই একটা পরিকল্পনা থাকে। মুজাহিদরা অভিযানের জন্য মোটেও প্রস্তুত নয়। তদুপরি নতুন যারা এসেছে তারা অনেকেই অনেক দূর থেকে কষ্টকর ভ্রমণ করে এসে এখন ক্লান্ত। তাদের অন্তত একদিন বিশ্রামের প্রয়োজন। নূরজাহানকে কোন ক্যাম্পে নিয়ে গেছে তাও অস্পষ্ট। কারণ এখান থেকে তিনটি ক্যাম্পের দূরত্ব প্রায় সমান। এ অবস্থায় নির্দিষ্ট ক্যাম্পে হামলা না করলে নূরজাহানকে

উদ্ধার তো করা যাবেই না; বরং আমাদের এতদিনের প্ল্যান পরিকল্পনাও ভেস্তে যেতে পারে। তাছাড়া কেন্দ্রের নির্দেশ উপেক্ষা করে এই রাতে আক্রমণ চালানো হবে লড়াইয়ে শৃঙ্খলা ভঙ্গের শামিল। শেষে মনে এই বলে সান্ত্বনার প্রলেপ লেপন করলাম, নূরজাহানের যা ক্ষতি হবার তা তো ইতোমধ্যেই হয়ে গিয়ে থাকবে। কেন্দ্রকে উপেক্ষা করে কোন সিদ্ধান্ত নেয়া ঠিক হবে না। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম, নূরজাহানকে যদি খোদা করেন জীবিত উদ্ধার করতে পারি তো তার যত ক্ষতিই হোক না কেন, এ অভিযান শেষ হলেই তাকে আমি শাদি করে ঘরে তুলে নেবো। হতে পারে তার বিধ্বস্ত জীবনটাকে আমার অকৃপণ অমলিন ভালোবাসার পরশে কিছুটা হলেও সুস্থ করে তুলতে পারবো। এভাবেই বিক্ষিপ্ত চিন্তায় ঘুরপাক খেতে খেতে টেনশনে পায়চারী করতে করতে নির্ঘুম রাতটি পার করি।

সবাই ফজরের নামায জামাতে আদায় করলাম। মির্জা সাহেবও পীড়িত শরীর নিয়ে আমাদের সাথে জামাতে শরীক হলেন। নামায শেষে মির্জা সাহেবকে সাথে নিয়ে আবদুর রহমানের কবরের কাছটায় গিয়ে আমি চমকে উঠলাম। কবরের পাশেই ভারতীয় সৈন্যের দুটি লাশ বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে আছে। জিজ্ঞাসু চোখে তাকালাম মির্জা সাহেবের দিকে।

তিনি বললেন, ওরা আবদুর রহমানের কথা জেনে গেছে। বাড়িতে আমি মুজাহিদ বেটার কবর দিয়েছি, তাদের সাথে কমিউনিকেশন বন্ধ করে দিয়েছি, এসব তারা বুঝেই আমার ওপর এই জুলুম চালিয়েছে। আমাকে ওরা মেরেই ফেলতো। সম্ভবত জীবিত ধরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। তাতে তারা সফল হয়নি। বাড়িতে যখন দাজ্জালরা নারকীয় তাণ্ডব শুরু করে তখন এক সেনা অফিসারের নির্দেশে ক'জন সৈন্য আবদুর রহমানের কবরে ছুটে গিয়েছিল কবরের মাটি সরিয়ে লাশের গায়ে প্রস্রাব করে অসম্মান দেখাতে। এমন ঘটনা তারা আগেও বহু জায়গায় ঘটিয়েছে, যা আমি নিজের চোখেই দেখেছি। কিন্তু তারা যখন এমন পশুসম হীনতা প্রদর্শনে প্রবৃত্ত, তখন এক এক করে তোমাদের পেতে রাখা তিনটি মাইন বিস্ফোরিত হয়ে সেখানেই দু'জন কুকুরের মতো প্রাণ হারায়। ভীতু ভারতীয় সৈন্যের বাকি সদস্যরা মুজাহিদদের আক্রমণের শিকার হয়েছে মনে করে যে যেদিকে পারলো ছুটে গাড়িতে গিয়ে চাপলো। এ সময় নূরজাহানকে ধরে নিয়ে গেলেও বাঁধন খুলে আমাকে তুলে নিয়ে যাবার, গুলি করার এমনকি তাদের নিহত সৈনিকদ্বয়ের লাশও নিয়ে যাবার সাহস পেলো না। এত বিষাদের মাঝেও আমার মুখে একটু হাসির ঝিলিক যেন খেলে গেলো।

তখন চারদিক বেশ ফর্সা হয়ে এসেছে। সূর্যও উঠি উঠি করছে। ভোরের পাখিদের কোলাহল যেন একটু বেড়ে গেছে। ঠিক এ সময় দেখি বাড়ির প্রধান

ফটক দিয়ে দলিত-মথিত নূরজাহান কেমন টলতে টলতে অন্দরে প্রবেশ করছে। আল্লাহর শোকর আদায় করে মির্জা সাহেবকে নিয়ে বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করলাম। মির্জা সাহেব আহত শরীর নিয়ে অধীর আগ্রহে মেয়ের ঘরে গিয়ে দাঁড়ালেন। আমি দরজার মুখে দাঁড়িয়ে রইলাম। মির্জা সাহেবের মুখে একরাশ জিজ্ঞাসা। অধীর আগ্রহে তিনি বললেন, বেটি! তুই ফিরে এসেছিস! কোথায় কিভাবে এ কিয়ামত সদৃশ রাতটি কাটালে মা? বল, বল মা, আমি যে...! তিনি আর বলতে পারলেন না। ডুকরে কেঁদে ফেললেন।

জড়িত এবং বিরামহীন কণ্ঠে নূরজাহান বললো, আব্বু! আমি বড্ড ক্লান্ত, বিশ্রাম প্রয়োজন। দয়া করে আমাকে একটু নির্জনে থাকতে দাও!

মির্জা সাহেব মেয়ের গায়ে পরম আদরে হাত বুলালেন। তারপর সুর নামিয়ে ফুঁপিয়ে বললেন, কিন্তু মা, আমি যে তোর কাছে জানতে চাই কিভাবে তুই ছাড়া পেলি। রাতটা কোথায় কিভাবে কাটলো তোর!

আব্বু! আমি খুবই বিরক্ত হচ্ছি, আমাকে একটু একা থাকতে দাও। জাহান্নামের দহনে দগ্ধ শরীরটা আমার ভীষণ জ্বালা করছে। আমি ক্লান্ত, তুমি এখন যাও, প্লিজ! চাপা অভিমান আর সীমাহীন বিরক্তি ঝরে পড়ছে নূরজাহানের কণ্ঠে। পিতা আর সাহস পেলেন না, চোখ মুছতে মুছতে ফিরে এলেন বাইরে।

* * *

আসরের নামাযের পরই একে একে সকল মুজাহিদ মির্জা সাহেবের বাড়ির বিশাল আঙ্গিনায় এসে জড়ো হতে লাগলো। সকলের চোখে মুখে অভিযানের এক তেজোদ্দীপ্ত অভিব্যক্তি ফুটে ওঠেছে। আমি সকল মুজাহিদকে তিন ভাগে ভাগ করে প্রতি গ্রুপের একজন করে আমীর নিযুক্ত করে দিলাম। তারপর ভারতীয় ক্যাম্প সম্পর্কে বিশেষ অভিজ্ঞ মির্জা সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে আক্রমণ রচনার প্ল্যান প্রোগ্রাম করলাম। আমাদের মুজাহিদদের সকলেই প্ল্যান শিট দেখে মুগ্ধ হলেন। সত্যিই মির্জা সাহেবের অভিজ্ঞতা আমাদের জন্য বিরাট সাফল্যের নিয়ামক হয়ে দেখা দিয়েছে।

তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। সূর্য ডুবতে আর বেশি দেরি নেই। সিদ্ধান্ত হলো মাগরিবের নামায পড়ে অভিযান শুরু করবো। আমি মাঝের ক্যাম্পটিতে আক্রমণ পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছি। এখানে নাকি বেশ কিছু ব্ল্যাক ক্যাটের সদস্যকে ক'দিন আগেই আনানো হয়েছে এখানকার গ্রামগুলোতে 'সন্ত্রাসীদের' আস্ফালন মিটিয়ে দিতে। মির্জা সাহেব এসব তথ্য জানিয়ে কতক্ষণ আগে ভিতর

বাড়িতে চলে গেছেন। বৈঠকখানা ঘরের জানালা দিয়ে দেখলাম সাদা পোশাকের একজন আওরত বাড়ির ফটক দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে তার মুখটা চিনতে না পারলেও বেশ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ উদাসিনী বলে মনে হলো তাকে। তবে সন্দেহ করার মতো তেমন কিছুই চোখে পড়লো না দেখে আমিও নির্বিকার বসে রইলাম। জামাতে মাগরিবের নামায শেষে আজকের অভিযানের সাফল্যের জন্য মোনাজাত করে প্রত্যেককে নিজ নিজ দায়িত্ব বুঝিয়ে দিলাম। অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী দু'ক্যাম্পের আক্রমণের জন্য দুই গ্রুপ মুজাহিদ ইতোমধ্যে বেরিয়ে গেছে। আমরাও বেরিয়ে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। দেখি মির্জা সাহেব ঘরে প্রবেশ করছেন। তাঁকে দেখে দাঁড়িয়ে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিতে এগিয়ে গেলাম। আমি কিছু বলার আগেই একটা খাম আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, এটা নূরজাহান তোমাকে দিতে বলেছে।

বললাম, ও এখন কোথায়, কেমন আছে?

বললেন, দুপুরে গোসল করেছে। একটু সাজগোজও করেছে বলে মনে হলো। বললো, আব্বু, আমি একটু বাইরে থেকে আসছি। তবে তার আচরণ খুব স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে না।

লড়াইয়ের ময়দানে যাবার আগে চিঠি পড়বো কি পড়বো না তা ভাবতে ভাবতে এক সময় খুলেই ফেললাম খামটা। নূরজাহান লিখেছে–

প্রিয় কমান্ডার!

আসসালামু আলাইকুম!

মহান আল্লাহ পাকের অফুরন্ত রহমত বর্ষিত হোক তোমার এবং তোমার অনুগামীদের ওপর। তোমাদের সংগ্রাম, ত্যাগ আর কুরবানীর বিনিময়ে আযাদ হোক কাশ্মীর, প্রতিষ্ঠা পাক আল্লাহর রাজ এই জমিনে।

কমান্ডার! অতি অল্প সময়ের পরিচয় তোমার সাথে। ভাইজানের মুখে এবং তার প্রতিটি পত্রে তোমার প্রশংসা শুনে এসেছি ছোটকাল থেকেই। ভাইজান আমার দৃষ্টিতে ফেরেশতাসম নিষ্পাপ এবং আল্লাহভীরুতার এক উৎকৃষ্ট উপমা। তার মুখে তোমার প্রশংসা নিঃসন্দেহে তোমার বড়ত্বের সবচেয়ে বড় প্রমাণ। তোমাকে দেখে এ বিশ্বাস যেন বহুগুণ বেড়ে গেছে আমার। কিন্তু তকদির হয়তো আমার অনুকূলে নয়। তাই তোমাকে কাছে পাবার আগেই হারাতে হলো।

ভাইজানের শহীদ হওয়া আব্বাজানের মনে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ আমি পেয়েছিলাম তোমাকে পুত্রতুল্য আপন করে নেয়ার মাধ্যমে। বিশ্বাস করো, স্রেফ আবেগের বশে নয়– তোমার ব্যক্তিত্ব,

বীরত্ব এবং চরিত্র মাধুর্যে মুগ্ধ ঈর্ষিত এবং নিবেদিত হবে না এমন নারী পৃথিবীতে বিরল। আমার বেলায়ও তাই ঘটেছিল। তাই আব্বাজান আমার অনুমতি নিয়ে খুবই স্বল্প সময়ে তোমার কাছে আমার শাদীর প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। বরবাদী কিসমতের জন্যই তার আগেই আমাকে হারাতে হলো সারাজীবন লালিত নারীত্বের গর্বিত শ্রেষ্ঠ সম্পদ। অপবিত্র দেহ এবং অশুচি অন্তর নিয়ে তোমার সামনে দাঁড়াবার বিন্দুমাত্র আকাঙ্ক্ষা আমার মনে আর অবশিষ্ট নেই। আমার বিশ্বাস, প্রতিটি যুবতী পুরুষের চোখ দেখে তার মনের ভাষা পড়ে নিতে পারে। আর তোমার চোখে আমার ব্যাপারে পজেটিভ ছায়া দেখেছি বলেই অনেক দ্বিধা, ভয় ও সংকোচের সমাপ্তি ঘটিয়ে আমার এ পত্র লেখা।

কাশ্মীরের হাজার হাজার মা-বোন যে অজানা কারণে হানাদার পৌত্তলিক বাহিনীর পৈশাচিকতার শিকার হয়ে নারীত্বের শ্রেষ্ঠ সম্পদ ইজ্জত-সম্ভ্রম হারিয়েছে, সেসব দুর্ভাগাদের দলে আমারও নামটি রচিত হয়ে গেলো। শত দহনের মাঝেও এটুকু সান্ত্বনা আমার আছে যে, কাশ্মীরের আযাদী একদিন যেসব শহীদ ও সম্ভ্রমহারা নারী-পুরুষের খুনের ভিতের ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে– আমার জীবন ও সম্ভ্রম তাতে বিশাল অট্টালিকায় একটি ইটের মতো হলেও ভূমিকা রাখবে। বাড়িতে ফিরে জেনেছি, তোমরা আজই দুশমনের তিনটি ঘাঁটি কব্জা করে আযাদীর পতাকা ওড়াবে। কিন্তু যেসব পিশাচ আমার দেহকে পশুর মতো খুবলে খুবলে খেয়েছে, যারা আমার পৃথিবীতে বেঁচে থাকার সব স্বপ্ন ধূলিসাৎ করে দিয়েছে, তোমরা সব ক্যাম্প দখল করে নিলেও তারা অক্ষত অবস্থায় ফিরে যাবার মওকা পাবে। কেননা, পিশাচদের এ অফিসারগুলো সেনাঘাঁটিগুলোতে তাদের এতটুকু সিকিউরিটি গ্যারান্টি নিয়েই থাকে। তাই ওরা যেন জীবন নিয়ে ক্যাম্প থেকে ফিরে যেতে না পারে তার ব্যবস্থা আমাকে গ্রহণ করতেই হলো।

অপহৃত অবস্থায় ক্যাম্পে অফিসারদের দলনের হাত থেকে যখন নিজেকে রক্ষা করার সকল কৌশলই ব্যর্থ হলো, তখন নিজেকে আল্লাহর হাওলায় ছেড়ে দিয়ে পাথরের মতোই নির্জীব হয়ে পড়ে থাকলাম। তাদের মনোরঞ্জনের জন্য আজীবন জৌলুসের জিন্দেগীর লোভনীয় ফাঁদ পেতে দেয় মূর্খরা। আর এই সুযোগেই ছলনার আশ্রয় নিই আমি। আমার যা হারাবার তা তো হারিয়েছিই। এখন ছল করে যদি নিজের বুদ্ধি প্রয়োগে ওদের ধ্বংসের ব্যবস্থা করতে পারি মন্দ কি! তাই ওদের কথায় ন্যাকামি করে বললাম, তোমরা যদি কথা দাও আমার আব্বাকে মেরে ফেলবে না, তো আমি তোমাদের প্রস্তাবে রাজি এবং আমাকে সকাল থেকে মাত্র বার ঘণ্টার জন্য ছুটি দেবে, যাতে আমার আব্বাকেও কথাটা বলে এবং বুঝিয়ে আবার তোমাদের দলে ভেড়াতে পারি, তবে সব কূলই রক্ষা পাবে। আমার বিশ্বাস,

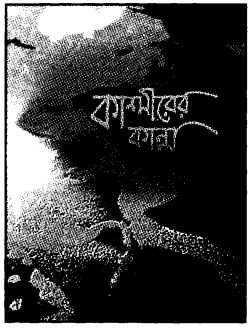
কতিপয় দুস্কৃতকারীর চাপে পড়ে আব্বার বর্তমান নির্জীবতা কাটিয়ে আবার তোমাদের গোলামীতে লাগাতে পারবো। কেন জানি না, ওরা আমার প্রস্তাবে রাজি হয়ে যায় এবং কথামতো সকালে ছেড়ে দেয়। ওরা হয়তো এখনো জানে না আমার সংকল্পের কথা। হয়তো তাদের রক্ষী হিসেবে পেতে এখনো পথ চেয়ে অপেক্ষা করছে। কিন্তু আমি যে তাদের বরবাদীর পয়গাম নিয়ে উপনীত হবো তা জানলে এতক্ষণ আমার কি হতো তা কেবল বিধাতাই জানেন।

প্রিয় কমান্ডার! আমার এ পত্র যখন তোমার হস্তগত হবে তখন আমি মধ্যবর্তী ওই সেনাক্যাম্পের খুবই নিকটে থাকবো। না বলে তোমাদের অ্যামুনেশন ডিপো থেকে তিনটি মাইন নিয়ে এসেছি। এগুলো থাকবে আমার দেহে। সেনাক্যাম্পে তোমাদের আক্রমণের আগেই ওইসব অফিসারদের জাহান্নামে পাঠিয়ে দিতে পারবো বলে আমার বিশ্বাস। তখন বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে তোমাদের আক্রমণ ফলপ্রসূ হবে আশা করি। আমার এই সংকল্পের কথা আব্বাজান জানেন না। তাঁকে বলবেন, কাশ্মীরের আযাদী আন্দোলনে লাখো শহীদের কাতারে যেন ভাইজানের মতো আমিও শামিল হতে পারি– আল্লাহর কাছে এ প্রার্থনা করতে। আমার পরে আব্বাজানের আর তো কিছুই অবশিষ্ট রইলো না। তাঁর জীবন ও সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয়িত হোক এ প্রার্থনা করি। শেষ সময়ে মনের মধ্যে কেবল একটা ভয় দানা বেঁধে ওঠছে, আমার এ অভিযান আত্মহত্যার শামিল হয়ে যায় কি না! আমি কিন্তু পুরোপুরি ওদের ধ্বংস করার নিয়তেই এই অভিযানে নেমেছি। মহান আল্লাহ যেন আমার এ মৃত্যুকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করেন, এর জন্য তোমার কাছে দোয়ার দরখাস্ত পেশ করছি। মাফ চাইছি তোমাকে এমন একটি পত্রের মাধ্যমে তকলিফ দেয়ার জন্য। আল্লাহ হাফেজ।

ক্ষণিক পরিচিতা–

নূরজাহান

পত্রটা পড়ে আমি মিনিট কয়েক নিশ্চল নিথর সম্মোহিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার মুখ থেকে কোন কথা সরছে না দেখে মির্জা সাহেব জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন আমার মুখের দিকে। সন্ধ্যার প্রায়ান্ধকারে আমার চোখ বেয়ে দু'ফোঁটা তপ্ত অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। তা আবার মির্জা সাহেবের নজরে পড়ে যায় তাই তাড়াতাড়ি পত্রটা তাঁর হাতে ফিরিয়ে দিয়ে মুজাহিদদের রওয়ানা হতে নির্দেশ দিতে বাইরে বেরিয়ে গেলাম।



ষোল

পুরো একটি রাতই শেষ হয়ে গেলো। তবুও শেখ ওসামার এই হৃদয়স্পর্শী কাহিনী শেষ হতে চায় না। ভোরের আযান শুনে দু'জনই চমকে তাকাই দু'জনের দিকে। আমার কেবলই মনে হতে লাগলো, এ গল্প টানা যত ঘণ্টাই শুনি না কেন মনে বা দেহে কোন ক্লান্তির ছাপ দেখা দেবে না। সারাটা রাত যে খাটের পাশে দেয়ালে বালিশ ঠেকিয়ে হেলান দেয়া অবস্থায়ই শেষ হয়ে গেলো তা যেন দু'জনের কারোরই বিশ্বাস হচ্ছে না। শেখ ওসামা সম্ভবত কিছুটা লজ্জিত হয়েছেন এই ভেবে যে, আমাকে তাঁর এই কষ্টকর কাহিনী রাত জাগিয়ে শুনিয়ে তকলিফ দিয়েছেন। তাঁর চোখে মুখে কিছুটা লজ্জা, শঙ্কা ও অপরাধবোধের ছায়া ফুটে ওঠলো। আমি তা লক্ষ্য করেও বললাম, তারপর...?

আমার আবারও তারপর শুনে তিনি একটু শুষ্ক হাসি মুখে ফুটিয়ে কিছু বলতে যাবেন, ঠিক তখনই তাঁর আম্মা সতর্কতার ছোট একটা কাশি দিয়ে পর্দা ঠেলে ভিতরে প্রবেশ করলেন। আমাদের এভাবে বসে থাকতে দেখে তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, বেটা! দেখে মনে হচ্ছে তোমরা এখনও একটুও ঘুমাওনি! এটা কেমন অন্যায় যে, একজন অসুস্থ মেহমানকে সারারাত জাগিয়ে তকলিফ দিয়ে এভাবে লড়াইয়ের গল্প বলে যাবে?

শেখ ওসামা মায়ের এমন অভিযোগে আরও লজ্জিত হয়ে মস্তক নিচু করে নিশ্চুপ রইলেন।

আমি বললাম, ওসামা ভাই কোন অন্যায় করেননি খালাম্মা; বরং আমিই তাঁকে অভিযানের কিছু কাহিনী শোনাতে বাধ্য করে অন্যায় করেছি। অনুগ্রহ করে আমার এ কসুর মার্জনা করে দিন।

শেখ ওসামা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। ভদ্র মহিলাও এবার কণ্ঠ নামিয়ে কোমল সুরে বললেন, ফজরের আযান হয়ে গেছে। গরম পানি রাখা আছে, ওযু করে নামায পড়ে নাও। আমি কিছু নাশতা রেখে যাচ্ছি, নামায পড়ে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ো।

* * *

বেশ বেলা করে ঘুম ভাঙ্গে আমাদের। মায়ের নির্দেশে নামায শেষে দু'জন মিলে কিছু নাশতা করে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আমি সজাগ হয়েই দু'হাতে চোখ কচলে দেখি, শেখ ওসামা উঠে হাত মুখ ধুয়ে কাপড় পরছেন। তাঁকে দেখে মনে হলো কোথাও বুঝি বেরুবেন। বললাম, কখন ওঠলেন, কোথাও যাচ্ছেন বুঝি?

শেখ ওসামা গায়ে পোশাক লাগাতে লাগাতে বললেন, এই তো মিনিট পাঁচেক হলো ওঠলাম। আমাদের ফলের বাগানগুলো একটু ঘুরে বেড়াবো। আজই তো ছুটি শেষ, সন্ধ্যায়ই সম্ভবত চলে যাবো মুজাহিদ শিবিরে।

আমি খাটে উঠে বসলাম। বললাম, আমি কি যেতে পারি সাথে?

জবাব দিতে একটু দেরি করলেন যেন। সম্ভবত কিছু ভাবছেন। আমিই বললাম, ঠিক আছে আপনার অসুবিধা হলে থাক।

এবার একটু তাড়াতাড়িই বলে ওঠলেন, না না, অসুবিধা হবে কেন? ঠিক আছে, আপনি হাত-মুখ ধুয়ে তৈরি হয়ে নিন। আমি একটু ভেতর থেকে আসছি।

আমি তৈরি হয়ে নিলাম। শেখ ওসামা ঘরে প্রবেশ করলেন সাথে তাঁর বোন সুমাইয়াকে নিয়ে। বললেন, আপনি তৈরি? চলুন বেরিয়ে পড়া যাক।

বললাম, হ্যাঁ হ্যাঁ, চলুন।

বেরিয়ে পড়লাম তিন জন। সুমাইয়ার আপাদমস্তক লম্বা কাপড়ে ঢাকা। মাস খানেক বয়সের বকনা বাছুরের মতো কাজল টানা ডাগর দুটি চোখ ছাড়া তার সমগ্র শরীর আবৃত মোটা কাপড়ে। শেখ ওসামা ও আমি পাশাপাশি এবং সুমাইয়া পেছনে পেছনে। কখনও বা ভাইয়ের আলাপের সাথে শরীক হতে তাঁর বাম পাশ দিয়ে একই সমান্তরালে হাঁটতে হাঁটতে আবার পেছনে সরে যায়।

চমৎকার সুন্দর গোছানো ফলের বাগান। মাঝ দিয়ে সরু রাস্তা। সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে থোকা থোকা কাঁচা সবুজ আঙ্গুর ঝুলে আছে। সবুজের ওপর লালের প্রলেপ লাগানো কচি নধর আপেল। ইচ্ছে করে ছুঁয়ে দেখি। এর আগে আমি এসব ফলের বাগান দু'একটা দেখেছি। তবে তা রাস্তায় দাঁড়িয়ে অথবা অনেক দূর থেকে। বাগানের ভিতরে প্রবেশ করে দেখলাম, এর প্রতিটি গাছেই কৃষকের যত্নের পরশ লেগে আছে। শেখ ওসামাকে বললাম, বাগানগুলো তো বর্গা দেয়া, তাই না?

বললেন, হ্যাঁ, চাষবাস করার লোক তো নেই আমাদের। আমি থাকি যুদ্ধের ময়দানে, কে এসব দেখাশোনা করবে বলুন!

বললাম, তা তো ঠিকই। আচ্ছা, এগুলোতে কেমন আয় হয় বার্ষিক?

বললেন, তা ভালোই। নিজেরা করতে পারলে তো পুরোটাই পেতাম। তবু আল্লাহর ফজলে মা ও এই বোনটির খাওয়া-পরার খরচ চলে গিয়েও কিছু বেঁচে যায়। তাছাড়া মওসুমে জমি থেকে কিছু গম পাই। আচ্ছা, আপনাদের দেশে তো এসব ফলের চাষ হয় না, তাই না?

বললাম, না! আমি এখানে এসেই প্রথম এসব ফলের গাছ দেখলাম।

আমার কথা শুনে ভাই-বোনের চোখে বিস্ময় এবং কৌতুক ফুটে ওঠলো। এবার সুমাইয়া জানতে চাইলো, তাহলে আপনাদের দেশে জমিতে কিসের আবাদ হয়?

বললাম, ধান, পাট, চা, চিনি, গম, কলাই, তরি-তরকারি, শাক-সবজি প্রচুর জন্মে। ফলের মধ্যে আম, কাঁঠাল, কলা, লিচু অন্যতম। কিছু কিছু পাহাড়ি এলাকায় সামান্য কমলার চাষ হলেও তা আপনাদের এলাকার মতো তেমন সুস্বাদু হয় না।

আমার কথায় ওসামার চেয়ে সুমাইয়ার চোখে মুখে বেশি বিস্ময় ও কৌতুক লক্ষ্য করলাম। কারণ শেখ ওসামা পাকিস্তানে পড়াশোনা এবং আফগানিস্তানে জেহাদ করার সময় দু'চার জন বাংলাদেশীর সাথে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছেন।

সুমাইয়া কেন জানি এবার জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা, আপনাদের ঢাকা শহর কি বঙ্গোপসাগরের কাছেই, শহর থেকে কি সাগর দেখা যায়?

একটুখানি হেসে বললাম, না তা কেন হবে! ঢাকা শহর দেশের প্রায় মাঝামাঝিতে অবস্থিত। বঙ্গোপসাগর হলো দেশের সবার দক্ষিণে। আমাদের গ্রামের বাড়ি ঢাকা শহর থেকে পঞ্চাশ মাইল উত্তরে মোমেনশাহী জেলায়।

সুমাইয়া একটু লজ্জিত হয়ে বললো, মানচিত্রে দেখি, ভারতের ভেতরে ছোট্ট একটি ভূ-খণ্ড, বঙ্গোপসাগরের ওপরেই লেখা ঢাকা।

এবার একটু শব্দ করেই হেসে ওঠলাম। বললাম, মানচিত্রে যত ছোটই দেখা যাক না কেন, বাংলাদেশের আয়তন পঞ্চান্ন হাজার বর্গমাইল। ভারতের মতো বিশাল দেশের ভিতরে একে তো ছোটই দেখাবে। দেখলাম, আমাদের কথোপকথনে শেখ ওসামা মিটমিট করে হাসছেন।

আমরা হাঁটতে হাঁটতে একটা ছোট নদীর পাড়ে এসে দাঁড়ালাম। শেখ ওসামা বললেন, এ পর্যন্তই আমাদের বাগানের সীমানা।

সামনে চেয়ে দেখি খাড়া পাড়ের ছোট একটা নদী, সাপের মতো এঁকেবেঁকে পাহাড়ে উঠে গেছে। তার বিপরীতে বিস্তীর্ণ অপেক্ষাকৃত সমতল ভূমি– যাতে গম, যব ও ভুট্টার চাষ হয়।

অনেকটা বড় খালের মতো দেখতে নদীটির পাড় এত খাড়া যে, অন্তত চল্লিশ ফিট নিচ দিয়ে পানির ধারা চোখে পড়ে। তবে ওপরে থেকেও বোঝা যায় নদী যত শীর্ণকায়ই হোক না কেন, তার প্রবাহে প্রচণ্ড স্রোত রয়েছে। শেখ ওসামাকে লক্ষ করে বললাম, নদীর পাড় এত খাড়া হয়! অথচ স্রোত থাকা সত্ত্বেও তেমন কোন ভাঙনের চিহ্ন নেই!

এ আর তেমন কি খাড়া পাড়। এখান থেকে পূর্ব দিকে পাহাড়ের দিকে মাইল খানেক গেলে দেখবেন খাড়া পাড় কাকে বলে। প্রায় একশ' ফুট নিচ দিয়ে এই বরফগলা পানি বয়ে যাচ্ছে। তবে পশ্চিম দিকে আস্তে আস্তে সমতল ভূমিতে গিয়ে পাড় ঢালু হয়ে গেছে। এর সৃষ্টিই হয়েছে গলিত বরফের পানি গড়িয়ে। পুরো শীত মওসুম নদীর পানি জমাট বেঁধে থাকে। তারপর শীত কমে যখন সূর্যের তেজ বাড়তে থাকে, তখন বরফ গলে আবার চালু হয় পানির ধারা। এই পানি এত শীতল যে, হাতে নিয়ে দেখবেন হাত অবশ হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে।

আমি আরও একটু এগিয়ে গেলাম নদীর খাড়া পাড়ের দিকে। দেখি, পাড়ের মাটি চুঁইয়ে অনেক জায়গা দিয়ে ছোট ছোট ঝরনার মতো টপটপ করে পানি ছিটকে বা গড়িয়ে পড়ছে নিচে। বয়ে যাওয়া বরফগলা পানি এবং ঝরনার পানির শব্দে কেমন একটা কুলুকুলু আওয়াজ গম্ভীর অথচ করুণ সুরের আবহ সৃষ্টি করেছে। ওপরে পানির কলতান, চারদিকে সবুজের সমারোহ। নৈঃসর্গিক এই ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে কে যেন গুরু-গম্ভীর অথচ করুণ সুরে ভৈরবী রাগে

ঝংকার তুলেছে। আমি আপ্লুত কণ্ঠে অনেকটা সুর করে গেয়ে ওঠলাম–

'আগার ফেরদাউস বর রোয়ে
জমিন আস্ত হাঁমি আস্তত
হামি আস্ত ও হাঁমি আস্ত।'

অর্থাৎ 'মর্ত্যে কোথাও যদি স্বর্গ বিরাজ করে তা এখানে, এখানে এবং এখানেই।'

ভাই-বোন অভিভূতের মতো আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলো! শেখ ওসামা বললেন, আপনি এটা কোথায় পেলেন?

বললাম, সৌন্দর্যপিয়াসী মোগল সম্রাট শাহজাহান অভিভূত চিত্তে কাশ্মীর সম্পর্কে এ কথা বলেছিলেন।

ভাই-বোন দু'জনের মুখেই নির্মল হাসির ঢেউ খেলে গেলো। শেখ ওসামা এবার বললেন, কবি আল্লামা ইকবাল বলেছিলেন, *'কাশ্মীর মধ্য এশিয়ার একটি অংশ। যখন এই এলাকায় জাগরণ আসবে তখন কাশ্মীরেরও উত্থান সূচিত হবে।'*

আমি বললাম, ইকবাল তো এ-ও বলেছেন–

'তরবারির ছায়াতলে এসেছি আমরা পালনা হয়ে;
নিশান মোদের চাঁদ সেতারা হিম্মত মোদের অহংকার।'

আমার মুখে উর্দু ভাষায় ইকবালের কবিতার গদ শুনে ভাই-বোন দু'জনই যেন আবার নতুন করে দেখছেন আমাকে।

শেখ ওসামা বললেন, মাহমুদ সাহেব! আপনি শুধু মুসলমানদের পক্ষের একজন বড় সাংবাদিকই নন, উঁচু মানের একজন ঐতিহ্যধারী বিশ্ব সাহিত্য চর্চাকারী এবং মুসলিম বিশ্ব সাহিত্যের সম্ভাবনাময় এক বিশাল প্রতিভা। মুসলিম বিশ্ব সাহিত্যাকাশে এক সময় আপনি উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে বেঁচে থাকবেন– তা যেন আমি নিজের চোখে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। আপনার সাথে পরিচিত হয়ে সত্যিই আমি গর্ববোধ করছি।

শেখ ওসামার এহেন প্রশংসা শুনে লজ্জার শেষ সীমায় উপনীত হয়ে বিনীতভাবে বললাম, আপনি আমাকে সত্যিই সীমাহীন লজ্জিত করলেন; বরং আমিই গর্বিত যে, আপনার মতো একজন মহান মুজাহিদ কমান্ডারের সাথে পরিচিত হতে পেরেছি।

এই ফাঁকে মুখে দুষ্টুমির হাসি ফুটিয়ে সুমাইয়া বলে ওঠলো– কিন্তু আমি গর্বিত বা লজ্জিতও হতে পারলাম না, বিশাল দুই তারকার সামনে সাধারণ মানুষ হয়ে।

আমি এবং শেখ ওসামা বেশ শব্দ করে হেসে ওঠলাম। আমাদের হাসির শব্দে পাহাড়ি এ উপত্যকা যেন কেঁপে কেঁপে ওঠলো। সুমাইয়াও আমাদের হাসিতে যোগ দিল, তবে অনেকটাই নিঃশব্দে। এবার সে আমাকে প্রশ্ন করলো, আমাদের কাশ্মীর সম্পর্কে বাংলাদেশের কোন কবি বা সাহিত্যিক কি কিছু লিখেননি?

বললাম, অবশ্যই লিখেছেন। আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের বেশ কিছু লেখা ছাড়াও ঝিলাম নদীকে নিয়ে একটা বিখ্যাত গানও তিনি লিখেছেন। তাছাড়া সমসাময়িক কালের কবি সাহিত্যিকেরা তো হামেশাই কাশ্মীর, ফিলিস্তিন, আফগানিস্তান, বসনিয়া, চেচনিয়াসহ নির্যাতিত নিপীড়িত বিশ্বের মুসলিম ভূ-খণ্ড নিয়ে কবিতা, প্রবন্ধ, নিবন্ধ লিখে চলেছেন। আপনারা চিন্তাও করতে পারবেন না, বাংলাদেশের মুসলমানের কতটা আপন আপনাদের মানুষজন ও ভূখণ্ড। মুজাহিদদের সাফল্যে তারা খুশি হয় যেমন, তেমনি ভারতীয় বাহিনীর নির্যাতনের কথা শুনে দুঃখে তাদের অন্তর কাঁদে। মসজিদে মসজিদে নামাযান্তে আপনাদের কামিয়াবীর জন্য দোয়াও করা হয়। বর্তমান সময়ের বাংলাভাষার অন্যতম একজন শ্রেষ্ঠ কবি আল মাহমুদ লিখেছেন–

'ভূ-স্বর্গে আগুন জ্বলছে আর আমাকে
কে যেন চোখ বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে বধ্যভূমির দিকে।
হাত বাড়িয়ে দেয়া ইতিহাস,
ইতিহাস এখন অপেক্ষমাণ কাশ্মীর।'

ভাইবোন এবার একই সঙ্গে বলে ওঠলো– তাই নাকি!

বললাম, হ্যাঁ, তাই!

সুমাইয়া এবার আবদার করে বললো– আচ্ছা, আপনাদের জাতীয় কবির গানটা কি একবার গেয়ে শোনাবেন আমাদের?

হেসে বললাম, আমার তো গানের গলা নেই। তাছাড়া বাংলা গান তো বুঝবেন না। অনুবাদ করে তো আর গাইতে পারবো না।

শেখ ওসামা বললেন, অনুবাদ করে গাইতে হবে না, বাংলাতেই গেয়ে যান। গানের নিজস্বতা বজায় থাক, তারপর না হয় অর্থ করে দেবেন।

সুমাইয়াও এতে সম্মতি দিল।

আমি মনে মনে গানটা গুছিয়ে নিয়ে যথাসম্ভব সুর করে গেয়ে ওঠলাম–

'ওরে আমার ঝিলাম নদীর পানি ...!'

গান শেষ হলেও সুরের রেশ যেন রয়ে গেলো অনেকক্ষণ। আমি নিজেও অবাক হলাম, গানটা এত সুন্দর গাইলাম কি করে! হয়তো এখানকার এই সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ এমনিতেই এই গানের উপযোগী হয়েছিল, কিংবা কাশ্মীর সম্পর্কে এতক্ষণের আবেগ-উচ্ছ্বাসময় কথোপকথন এমনই আবহ তৈরি করেছে যে, আমি খারাপ গেয়ে থাকলেও প্রাকৃতিকভাবেই তা সুন্দরভাবে পরিবেশিত হয়েছে। গান শেষ হলে ভাই বোন দু'জনই মারহাবা মারহাবা বলে ওঠলো। এরপর আমি এর অর্থ করে শোনালে তারা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লো।

ফেরার পথে তাদের কণ্ঠেও শোনলাম, উর্দু সাহিত্যের দু'একটি করে কবিতা ও গান। তার কতক আমি বুঝেছি, কতক বুঝিনি। তবু সুর ও ছন্দ আমার হৃদয় স্পর্শ করেছে। হতে পারে তা উপস্থাপকের গুণে।

এক পর্যায়ে আমি শেখ ওসামাকে বললাম– ভাই, আপনি কিন্তু কৃষ্ণপুর আক্রমণের শেষ অংশটা বলে শেষ করেননি। এই একটি মাত্র কাহিনী বলেছেন, তাও অসম্পূর্ণ থাক তা আমি মেনে নিতে পারছি না।

এতক্ষণের উৎফুল্ল শেখ ওসামার মুখটা কেমন যেন বিষাদময় হয়ে ওঠলো। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বললেন, সে কাহিনী অবশ্য শেষ হয়ে গিয়েছিলো। আমরা অভিযানে সফল হয়েছিলাম, আযাদ কাশ্মীরে যোগ হয়েছিল আরও কিছু নতুন অঞ্চল। তারপর তো গোটা কারগিলই আল্লাহর ইচ্ছায় আমরা কব্জা করতে পেরেছি। ওই আক্রমণে আমাদের তিন গ্রুপের মধ্যে সতের জন আহত এবং দুই জন শাহাদাত বরণ করেছিলো। গনিমত হিসেবে পেয়েছিলাম বেশ কিছু অস্ত্র ও যুদ্ধ সরঞ্জাম।

বললাম, আর নূরজাহানের কি হলো?

সম্ভবত বোনের সামনে বলেই কিনা তিনি কিছুটা লজ্জিত হয়ে তাকালেন আমার মুখের দিকে। আমি মাথা নিচু করে নিলাম। তিনি আবারও দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, আমরা ক্যাম্পে যাবার আগেই তার মাইন বিস্ফোরিত হয়েছিল। আমাদের বুঝতে বাকি রইলো না, ভারতীয় কুত্তাদের সাথে নূরজাহানও টুকরো টুকরো লাশে পরিণত হয়েছে। শত্রু সেনাদের বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে আমাদের সাঁড়াশি আক্রমণে অল্প সময়েই ক্যাম্পটি নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। সকালে প্রচুর ছিন্ন ভিন্ন লাশের ভিতর থেকে পোশাক দেখে দেখে নূরজাহানের লাশের দেহের পাঁচটি টুকরো একসাথে করতে পেরেছিলাম। তারপর কৃষ্ণপুরেই তাদের নিজস্ব পারিবারিক গোরস্তানে দাফন করা হয়।

বললাম, যে মাদরাসাটা আমরা দেখে এলাম সেখানেই তো!

বললেন, হ্যাঁ, কবর জিয়ারতে তো আপনি ছিলেনই। পরে মির্জা সাহেব তাঁর বাড়ি ও বাড়ি সংলগ্ন এই বিশাল জমিতে মসজিদ মাদরাসা গড়ে তুললেন। সকল স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি দান করে দিলেন মসজিদ মাদরাসায়। এখান থেকে এখন দীনী ইলম হাসিল করে গড়ে ওঠছে আযাদ কাশ্মীরের মুজাহিদদের নতুন নতুন প্রজন্ম। মির্জা সাহেবের সাথে তো আপনার পরিচয় হয়েছেই। তিনি এখন এসব মসজিদ মাদরাসার মোতাওয়াল্লী। নিজের সামান্য খাওয়া-পরা ছাড়া তাঁর বিশাল সম্পত্তির যাবতীয় আয় মসজিদ মাদরাসায় খরচ করে কিছু বেঁচে যায়। আর তা ব্যয় করেন মুজাহিদদের জন্যে।

ওসামাদের বাড়িতে যখন আমরা পৌঁছলাম তখন ভরদুপুর। ছেলে আজ ছুটি শেষে চলে যাবে, এতে মায়ের মনটা যেন কেমন শঙ্কিত ও উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে। তিনি আমাদের গোসলের তাগিদ দিয়ে রান্নাঘরে প্রবেশ করলেন। আজ সম্ভবত খাওয়া-দাওয়ারও একটু বিশেষ আয়োজন করা হয়েছে। রান্নাঘর থেকে তার খোশবু সারা বাড়িতে ছড়িয়ে পড়েছে। মায়ের মন, বারণ মানতে চায় না। এমন মা এ সময়ে ক'জন পাওয়া যাবে যিনি ছেলেকে খুশি মনে জেহাদের ময়দানে মৃত্যুর মুখোমুখি পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে বসে থাকবেন। কেন জানি আমার মায়ের কথা আবার আজ দারুণভাবে মনে পড়ছে। না জানি তিনি এখন আমার চিন্তায় কতটা পেরেশান হয়ে আছেন। কোন খবর নিতে পারছেন না, আমার পক্ষ থেকেও কোন খবর পাচ্ছেন না। এ অবস্থায় তিনি যে কতটা উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেছেন তা সন্তান হিসেবে আমিই কেবল উপলব্ধি করতে পারছি।

দুপুরে খাওয়া শেষে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আসরের সময় আমার ঘুম ভাঙ্গল। নামায পড়ে বসে বসে একটা পুরান পত্রিকা পড়ছিলাম। এ সময় চা নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন শেখ ওসামার মা। আমি সম্মান দেখাতে দাঁড়িয়ে চায়ের কাপটা হাতে তুলে নিলাম। তিনি করুণ চোখে তাকালেন আমার দিকে। তারপর একটা খাম এগিয়ে দিয়ে বললেন, ওসামা চলে গেছে। মুজাহিদ কমান্ড থেকে কি যেন জরুরি এক খবর পেয়ে একটু আগেই চলে গেছে সে। যাবার সময় তুমি ঘুমে থাকায় ডেকে তোলেনি। ছোট এই পত্রটি লিখে গেছে তোমার উদ্দেশে। নাও ধর।

হাত বাড়িয়ে আমি খামটা নিলাম। চা খেতে খেতেই খামটা খুলে সংক্ষিপ্ত কয়েকটি কথা পড়ে ফেললাম। তিনি লিখেছেন–

ভাই মাহমুদ!

জরুরি মেসেজ পেয়ে চলে গেলাম। আপনি ঘুমে ছিলেন, তাই বলে যেতে পারিনি। মার্কিন সফরে গিয়ে নওয়াজ শরীফের অনাকাঙ্ক্ষিত সিদ্ধান্তে আমাদের ওপর কিছুটা বিপর্যয় নেমে এসেছে। সামনে কি দুর্দিন অপেক্ষা করছে জানি না। আপনি নিজেকে সুস্থ দাবি করলেও কতটা সুস্থ হয়েছেন জানা নেই। ডাক্তারের হিসাব মতে অন্তত আরো দশ বার দিন পূর্ণ বিশ্রামের দরকার। মাথার আঘাত, তাই ডাক্তারের পরামর্শ মেনে চলা একান্ত জরুরি। এর মধ্যে আমি সময় সুযোগ করে আমাদের লোক দিয়ে বিকল্প পথে আপনাকে পাকিস্তান সীমান্তে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করবো ইনশাআল্লাহ! আপনি যেন জেদের বশে একাই কোন সিদ্ধান্ত নিয়ে বসবেন না। খোদা না করুন, আপনি কোন দুর্ঘটনার শিকার হয়ে পড়লে নিজেদের ক্ষমা করতে পারবো না। ক'টা দিন আপনার সান্নিধ্যে বেশ কেটেছে। যদি আর কোনদিন দেখা না হয় তো আপনার এ দোস্তকে ক্ষমা করে দেবেন। আমাদের শাহাদাতের মৃত্যু অথবা সম্মানের জিন্দেগীর জন্য দোয়া করবেন।

বিনীত

একই মঞ্জিলরাহী

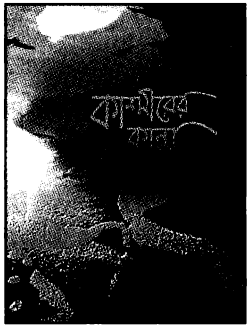
শেখ ওসামা

চিঠিটা পড়ে ক'মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইলাম। অজানা কোন কারণে আমার চোখ পানিতে ভরে ওঠলো। ঝাঁপসা দৃষ্টি মেলে তাকালাম মাতৃসম ওসামার আম্মার মুখের দিকে। বললাম, আপনার চমৎকার ছেলে এবং আপনাদের এই পারিবারিক জীবন যাপন ইসলামের প্রথম যুগের মানুষদের কথা মনে করিয়ে দেয়।

ভদ্র মহিলা তৎক্ষণাৎ কিছু বললেন না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন কতক্ষণ। তাঁরও চোখ অশ্রুপূর্ণ। বললেন, বাবা, তুমিও একদিন চলে যাবে। বাড়িটা ক'দিন কেমন আনন্দমুখর হয়ে উঠেছিল। তুমি চলে গেলে আবার কবরের নীরবতা নেমে আসবে। তোমার কথা খুব মনে পড়বে। আমাদের কথা কি ভুলে যাবে তুমি?

বললাম, তা কি কখনো হতে পারে মা! আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ এবং স্মরণীয় ক'টা দিন কাটলো এখানে।

ভদ্র মহিলা আর দাঁড়ালেন না এখানে। সম্ভবত কান্না লুকানোর জন্য দ্রুত বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। আমি তাঁর গমন পথের দিকে চেয়ে রইলাম দীর্ঘক্ষণ।



সতের

তিন দিন গত হয়েছে শেখ ওসামা বাড়ি থেকে চলে গেছেন। এর মধ্যে কোন খবর পাওয়া যায়নি। গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে, ভারতীয় বাহিনী মরিয়া হয়ে ওঠেছে কারগিল উদ্ধারে। ইতোমধ্যে নাকি কয়েক দফা হামলাও হয়ে গেছে। বর্তমানে তাদের এসব হামলা নাকি খুব একটা পরিকল্পিত নয়। তারা এখন এ অঞ্চলের প্রতিটি মুসলিম পরিবারকেই মুজাহিদদের ঘাঁটি মনে করছে। তাই তাদের আক্রমণও পরিচালিত হচ্ছে নিরস্ত্র-নিরীহ গ্রামবাসীর ওপর। বিক্ষিপ্তভাবে দল বেঁধে গ্রামে ঢুকে ব্রাশফায়ার করে চলে যাচ্ছে। বাড়ি-ঘরে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে। মারা যাচ্ছে নারী, শিশু ও বৃদ্ধরাও। ধ্বংস হচ্ছে বসতির পর বসতি।

এমন সব খবর শুনে আমিও বেশ আতঙ্কিত হয়ে পড়লাম। এখান থেকে কবে কিভাবে যে আমি ফিরে যেতে পারবো তা ভেবে বেশ অস্থির হয়ে ওঠলাম। মনে মনে কিছুটা বিরক্তবোধ করছি ডাক্তার এবং শেখ ওসামার সিদ্ধান্তেও। ডাক্তারের হিসাব মতে অন্তত আরও এক সপ্তাহ রেস্টে থাকতে হবে। কিন্তু আমার শরীর সম্পর্কে আমার চেয়ে বেশি আর কে জানে। এত উদ্বিগ্নতার ভিতর কি শরীর ও মনের পূর্ণ বিশ্রাম হতে পারে? আমার মন জোর দিয়ে বলে ওঠলো আমি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। সত্যি সত্যিই আমার মাথায় এখন কোন পেইন হয় না। সেদিন একটু বেশি ঘোরাফেরা এবং নির্ঘুম রাত কাটানোর ফলে মাথাটা একটু যেন ভারী ভারী ঠেকছিল ঠিকই, কিন্তু এখন তেমনটা মনে হচ্ছে না। আইবিএ'র ইসলামাবাদ ব্যুরো অফিস আমার জন্য কতটা যে দুশ্চিন্তা করছে কে জানে! নিশ্চয়ই প্রায় প্রতিদিন ঢাকা থেকে ব্যুরো অফিসে যোগাযোগ করছেন আম্মা।

তারা যে আম্মাকে কি কথা শুনিয়েছেন আল্লাহই জানেন। এসব ভেবে ভেবে মনটা বেশ উতলা হয়ে গেলো। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম, এভাবে নিশ্চেষ্ট বসে না থেকে চলে যাবার যা হোক একটা ব্যবস্থা আমাকেই বের করতে হবে। কিন্তু কিভাবে তা আমি নিজেই জানি না। শুধু এটুকুই জানি, আর নয়, আমাকে ফিরতে হবে।

কাশ্মীর সফরে যে মিশনে আমি এসেছিলাম, তা পুরোপুরিই সফল বলা যায়। আসলে আমার কাজ তো কেবল সামরিক কোন ঘটনাকেন্দ্রিক নয়; বরং সংগ্রামমুখর এই জমিনের সামগ্রিক একটা পর্যবেক্ষণমূলক স্টাডি করাই মুখ্য উদ্দেশ্য। বলা যায় এ ক্ষেত্রে আমি একশ' ভাগ সফল হয়েছি। আমার স্থিরচিত্র ক্যামেরা, ভিডিও ক্যামেরা এবং টেপ রেকর্ডার এখন সঞ্চিত মসলায় টইটম্বুর। সেই সাথে ব্যক্তিগত নোট বুকখানাও কলমের খোঁচায় বেশ স্ফীত হয়ে ওঠেছে। এই সম্পদটুকু নিয়ে ফিরতে পারলে প্রচুর বস্তুনিষ্ঠ আর্টিকেল তৈরি করা যাবে, যা দিয়ে অনেকদিন পর্যন্ত কয়েকটি মিডিয়াকে চাঙ্গা রাখা যাবে।

বিকেলে আসরের নামায পড়ে আমি আমার চামড়ার ব্যাগখানায় নিজের কাপড়চোপড় এবং পেশাগত সরঞ্জামাদি আবার পরিপাটি করে গুছিয়ে রাখছিলাম। এমন সময় দরজায় শব্দ করে ভিতরে ঢুকলেন শেখ ওসামার আম্মা। বড় একটা মগে গাঢ় লিকারের চা এগিয়ে দিয়ে বললেন, বেটা এসব কি করছো? তুমি কি সফরের জন্য তৈরি হচ্ছো?

একটুখানি হেসে বললাম, জি, একটু গুছিয়ে রাখছি। ভাই ওসামা কখন আমাকে পাঠানোর জন্য লোক পাঠিয়ে দেন বলা তো যায় না। তখন হয়তো দেখা যাবে গুরুত্বপূর্ণ কিছু ভুলে রেখে গেছি। তাই আগে থাকতেই একটু গুছিয়ে রাখছি আর কি।

একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে উদাস নয়নে চেয়ে থেকে বললেন, হ্যাঁ, তুমি তো চলেই যাবে। তোমার কথা খুব মনে পড়বে বেটা। ক'টা দিন থেকে আমাদের কেমন আপন করে নিয়েছিলে।

আপনাদের ছেড়ে যেতে আমারও খুব কষ্ট হবে মা! কিন্তু পৃথিবীর নিয়মই তো এই, আসলে আমরা কেউ থাকতে আসি না। সবাই চলে যাই নিজ নিজ গন্তব্যে।

ঠিকই বলেছো বাবা, সবাই চলে যায়! আমাকে দেখ, স্বামীকে লড়াইয়ের ময়দানে বিদায় দিয়েছি। শাহাদাতের পিয়ালায় চুমুক দিয়ে লাশ হয়ে ফিরে এলেন। এখন একমাত্র ছেলে, তাকেও বিদায় দিয়ে আমি কেমন করে বাড়িতে

পড়ে থাকি। মেয়েটার যদি বিয়ে হয়ে যায় তো আমি একেবারেই নিঃসঙ্গ হয়ে পড়বো। একটুখানি থেমে আবার বললেন, দেশে ফিরে তোমার মাকে জিজ্ঞেস করো তোমার বিরহে একেকটা দিন কেমন কেটেছে তাঁর।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, ওসামা ভাইকে বিয়ে করিয়ে ঘরে বউ নিয়ে আসুন না, আপনার নিঃসঙ্গতা দেখবেন অনেকটা কেটে যাবে।

সে চেষ্টা কি করিনি ভেবেছো! তার একই কথা, এখন এসব ভাবার মতো মওকা পাচ্ছি না। সময়-সুযোগ এলে ভাবা যাবে। অবশ্য তার দুঃখটা আমি বুঝি, কিন্তু কি করবো বাপ! তাকে যে কিছুতেই রাজি করাতে পারছি না।

এবার বাড়ি এলে জোর করে বিয়ে দিয়ে দেবেন। আগে থেকেই আপনি পাত্রী ঠিক করে রাখবেন, যাতে কোন অজুহাত খাড়া করতে না পারে।

ভদ্র মহিলা কিছুটা হাসলেন। তাঁর শুভ্র করুণ শুষ্ক হাসিটায় যেন রাজ্যের কষ্ট ও আনন্দ মিশে একাকার হয়ে ফুটে ওঠলো।

মাগরিবের নামায পড়ে বিছানাতে হেলান দিয়ে বসে মুজাহিদ সংগঠনের একটা সাময়িকী পড়ছিলাম। লড়াইয়ের রোমাঞ্চকর কাহিনী সম্বলিত সচিত্র প্রতিটি আর্টিকেল হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়ার মতো। পঠনসামগ্রীর অভাবে এটাই কয়েকবার পড়া হয়ে গেছে। পাহাড়ি টিলা উপত্যকার মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য সম্বলিত লড়াইয়ের স্থান ও বিভিন্ন অস্ত্রের ছবি থাকলেও কোন মুজাহিদ বা মানুষের ছবি এতে স্থান পায়নি। কয়েক পাতা পর পর রয়েছে আল্লাহর পথে লড়াই করার জ্বালাময়ী জেহাদী তারানা। ম্যাগাজিনের পাতা থেকে হঠাৎ আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় পাশের আলমিরার উপর রাখা সাইলেন্সারযুক্ত একটি রুশ অত্যাধুনিক রিভলভারের ওপর। এটি একদিন ওসামা ভাই আমাকে দেখিয়েছিলেন এবং এই অস্ত্রটি সঙ্গে নিয়ে দু'তিনটি রোমাঞ্চকর অভিযানের কথাও বলেছিলেন। এখন এটি মা ও বোনের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে লোডিং অবস্থায় বাড়িতে রেখে গেছেন। কি মনে করে বিছানা থেকে উঠে অস্ত্রটি হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলাম। তারপর ব্যাগ থেকে ক্যামেরা বের করে অস্ত্রটি বিছানায় রেখে দুটি ছবি তুললাম। তারপর ক্যামেরাটি ব্যাগে রেখে দিয়ে আবারও অস্ত্রটি হাতিয়ে দেখতে লাগলাম। লোড করা রিভলভার, ট্রিগারে চাপ দিলে শিস দেয়ার মতো শব্দ করে বেরিয়ে যাবে গুলি। ঠিক এ সময় বাড়ির সদর দরজায় প্রচণ্ড লাথি এবং হল্লা চিল্লার আওয়াজ শুনলাম। প্রথমটায় আমি কিছুটা হকচকিয়ে গেলাম। তাহলে কি বিপদের আওয়াজই শুনতে পাচ্ছি?

মার্চ মাস শেষ হয়ে গেছে। এখনো কাশ্মীরের এ অঞ্চলে সন্ধ্যার পর ভালোই শীত শীত লাগে। তাই বাইরের ঠাণ্ডা বাতাস থেকে বাঁচতে সন্ধ্যার আগেই

জানালাগুলো বন্ধ করে রাখা হয়। ভাবছিলাম জানালা খুলে দেখবো কিনা। কিন্তু ভরসা পেলাম না। যদি সত্যিই কোন শত্রুর মুখে পড়ে যাই। বিছানার পাশে রাখা টেবিলে দাঁড়িয়ে ভাঙ্গা ভেন্টিলেটারে চোখ রাখতে গিয়ে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেলাম। দেখি দু'জন ভারতীয় সৈন্য অস্ত্র উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে। অন্যজন সজোরে দরজায় লাথি মারছে আর বলছে, দরজা খোল, নতুবা দরজা উড়িয়ে দিয়ে আমরা ভিতরে প্রবেশ করবো। সাইলেন্সারযুক্ত রিভলবারটি ধরা আমার হাতটা যেন কেঁপে ওঠলো। উত্তেজনায় পেশিগুলো ফুলে ওঠেছে। এ সময় দরজা খুলে শেখ ওসামার আম্মা সামনে দাঁড়ালেন, পিছনে ভয়ার্ত সুমাইয়া। সৈন্যদের একজন বলে ওঠলো, তোদের ঘরে সন্ত্রাসীরা আছে, আমরা ধরতে এসেছি। এ সময় দরজা ধাক্কানো লোকটি সৈনিকটির কানে কানে কী যেন বললো।

সৈন্যটি ক্রূর হাসি হেসে বললো, তাই নাকি! শেখ ওসামার মা তাহলে! মহিলার চুলের মুঠি ধরে চিৎকার করে বলে ওঠলো, তোর ছেলে কোথায়?

মহিলা কিছু বলতে যাচ্ছিলেন ঠিক তখনই অন্য সৈনিকটি তাঁকে লাথি দিয়ে ফেলে দিলেন ঘরের সামনে। মুহূর্তের মধ্যে ঘটে গেল কাণ্ডটি। আমি কেবল রিভলবারটি ভেন্টিলেটরের ফাঁক গলে সৈন্যদের ওপর তাক করেছি, ঠিক তখনই ওদের অস্ত্র গর্জে ওঠলো। মহিলাটি চিৎকার করারও সময় পেলেন না, গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া শিথিল দেহ থেকে টাটকা খুনে মেজে পিচ্ছিল হয়ে গেলো। আমি তখনও নিশানা ঠিক করতে পারছিলাম না। একে তো আনাড়ি হাত, তদুপরি কাছেই দাঁড়ানো সুমাইয়া। সুমাইয়া তখন মা মা বলে চিৎকার দিয়ে মায়ের লাশের ওপর আছাড় খেয়ে পড়লো। এ সময় আরও একজন সৈন্যকে এগিয়ে আসতে দেখলাম। সে সুমাইয়াকে জোর করে তুলে নিজের বাহু লগ্ন করে বললো, ভয় নেই সুন্দরী, তোমাকে হত্যা করা হবে না। এসো আমার সঙ্গে।

এ সুযোগটারই সদ্ব্যবহার করলাম আমি। মনে মনে আল্লাহর নাম নিয়ে ট্রিগার চাপ দিতেই অগ্রবর্তী দু'জন সৈন্য গোড়া কাটা গাছের মতো লুটিয়ে পড়লো দরজার সামনে। শব্দহীন গুলি খেয়ে দু'জন সৈন্যকে এভাবে লুটিয়ে পড়তে দেখে সুমাইয়াকে ছেড়ে দিয়ে অন্য সৈন্যটি অস্ত্র তাক করলো, কিন্তু তার নিশানা উদ্দেশ্যহীন। এখান থেকে ওদের বাগে আনা যাবে না দেখে আমিও নেমে গেলাম দরজার দিকে। এই সুযোগে সুমাইয়া দৌড়ে দরজার ভেতরে এসে আমার সাথে ধাক্কা খেলো। টান দিয়ে তাকে পেছনে সরিয়ে এনে অস্ত্র তাক করলাম সামনে। ততক্ষণে তারা ভেন্টিলেটার বরাবর এক পশলা গোলাবর্ষণ করে আবার দরজার দিকে দৃষ্টি ফিরিয়েছে। তাদেরও হাত ট্রিগারে, কিন্তু চাপ

দেয়ার মওকা পেল না। আমার রিভলবার থেকে সেই ভয়ঙ্কর চাপা শিস তোলা গুলি ওদের আরও একজনকে জমিনে লুটিয়ে পড়তে বাধ্য করে। অন্যজন কাত হয়ে পড়ে যাওয়ায় গুলি লাগে তার পায়ে। মুহূর্তে আহত পা নিয়ে সে দৌড়ে ছুটতে থাকে। দেখি ওর সামনে আরও একজন দৌড়ে পালাচ্ছে।

আমি দরজার বাইরে বেরুতে চাইতেই পেছন থেকে আমার জামা টেনে ধরে সুমাইয়া আর্ত সুরে বলতে লাগলো, দোহাই আল্লাহর! ওদের সৈন্যসংখ্যা না জেনে বেরুনো আপনার ঠিক হবে না। আমি অনেক জোর করে তার হাত ছাড়িয়ে যখন উঠানে নেমে এলাম, তখন আহত সৈন্যটিও রাস্তায় রাখা গাড়িতে উঠে পড়েছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে চারদিকে যখন সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে সামনে এগিয়ে যাচ্ছিলাম তখন গাড়িটিও দ্রুত গতিতে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। মনে মনে ভাবলাম, ওরা হয়তো পাঁচ ছয় জনই অপারেশনে এসেছিল।

কারও পায়ের শব্দে ভূত দেখার মতো চমকে যখন পেছনে তাকালাম দেখি নিহত সৈনিকের একটি অস্ত্র হাতে সুমাইয়া দাঁড়িয়ে। উদ্বিগ্ন হয়ে বললো, ওরা কি চলে গেছে?

বললাম, ওই তো, ওই গাড়িতে করে পালিয়েছে। লক্ষ্য করলাম, আমার শরীর এখনও থরথর করে কাঁপছে। নিঃশব্দে দু'জনই লাশের কাছে এসে দাঁড়ালাম। সুমাইয়া মায়ের মাথাটি কোলে নিয়ে নিথর হয়ে বসে রইলো। নিহত মায়ের মুখাখানায় হাত বুলিয়ে বুলিয়ে করুণ সুরে বলতে লাগলো, মা মাগো, তুমি আমাকে এভাবে একা ফেলে চলে গেলে! আমি এখন কি করবো, কোথায় যাবো, বলে দাও মা! এরপর নিজের মস্তক মৃত মায়ের মুখের উপর রেখে কেঁপে কেঁপে কাঁদতে লাগলো। আমি তাকে কি ভাষায় কিভাবে সান্ত্বনা দেবো ভেবে পাচ্ছিলাম না। আমার একটা হাত তার মাথার ওপর অজান্তে চলে গেলেও খেয়াল হওয়ামাত্রই ফিরিয়ে আনলাম। ঠিক এ সময় সামনে তাকিয়ে দেখি শ্মশ্রুমণ্ডিত দু'জন তরুণ অস্ত্র উঁচিয়ে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে। প্রথমে আমি ভীষণ আতঙ্কিত হয়ে রিভলবার তুলতে গিয়ে লক্ষ্য করলাম এরা আমাদের শত্রু নয়, মুজাহিদ বাহিনীর কেউ হবে হয়তো। ভয়জড়িত কণ্ঠে বললাম, আপনারা কারা?

আমার কথায় সুমাইয়াও চোখ তুলে তাকালো। আগন্তুক একজন বললেন, আমরা কমান্ডার শেখ ওসামার কাছ থেকে এসেছি। আগন্তুকের মুখে শেখ ওসামার কথা শুনেই সুমাইয়া এদিকে তাকাল এবং দাঁড়িয়ে বললো, ভাইজান কি এসেছেন? তার কণ্ঠে কান্নার সুর ঝরে পড়লো। আগন্তুক একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, তিনি আমাদের পাঠিয়েছেন, কিন্তু আসতে আমাদের

সত্যিই বিলম্ব হয়ে গেছে। হায়! যদি একটুখানি আগে আসতে পারতাম, তাহলে হয়তো এই সর্বনাশের মোকাবেলা করতে পারতাম! বোন সুমাইয়া! তোমাকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা জানা নেই। তবু বলি, ধৈর্য ধর! পৃথিবীর ঘটমান প্রতিটি কাজের পেছনেই রয়েছে মহান আল্লাহ পাকের কুদরতের খেয়াল। অবশ্যই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন। এরপর তিনি আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি নিশ্চয়ই মাহমুদ হাসান!

বললাম, জি!

আমাদের সাথে একটু এদিকে আসুন। বলে তারা একটু আড়ালে চলে গেলেন। পেছনে পেছনে আমিও গেলাম। বললেন, এখানে যা ঘটেছে তা আমরা বুঝতে পেরেছি। ওদের গাড়ি যখন স্টার্ট দেয় তখন আমরা খুব নিকটে এসে পড়লেও কিছু না বুঝে আক্রমণ করতে পারিনি। এ বাড়িতে আক্রমণ হতে পারে তা অনুমান করলেও এত দ্রুত যে ওরা এসে পড়বে বুঝতে পারিনি। বলুন তো, কিভাবে এর মোকাবেলা করলেন?

আমি সংক্ষেপে অল্পক্ষণ আগে ঘটে যাওয়া স্বপ্নের মতো কাহিনীটা বর্ণনা করলাম।

আপনি নিজে তো ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুজাহিদ নন, কিন্তু মজলুমের পক্ষে অস্ত্র ধরতে গিয়ে আল্লাহর রহমতের ধারা কিভাবে বর্ষিত হয়েছে লক্ষ্য করেছেন?

আমি কিছুই বুঝতে না পেরে হা করে চেয়ে রইলাম। তিনি বললেন, ট্রেনিং ছাড়াই অতর্কিতে হামলার শিকার হয়েও দেখেননি ওদের তিনটি লাশের বিনিময়ে কেবল একজন নিরস্ত্র মহিলাই শহীদ হলেন!

আর বলতে হলো না। সত্যিই তো বিষয়টি আমি এখনও এভাবে চিন্তা করার মওকাই পাইনি। মনে মনে আল্লাহ পাকের সহস্র শোকর আদায় করে বললাম, সত্যি নিজের চোখে আমি মহান স্রষ্টার চাক্ষুষ রহমত প্রত্যক্ষ করলাম। আগন্তুকদের যিনি কথা বলছিলেন তিনি এবার আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, আপনি কি নিজেকে সম্পূর্ণ সুস্থ মনে করছেন?

বললাম, হ্যাঁ আমি সম্পূর্ণ সুস্থ। যে কোন ধরনের কষ্টকর সফরের জন্য আমি প্রস্তুত।

বললেন, ধৈর্য ধরে ক'টি কথা শুনুন, একটুও বিচলিত হবেন না। এই সময় আপনার ধৈর্য এবং সাহসিকতার বড়ই প্রয়োজন। আপনার সম্পর্কে আমি সব জেনেছি মুজাহিদ কমান্ডার শেখ ওসামার কাছ থেকে।

আমি বুঝতে পারছিলাম না তিনি আমাকে আর কি বলবেন। ভেবেছিলাম, শেখ ওসামা বুঝি আমাকে পাঠানোর ব্যবস্থা করে দিতে ওদের পাঠিয়েছেন। কিন্তু কথা শুনে কেমন যেন রহস্য মনে হচ্ছে। বললাম, ওসামা ভাই কি আমাকে চলে যাবার এজাযত দিয়েছেন?

তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, হ্যাঁ, দিয়েছেন।

আমি পূর্ণ দৃষ্টি মেলে তার দিকে চাইলাম। কৃষ্ণপক্ষের সম্ভবত দ্বিতীয় কি তৃতীয়ার চাঁদ তখন পূর্বাকাশে জ্বলে ওঠেছে। হালকা কুয়াশায় চাঁদের মলিন আলোতে আমি লক্ষ্য করলাম, আগন্তুক যা বলতে চাচ্ছেন তা বলতে গিয়ে কষ্টে তার বুক ফেটে যাচ্ছে, তার চোখ দুটোতে অশ্রু টলমল করছে। আমি ব্যাকুল হয়ে বললাম, জনাব! আমি সম্পূর্ণ ঠিক আছি, যে কোন দুঃসংবাদ বইবার মনের জোর আমার আছে। আপনি বলুন, কি বলতে চাচ্ছেন।

তিনি একটা ঢোক গিলে বললেন, আস্তে, সুমাইয়া যেন জানতে না পারে। আমাদের প্রিয় কমান্ডার, আযাদী আন্দোলনের এক নামজাদা সিপাহসালার, সাহসী লড়াকু শেখ ওসামা আজ বিকেলেই এক অভিযানে শাহাদাত বরণ করেছেন।

এ কথা শোনামাত্রই আমি তাঁকে জড়িয়ে ধরে পাঠ করলাম, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন!! আমার মনে হচ্ছিল পৃথিবীটা বুঝি অন্ধকার হয়ে আসছে। আমার রক্তের সম্পর্কের কেউ নয়, বিদেশ-বিভূঁইয়ে পরিচয়। অথচ তাঁর শাহাদাতের খবর আমাকে এতটা ব্যথিত করে তুলছে কেন বুঝতে পারলাম না।

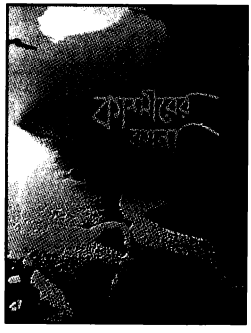
আগন্তুক বলে চললেন, কমান্ডারের লাশ জাহানাবাদে আনা হয়েছে। রাতেই জানাযা শেষে তাঁর আব্বার কবরের পাশে দাফনের ব্যবস্থা করা হবে। শাহাদাতের আগে বুকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় আমার কোলে মাথা রেখে বলেছিলেন, আবদুল ওয়াহেদ, ভাই আমার! তোমাকে শেষ বেলায় একটা অনুরোধ করে যাচ্ছি। বাড়িতে বাংলাদেশ থেকে আগত যে সাংবাদিকের কথা তোমায় বলেছিলাম, তাকে নিরাপদে ইসলামাবাদ পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করবে। আর আমার আম্মা ও আদরের বোনটিকেও আপাতত ইসলামাবাদে মামাদের ওখানে পাঠিয়ে দিতে চেষ্টা করো। কারণ আমাদের গ্রামটি আর নিরাপদ রইলো না, যতদিন এর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ তোমরা গ্রহণ করতে না পারো। ওখানে তারা আল্লাহর ইচ্ছায় সমাদরেই থাকবে, এ আমার বিশ্বাস। যত দ্রুত পারো অসুস্থ বিদেশী মেহমান ও মা-বোনকে পাঠানোর ব্যবস্থা করবে।

একটু দম নিয়ে ভদ্রলোক আবার বললেন, এখানে এসে যা দেখলাম তাতে কষ্টে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। তাই কমান্ডারের মায়ের লাশ আমরা নিয়ে যাচ্ছি। পিতার কবরের পাশেই মাতা-পুত্রের দাফন করা হবে। এখানে আর একটা মুহূর্তও নিরাপদ নয়। যে কোন সময় ওরা এসে আক্রমণ করে বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়ে যাবে। প্রকেটশনের ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না। তাই সুমাইয়াকে নিয়ে এখনই ইসলামাবাদের উদ্দেশে আপনার রওয়ানা হতে হবে। এখান থেকে সোজা উত্তর দিকে নদীটা পেরিয়ে মাইল দেড়েক গেলেই মুজাহিদদের একটা অনিয়মিত ক্যাম্প পাবেন। এই টোকেনটা সঙ্গে রাখুন, এটা দেখালেই তারা আপনাদের সহযোগিতা করবে। সেখানে অগ্রবর্তী ক্যাম্পে ওয়ারলেসে মেসেজ দিয়ে রাখবো, ইসলামাবাদ পৌঁছে দেয়ার জন্য তারা গাড়ি রেডি করে রাখবে। সুমাইয়ার কাছে তার মামার বাসার ঠিকানা আছে।

ভদ্রলোক পকেট থেকে একটা কোড নম্বর সম্বলিত এ্যালুমিনিয়ামের টোকেন আমার হাতে দিয়ে বললেন, এটা রাখুন। আশা করি রাস্তায় আপনাদের কোন অসুবিধা হবে না। যদি জাহানাবাদে দু'একদিন রাখার মতো অনুকূল পরিবেশ থাকতো তাহলে এ রাতে আপনাদের এভাবে ছেড়ে দিতাম না। আর হ্যাঁ, নিরাপদে ইসলামাবাদ পৌঁছার আগে সুমাইয়াকে তার ভাইয়ের শাহাদাতের খবরটা জানাবেন না যেন।

বললাম, ইনশাআল্লাহ আপনার নির্দেশ মতোই হবে। দোয়া করি এবং দোয়া চাই।

এরপর আমরা এগিয়ে গেলাম সুমাইয়ার কাছে। সে তখনও নিথর হয়ে বসে আছে মৃত মায়ের মাথাটা কোলে নিয়ে। মুজাহিদ আবদুল ওয়াহেদই বললেন সুমাইয়াকে তার মাকে জাহানাবাদ নিয়ে যাবার কথা এবং আমাদের যাত্রার কথা। শুধু চেপে গেলেন শেখ ওসামার শাহাদাতের কথা।



আঠার

বিপদে চরম ধৈর্য ধারণ করার মতো গুণী মানুষ বর্তমান সময়ে বিরল। আল্লাহভীরু এবং তাঁর প্রতি পূর্ণ আস্থাবান মানুষেরাই পারে কেবল ধৈর্যের সাথে বিপদ মোকাবেলা করতে। অষ্টাদশী কুমারী সুমাইয়ার বেলায় আমি তা প্রত্যক্ষ করলাম। যে কোন সময় ভারতীয় বাহিনী দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, অথচ সে নিজের শহীদ মায়ের লাশের গোসল না দিয়ে বাড়ি থেকে বের হবে না। আগত মুজাহিদ দু'জন আপত্তি তুলে বলেছিলেন, জাহানাবাদে তোমার আম্মির গোসল জেনানাদের দিয়েই করানো হবে। আমরা যথাযথ মর্যাদার সাথে তাঁর লাশ দাফন করবো– এ ব্যাপারে নিশ্চিত থাকো। এখানে এখন সময় ক্ষেপণ করা নিরাপদ নয়।

জবাবে সুমাইয়া জানায়, আমি জানি আপনারা মর্যাদার সাথেই শহীদের দাফন-কাফন সম্পন্ন করবেন। কিন্তু আম্মিজানের গোসল কোন অপরিচিত জনের দ্বারা হোক এটা আমি বরদাশত করতে পারছি না। এ শিক্ষাটুকু আম্মিজানের কাছ থেকেই আমি পেয়েছি। আর বিপদের কথা যদি বলেন, সেটা তো কেবল আল্লাহ তাআলাই সামলাতে পারেন, যাঁর ইশারা ছাড়া কোন কিছুই ঘটে না। আমাদের জীবন ও নিরাপত্তা তো তাঁর কুদরতী খেয়ালের বাইরে নয়।

এরপর আর কথা চলে না। আগন্তুক মুজাহিদদ্বয়ও কিছু বলেননি। তাঁরা বাইরে প্রহরায় নিয়োজিত হলেন। সুমাইয়াকে সাহায্য করতে আমিই এগিয়ে গেলাম। ঠিক এ সময়ই এসে হাজির হয় মায়ের অসুস্থতার জন্য চারদিন ধরে ছুটিতে থাকা কিশোর আইয়ুব। সঙ্গে তার মাও এলেন। এসেই অবস্থা দেখে কান্নাকাটি

শুরু করে দিলে আমিই তাকে সান্ত্বনা দিয়ে সুমাইয়াকে সহযোগিতা করতে বললাম। চটপট তারা কাজে লেগে গেলো। মশারী টানিয়ে রাতের প্রায়ান্ধকার প্রথম প্রহরে খুব অল্প সময়েই মরহুমা মায়ের গোসল দিলো সুমাইয়া। পানি ও এটা সেটা আইয়ুবের সাথে আমিও এগিয়ে দিলাম। তারপর ঘর থেকে পরিষ্কার শুষ্ক বস্ত্রে মায়ের লাশ মোড়ানো হলো। আতর মাখিয়ে দিলো সুমাইয়া। আমি যে খাটিয়াটায় এতদিন শুয়েছি, সেটা ভেঙ্গে বাঁশের আড়ার সাথে ঝুলিয়ে তাতে লাশ তুলে দিয়ে সুমাইয়া নিজে মায়ের ঘরে ঢুকে গেলো।

মুজাহিদ দু'জন লাশ নিয়ে বের হবার সময় আমাদের তাড়া দিয়ে গেলেন তাড়াতাড়ি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ার জন্য। ভারতীয় নিহত সেনাদের তিনটি হাতিয়ার আমাদের দখলে। মুজাহিদদের অস্ত্র সংকটে এগুলো কাজে আসবে বলে আমি তা তুলে দিলাম আগন্তুক মুজাহিদদের হাতে। কমান্ডার আবদুল ওয়াহেদ বললেন, মালে গনিমতের আইনে এগুলোর মালিক আপনি। পরিস্থিতির শিকার বলে শহীদ কমান্ডার শেখ ওসামার ওয়াদানুযায়ী আপনাদের প্রত্যক্ষ মদদ দিতে পারলাম না বলে বড্ড কষ্ট পাচ্ছি। আপনারা অগ্রবর্তী মুজাহিদ ক্যাম্পে আমার দেয়া টোকেন দেখালে আশা করি কাঙ্ক্ষিত সহযোগিতা পাবেন। এরপর নিজের আলখেল্লার পকেট থেকে মুষ্টিবদ্ধ ডান হাতটি বের করে আমার জামার পটেকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, আপনাদের রাহা খরচ বাবদ এই সামান্য হাদিয়া অনুগ্রহ করে কবুল করুন।

আমি তার হাতখানা চেপে ধরে বললাম, এ দিয়ে আমাকে লজ্জিত করবেন না। ইসলামাবাদ পৌঁছাতে পারলে আল্লাহ চান তো পয়সার জন্য আটকা পড়বো না। আপনাদের এই মহান সংগ্রামে নিজে কিছু করতে পারলাম না, উপরন্তু আপনাদেরই এমনতরো দয়া-দাক্ষিণ্য আমাকে ভীষণ পীড়া দেবে।

নিজের হাতটা জোর করে ছাড়িয়ে নিয়ে বললেন, আল্লাহর ওয়াস্তে একে দয়া দাক্ষিণ্য মনে করবেন না। মনে করুন আপনার এই অস্ত্র দুটো আমি কিছু কম দামেই কিনে নিলাম। আর আমাদের জন্য করার কথা বলছেন? আপনি যে আমাদের সংগ্রামের কত বড় অংশীদার তা কমান্ডার শেখ ওসামার কাছে অনেকবার শুনেছি। বর্তমান সময়ে যুদ্ধ শুধু অস্ত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং কলমের অস্ত্র অনেক বেশি শক্তিশালী ভূমিকা রাখে। আল বিদা বলে আমাদেরও দ্রুত বেরিয়ে পড়ার আরেকবার তাগিদ দিয়ে লাশ নিয়ে তারা রাস্তায় নেমে পড়লেন। একটি অস্ত্র পূর্ণ লোড করে আমাদের নিরাপত্তার জন্য রেখে গেলেন।

আমি তাদের বিদায় দিয়ে নিহত ভারতীয় সৈন্যদের লাশের কাছে এলাম। বিদায়ী মুজাহিদরা এখানে একটা ভূমি মাইন এবং আরেকটা মাইন রাস্তার এমন

এক জায়গায় পুঁতে রেখে গেছেন যে, ভারতীয় বাহিনী গাড়ি নিয়ে আসলে তা থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন সুযোগই পাবে না। তারা মাইন দুটির কথা আইয়ুবকে ভালো করে বুঝিয়ে দিয়ে বলে গেলো, রাতে যদি ওরা আসে তো তার কিছু করার নেই। যদি অপারেশানে রাতে না আসে তাহলে যেনো শেখানো কৌশল মতো সরিয়ে রাখে, নতুবা অন্যদের দুর্ঘটনার শিকার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আইয়ুব এমন একটা রোমাঞ্চকর কাজের দায়িত্ব পেয়ে বেশ খুশি হয়েছে মনে হলো।

নিহত ভারতীয় এক সেনার পা থেকে এক জোড়া গামবুট খুলে নিয়ে পরে নিলাম। কেমন পথে কতটুকু হাঁটতে হবে সেটা তো জানা নেই।

আর দেরি করা উচিত নয় ভেবে বৈঠকখানা ঘরে এসে প্রবেশ করলাম। দেখি সুমাইয়া আইয়ুব ও তার মাকে বলছে, এই বাড়ি ঘরে যেসব সম্পদ রয়েছে তা থেকে তোমরা যা তোমাদের জন্য নিয়ে যেতে পারো নিয়ে যাও। তবে সাবধান! শত্রুসেনা এসে পড়ছে টের পাওয়ামাত্রই আত্মরক্ষা করবে। জিনিসপত্রের লোভে আবার নিজেদের জীবন বিপন্ন করে তুলো না যেন। বুঝেছো আমি কি বলেছি?

আইয়ুব ও তার মা চোখের অশ্রু মুছতে মুছতে ঘাড় কাত করে সায় জানালো। আমি বললাম, আর দেরি করা বোধহয় ঠিক না আমাদের।

জবাবে সুমাইয়া বললো, আমি রেডি, চলুন বেরিয়ে পড়ি।

আমি নিজের ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে এসে দেখি সুমাইয়াও একটি ব্যাগে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গুছিয়ে তৈরি হয়ে আছে। আমার আপত্তি সত্ত্বেও নিজের ব্যাগটি নিজের কাঁধে ঝুলিয়ে নিলো সে। সাইলেন্সারযুক্ত রিভলবারটি অপেক্ষাকৃত হালকা হওয়ায় সেটি তার হাতে দিয়ে আমি ডান কাঁধে ঝুলালাম ভারতীয় সেনাদের কাছ থেকে পাওয়া হাতিয়ারটি। সুমাইয়া শেখ ওসামার একটি আফগানি ক্যাপ দিয়ে বললো, এটা মাথায় পরে নিন, বাইরে বেশ কুয়াশা ও ঠাণ্ডা। একটা ধন্যবাদ জানিয়ে সেটি মাথায় পরে বিসমিল্লাহ বলে অজানার পথে শঙ্কিত পা বাড়ালাম।

এখান থেকে উত্তর দিকে পাহাড় হতে নেমে আসা বরফগলা নদীটি পার হয়ে ওপারে মাইল দেড়েক দূরে অস্থায়ী মুজাহিদ ক্যাম্পের সন্ধান করতে হবে। সোজা পথে নদী পার হওয়া যাবে না। কারণ এদিকে নদীর প্রায় চল্লিশ ফিট খাড়া পাড়। তাই সুমাইয়ার কথামতো বাগানের ভেতর দিয়ে আমাদের যেতে হচ্ছে উত্তর-পশ্চিম কোণে।

শুভ্র কুয়াশা ভেদ করে গাছ-গাছড়ার ফাঁক গলিয়ে ফালি ফালি চাঁদের আলো আছড়ে পড়ছে জমিনে। শিশির ভেজা ঘাস মাড়িয়ে আঙ্গুর, আপেল, কমলা, আখরোট প্রভৃতি বাগানের ভেতর দিয়ে মেঠো পথ ধরে আমরা হাঁটতে লাগলাম। সত্যি সত্যিই নদীর পাড় এ দিকটায় বেশ ঢালু। বরফগলা হিমশীতল পানির কুলুকুলু শব্দে চমকে তাকালাম নদীর দিকে। আমার প্রশ্নের জবাবে সুমাইয়া বললো, এ দিকটায় এখন হাঁটু পানির বেশি হবার কথা নয়। আমি গামবুট খুলে নিতে চাইলে সুমাইয়া বললো, গামবুট খোলার দরকার হবে না। হাঁটুর ওপর পর্যন্ত তো ঢাকা আছে। আশা করি পানি ভেতরে ঢুকবে না। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পানিতে ভিজে দরকার নেই। বাইরে যে এখনও প্রচণ্ড শীত পড়ে, নদীর ধারে এসে তা যেন আরও প্রকটভাবে বুঝতে পারলাম। আমার গায়ে মোটা কোট আর সুমাইয়ার গায়ে লেহাঙ্গা। বললাম, তাহলে এবার নেমে পড়া যাক।

সুমাইয়া পেছনে তাদের বাড়ির দিকে মিনিটখানেক চেয়ে রইলো। আমি মাত্র কয়েকদিন এখানে থেকেছি অতিথি হয়ে। তাও বিপদে পড়ে, বলা যায় বাধ্য হয়ে। তাতেই এই জায়গা ও বাড়ির প্রতি যেন কেমন মায়া বসে গেছে। সুমাইয়ার মায়ের মৃত্যু আমাকেও বেশ কষ্ট দিয়েছে। হায়রে অদৃষ্ট! একই দিনে শেখ ওসামাও শহীদ হলেন। যে মা মেয়ের বিয়ে হয়ে গেলে আজও আমার সাথে একা বাড়িতে থাকার আশঙ্কা প্রকাশ করছিলেন, তিনিই কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে পুত্রের সাথে দুনিয়া ছেড়ে চলে গেলেন। আশ্রয় নিচ্ছেন দু'গ্রাম পরে আপন স্বামীর কবরের পাশে।

সুমাইয়া কি ভাবছে কে জানে। হয়তো নিজের বাড়িঘর, চেনা জানা পরিবেশ সবকিছু ছেড়ে একবস্ত্রে বাড়ি ছাড়ার কথা, মায়ের মৃত্যু, অনিশ্চিত যাত্রা এবং আবার কখনও বাড়িতে ফিরে আসতে পারবে কি না তাই ভাবছে। চন্দ্রালোকের ম্লান আলোয় তার বেদনার্ত মুখখানি কতই না করুণ দেখাচ্ছে। আমিই আগে পানিতে নামলাম, পেছনে সুমাইয়া। পানি কম হলেও স্রোত খুব বেশি। পায়ের জুতার নিচে ছোট বড় পাথর পড়ছে। বেশ কৌশল করে পা না ফেললে পানিতে পড়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই সতর্কতার সাথে পানি ভেঙ্গে ওপারে যেতে হলো।

আমি যখন প্রায় পাড়ে পৌঁছে গেছি ঠিক তখনই প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে পেছন ফিরে দেখি, দূরে অন্তত এখান থেকে চল্লিশ-পঞ্চাশ ফিট ওপরে বিশাল অগ্নিকুণ্ড লেলিহান হলকা ছড়াচ্ছে। মাঝ নদী থেকে সুমাইয়া কেবল বললো, শত্রুরা বাড়ি আক্রমণ করেছে, মাইন দুটি কাজ দিয়েছে মনে হয়।

শত্রুদের গাড়ি বিস্ফোরিত হয়েছে নাকি তারা বাড়িতে বোমা মেরেছে আমি বুঝতে পারছিলাম না। তাড়াতাড়ি পাড়ে উঠে কাঁধ থেকে ব্যাগটা নামিয়ে ক্যামেরা বের করলাম কারগিল থেকে ফিরে যাবার আগে শেষ ধ্বংসযজ্ঞটা ধারণ করার জন্য। পেছন ফিরে দেখি সুমাইয়া হোঁচট খেয়ে পড়ে গেছে পানিতে। পরনের কাপড়সহ প্রায় সমগ্র শরীর ভিজে গেলেও ততক্ষণে সে নিজেকে বেশ সামলে নিয়েছে। সম্ভবত বেগানা পুরুষ বলেই সাহায্যের জন্য বাড়িয়ে ধরা আমার হাতও প্রত্যাখ্যান করে সুমাইয়া বলে ওঠলো– আমি ঠিক আছি, আপনি ওপরে উঠে যান।

দু'চার ফোঁটা পানি ছিটকে আমার হাতে পায়ে লাগায় বুঝতে পারলাম এ পানি কতটা ঠাণ্ডা। এমনিতেই ঠাণ্ডায় আমার অনাবৃত কান দুটি কেমন অসাড় হয়ে পড়েছে। বরফগলা নদী পাড়ের হিমেল হাওয়া আমাদের দেশের মাঘের শীতের চেয়েও প্রকটভাবে গায়ে কাঁটার মতো লাগছে। নদী পাড়ে খোলা ময়দানে এসে বুঝতে পারলাম, এ শুধু আমাদের দেশের ঘন কুয়াশা নয়, মনে হচ্ছে তুলার মতো উড়ে বেড়াচ্ছে তুষারপাত। এ অবস্থায় বরফগলা পানিতে প্রায় সম্পূর্ণ ভিজে যাওয়ার পর যে কতটা ঠিক আছে সুমাইয়া তা বুঝতে আমার বাকি রইলো না। জোর খাটিয়ে বললাম, অন্তত ব্যাগটা আমার কাছে দাও।

সুমাইয়া ব্যাগ বাড়িয়ে দিলো আমার হাতে। তার আগেই আমি পাড়ে উঠে এলাম। পেছনে টলতে টলতে সেও তীরে ওঠলো। তার ব্যাগটা আমার ব্যাগের কাছে রেখে পেছন ফিরে দেখতে লাগলাম সুমাইয়াদের বাড়িটা কিভাবে ছাইভস্মে পরিণত হচ্ছে। সুমাইয়াদের গ্রাম ও বাড়িটা যে এখান থেকে এত উঁচুতে তা আগে আমি বুঝতেই পারিনি। আসলে পাহাড়ি এলাকা সম্পর্কে আগে আমার তেমন ধারণাই ছিলো না। ক্যামেরার জুম ঘুরিয়ে রেঞ্জ কমিয়ে আস্তে আস্তে তা নদীর পাড়ে নিয়ে এলাম। এটি এমন এক ভিডিও ক্যামেরা, যাতে তীব্র অন্ধকারেও বাইরে ফ্ল্যাশ মারতে বা ফোকাস ফেলতে হয় না। এর সাথে সংযুক্ত বিশেষ কাচ লেন্স এরিয়া পর্যন্ত সব কিছু স্পষ্ট করে তোলে। আমি ক্যামেরার দৃষ্টিসীমা নদীর এপার পর্যন্ত নিয়ে এসেছি, ঠিক এ সময়ই সুমাইয়াদের বাড়ির দিক থেকে তীব্র একটা নীল আলো আছড়ে পড়তে দেখলাম। ক্যামেরা গলায় ঝুলিয়ে খালি চোখে দৃষ্টি ফেলে দেখি, তীব্র আলোকছটা গাঢ় কুয়াশা ভেদ করে রাতের অন্ধকার খান খান করে দিয়ে ঘুরে আসছে এদিকেই। ক্রমেই তীব্র আলো এসে আছড়ে পড়লো নদীর এই পাড় পর্যন্ত। সেই আলোতেই দেখতে পেলাম সুমাইয়া ভূতলে লুটিয়ে আছে এলোমেলো হয়ে। অনেক দূরে থেকেও কি শত্রুরা তাহলে আমাদের দেখে

ফেলেছে বিশেষ এই সার্চ লাইটের আলোতে? আমি আর কিছু ভাবতে পারলাম না। এ অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকা যে উচিত নয় আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় যেন তা বুঝিয়ে দিলো। তাড়াতাড়ি লুটিয়ে পড়লাম ঢালু নদী পাড়ে। অল্পক্ষণেই দেখা গেলো আলোটা ঘুরে ঘুরে বিপরীত দিকে চলে গেছে। ওরা তবে নিজেদের নিরাপত্তার জন্যই চারদিক ভালো করে দেখে নিচ্ছে, কোথাও মুজাহিদরা রয়েছে কি না।

আলোটা দূরে সরে গেলে অনেকটা ক্রলিং করে আমি সুমাইয়ার কাছে পৌঁছলাম। সুমাইয়ার কোন সাড়া নেই। ভেজা পোশাক সারা গায়ে লেপ্টে আছে। নদী পাড়ের হিমশীতল বাতাস আর ভেজা পোশাকে কুয়াশা পড়ে সুমাইয়া যেন জমে গেছে। প্রথমে চাপাস্বরে ডাকলাম। কিন্তু কোন সাড়া না পেয়ে তার বাহুতে ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে ডাকলাম সুমাইয়া সুমাইয়া বলে। না, সাড়া নেই। তার গা যেন বরফের মতো জমে গেছে। মুখে হাত দিয়ে দেখি দাঁত কপাটি লেগে আছে। পালস্ দেখলাম খুবই দুর্বল। বোঝাই যায় না চলছে কি না। এমন শীতেও আমার কপালে ঘাম জমে গেলো ভয় ও দুশ্চিন্তায়। সুমাইয়া কি তবে জমে হিম হয়ে যাচ্ছে? চারদিকের ঘন কুয়াশার চাদর যেন এক রহস্যময় প্রেতপুরীর আবহ তৈরি করে রেখেছে। ভয়ে আমার সব লোমকূপ খাড়া হয়ে ওঠলো।

মনে মনে আল্লাহকে স্মরণ করে সেজদায় লুটিয়ে পড়ে রইলাম কতক্ষণ। কয়েক মুহূর্ত সেজদায় লুটিয়ে থাকার পর মনে হলো, এ অবস্থায় নিজেকে স্থির রেখে বিপদের মোকাবেলায় চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহর সাহায্য তো আর এমনি এমনি আসবে না। চোখ মেলে তাকালাম দিগন্তের দিকে। সুমাইয়াদের বাড়ির দিকেও আগুন ও ধোঁয়ার রেশ কমে এসেছে। সেই সার্চ লাইটের তীব্র আলোও আর দ্বিতীয়বার এদিকে আসেনি। বিপরীত দিকে তাকালে মনে হলো, অদূরে বুঝি একটা বিরাট গাছ দাঁড়িয়ে আছে বিশাল ছাতার মতো। আমি উঠে ব্যাগ দুটি এবং হাতিয়ার তুলে নিয়ে গাছের গোড়ায় চলে এলাম। কি গাছ তা চিনতে পারলাম না। ঘন ডালপালা ও পাতা থাকায় গাছের কাছ থেকে কুয়াশা যেন দূরে সরে রয়েছে। তবে গাছের পাতা ভিজে ভিজে ডাল বেয়ে একটু পর পর বড় বড় ফোঁটায় পানি পড়ছে নিচে। জিনিসগুলো গাছের গোড়ায় রেখে ছুটে গেলাম সুমাইয়ার কাছে। তারপর আর বৃথা ডাকাডাকি না করে পাঁজাকোলা করে তাকে নিয়ে এলাম গাছের তলায়। মনে হলো অজ্ঞান মানুষের ভার বুঝি বা দ্বিগুণ হয়ে যায়। সুমাইয়ার জ্ঞান থাকলে কি তাকে এতটা ভারী মনে হতো, কি জানি। সুমাইয়াকে বয়ে নিয়ে ঢালু বেয়ে ওপরে গাছতলাতে আসতে আমি অনেকটা হাঁপিয়ে উঠলাম। তাকে গাছ তলায় শুইয়ে দিয়ে ভাবতে লাগলাম, এখন কি করা যায়।

আমার বুদ্ধি যেন আর কাজ করতে চায় না। এখন আমি কি করবো ভেবে পাচ্ছি না। শঙ্কা ও ভয়ে আমার জিভ শুকিয়ে আসছে। হায়! সুমাইয়ার যদি এখন কিছু একটা হয়ে যায়? আমি একা এখানে কি করতে পারবো? কারো সাহায্য পাবার আশাই তো নেই। তাকে ছাড়া আমি ফিরেই বা যাবো কি করে? সুমাইয়ার এই বিপদে সত্যিই আমার চোখ থেকে ক'ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়লো। হঠাৎ মনে হলো, ব্যাগে নিশ্চয়ই সুমাইয়ার শুকনো জামা কাপড় রয়েছে। হায়! যদি একটু আগুন ধরানোর ব্যবস্থা করতে পারতাম! এই ভিজে যাওয়া শীতল শরীরটা একটু সেঁকে নিতে পারতাম, তাহলে নিশ্চয়ই সুমাইয়ার জ্ঞান ফিরে আসতো। এসব ভাবতে ভাবতে সুমাইয়ার ব্যাগটা খুলে ফেললাম। ব্যাগের ভেতর হাতড়ে কাপড় চোপড় যা বেরিয়ে এলো তাতে একটা মোটা কম্বলও রয়েছে। কম্বল ও শুকনো জামা কাপড় নিয়ে চলে এলাম সুমাইয়ার কাছে।

কম্বলের ভাঁজ খুলতে গেলে একটা কাংরি ছিটকে পড়লো পাশে। একটু অবাক হলাম এই ভেবে যে, এত স্বল্প জিনিসপত্রের সাথে সুমাইয়া এই কাংরিটা নিতে গেলো কেন? নাকি সে জানতো যে, পথে শীতে এমন কাহিল হয়ে পড়তে হবে আমাদের। তাহলে তো কয়লাও থাকতে পারে ব্যাগে। মনের মধ্যে যেন একটা অজানা আনন্দের ঢেউ খেলে গেলো। আমার ব্যাগের সাইড পকেটে দিয়াশলাইও থাকার কথা। মনে মনে বললাম, হে আল্লাহ! ব্যাগে যেন কয়লা ও দিয়াশলাই থাকে।

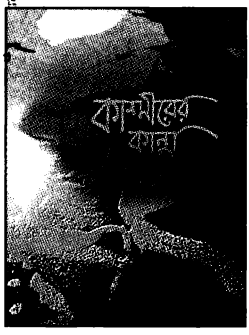
তার আগে ভেজা কাপড়গুলো পাল্টানো প্রয়োজন। প্রয়োজন তা আমি বুঝি, কিন্তু কিভাবে তা সম্ভব? যদি কাপড় পাল্টানোর সময় সুমাইয়ার জ্ঞান ফিরে আসে, তাহলে? তাহলে সে আমাকে কি ভাববে? আমি কি তার সামনে দাঁড়াতে পারবো– বুঝাতে পারবো এ দুঃসময়ের গুরুত্ব? তার কাছে কি বিশ্বাস বলে আমার প্রতি কিছু অবশিষ্ট থাকবে? মিনিটখানেক এসব ভেবে চন্দ্রালোকে তার নিষ্পাপ মায়াবী মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে সুমাইয়া সুমাইয়া বলে দু'বার ব্যর্থ ডাকাডাকিও করলাম আবার।

না, ভেজা কাপড় তার পাল্টাতেই হবে। এ যে জীবন-মরণ সমস্যা। এখানে এতসব ভাবাভাবির মওকা কোথায়? মোটা কম্বলটা দিয়ে আগে তার সমগ্র শরীর ভালো করে ঢেকে দিলাম। তারপর আস্তে আস্তে কম্বলের ভেতর হাত ঢুকিয়ে একে একে তার সব ভেজা পোশাক খুলে ফেললাম। এ সময় কেবলই আল্লাহর কাছে মনে মনে বলতে থাকলাম, হে আল্লাহ! এ অবস্থায় যেন সুমাইয়ার জ্ঞান না ফিরে। তার পাথরের মতো অসাড় দেহ দেখে মনে মনে আশ্বস্ত হলেও তা ভেবে ভেবে বেশ অস্থির হয়ে ওঠলাম। এ অস্থিরতার মাঝেই শুকনো কাপড়গুলো কোন

রকম পরিয়ে দিলাম। মনে মনে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে প্রার্থনা করতে থাকলাম, আয় আল্লাহ, সুমাইয়াকে এবার সুস্থ করে দাও।

সুমাইয়ার ব্যাগে সত্যি সত্যিই পলিথিনে মোড়ানো কয়েক টুকরা কয়লা আমি পেয়ে গেলাম এবং আমার ব্যাগে পেলাম দিয়াশলাই। সত্যিই আল্লাহর অপার করুণা, এই দুঃসময়ে এমন দুটি দুর্লভ বস্তু হাতের কাছে পেয়ে যাবো। একটি কাঠি জ্বালিয়ে ব্যর্থ হলাম। একে তো ঠাণ্ডা ঝিরঝিরে বাতাস, তদুপরি দিয়াশলাই'র কাঠি থেকে সরাসরি কয়লায় অগ্নিসংযোগ এক দুরূহ কাজ। ব্যাগ থেকে ডাইরির দুটি পাতা ছিঁড়ে মুড়িয়ে নিয়ে তাতে আগুন ধরালাম। কাংরিতে কয়লা রেখে আগুন ধরানো কাগজ ধরে রাখলাম। এ সময় মনে আর এক অজানা ভয় ঢুকে গেলো। এই মধ্য রাতে এখানে আগুন দেখে সশস্ত্র কোন গ্রুপ আবার অপারেশনের খায়েশ করে বসে কি না। তাই সুমাইয়াকে জড়ানো কম্বলের একটা প্রান্ত সামান্য টেনে নিয়ে যথাসম্ভব আগুনটা ঢেকে রাখতে চেষ্টা করলাম। অবশ্য কাছাকাছি প্রহরারত কোন সশস্ত্র গ্রুপ না থাকলে জ্যোৎস্নারাতে এই সামান্য আলো দূরে থেকে দেখা যাবার কথা নয়। কাগজ পুড়ে গিয়ে কয়লার একটি টুকরায় আগুন ধরে গেলো। এরপর ফুঁ দিয়ে দিয়ে পাত্রের সবকটি কয়লায় আগুন ধরালাম। এই শীতে আগুনের তপ্ত পরশ সত্যিই খুব আরামদায়ক। সুমাইয়ার গায়ের কাছে কাংরিটা রেখে তাতে আমার দু'হাতের তালু গরম করে করে তার হাত, পায়ের তালু, চেহারা এবং কানে গরম হাতের পরশ বুলিয়ে দিলাম।

শুকনো পোশাক পরানোর পর মোটা কম্বলের একটা অংশ সুমাইয়ার গায়ের নিচে মাটিতে বিছিয়ে বাকিটা দিয়ে তার সমগ্র শরীর মুড়ে দিয়েছিলাম। এবার আগুনের তাপ এবং তার হাত, পা, মুখে আমার তপ্ত হাতের পরশে কতটা উষ্ণতা সে ফিরে পেয়েছে জানি না, তবে এভাবে মিনিট দশেক চেষ্টা করার পর হৃদয়ের অনেক গভীর থেকে যেন বড় একটা গরম দীর্ঘশ্বাস বের হলো সুমাইয়ার। আমি চকিতে চমকিত হলাম। চাঁদের মুখ থেকে মেঘ সরে গিয়ে হঠাৎ যেন আলো দ্বিগুণ ছড়িয়ে দিয়েছে। চারদিকে যেন হঠাৎ করেই রাতজাগা অসংখ্য পোকা একযোগে সুর তুলেছে। কই এতক্ষণ তো এর কিছুই খেয়াল করিনি। ঝলমলিয়ে হেসে ওঠা চাঁদের পানে চেয়ে হৃদয়ের গভীর থেকে কেবল উচ্চারণ করলাম, সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার!!



ঊনিশ

সুমাইয়া জ্ঞান ফিরে পেয়েছে। এই মুহূর্তে আমাকে পৃথিবীর সবচেয়ে গর্বিত এবং সুখী মানুষ বলে মনে হচ্ছে। আশ্চর্য মানুষের সুখানুভূতির গতি প্রকৃতি। একটু আগেও আমি দুঃশ্চিন্তা-ভয়-আতঙ্কে যেন দিশেহারা হয়ে পড়েছিলাম। আর এখন? এখন তো আমি দুর্গমগিরি কান্তার মরু হাসিমুখে পাড়ি দিতে পারবো। একটা বিষয় ভেবে পাচ্ছি না– আমার কোশেশ, সেবা-শুশ্রূষায় সুমাইয়ার জ্ঞান ফিরে আসায় নিজের কাছে নিজেকে এতটা ধন্য এবং গর্বিত মনে হচ্ছে কেন? সে কি কেবলই সুমাইয়ার সহযোগিতা ছাড়া আমার ইসলামাবাদ পৌঁছানো বিপদসংকুল হয়ে ওঠবে বলে? নাকি এই অসহায় বিপন্ন কুমারীর জীবন বাঁচাতে সহযোগিতা করার জন্যে? একি শুধুই দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধের তাগিদে, নাকি নিজের অজান্তেই এই সুন্দর মনের কুমারীর প্রতি আমার বিশেষ কোন ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে? কি জানি, মনের এসব সূক্ষ্ম অনুভূতির কারণ অনুসন্ধান করার মতো বুদ্ধি-জ্ঞান আমার কোনকালে ছিলোও না, এখনও বোধকরি নেই।

ফুলের পাপড়ি ফোটার মতো পিটপিট করে চোখ মেলে তাকালো সুমাইয়া। তাকিয়েই দেখতে পেলো তার মুখের ওপর ঝুঁকে থাকা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত আমার ব্যাকুল মুখখানি। আশ্চর্য এক সুখানুভূতিতে আমার চোখ থেকে দু'ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়লো। আমি লজ্জা পেলাম। সুমাইয়ারও দু'চোখের কোণ বেয়ে তপ্ত অশ্রু গড়িয়ে পড়তে দেখলাম। আমার কণ্ঠে খুশি ঝরে পড়লো, সুমাইয়া! তুমি ঠিক আছো তো?

জবাবে সুমাইয়া একটা কষ্টের হাসি উপহার দিতে চেষ্টা করলো। তারপর অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠলো। আমি বুঝতে পারলাম না তার এ কান্না কষ্টের, আনন্দের, নাকি অজানা অন্য কোন বেদনার।

আমি বুঝতে পারলাম না এ সময় সুমাইয়াকে কি বলে সান্ত্বনা দেবো। নিজের অজান্তেই আমার হাত দুটি তার চোয়াল ধরার জন্য উদ্যত হলো। পরক্ষণেই আবার তা ফিরিয়ে নিলাম। কিছুক্ষণ আগেও শুশ্রূষা করতে গিয়ে অজ্ঞান সুমাইয়ার শরীরে আমার হাতের স্পর্শ লেগেছে পরম মমতায়, অথচ এখন সুস্থ সুমাইয়াকে একটুখানি স্পর্শ করারও স্পর্ধা দেখাতে অজানা সংকোচ এসে ভর করেছে। এটা কি সুমাইয়ার ব্যক্তিত্বের কাছে আমার অবাধ্য মনের পরাজয় নাকি অন্যকিছু, বুঝতে পারলাম না।

একটু পর সুমাইয়া অনেকটা স্বাভাবিকভাবে উঠে বসলো। অজানা গাছটির একটা মোটা শিকড়ে হেলান দিয়ে বসার পর তার নজর পড়লো পাশে জড়ো করে রাখা তার ভেজা কাপড়ের ওপর। নিজের গায়ে শুকনো পোশাক দেখে অনেকটা আর্তনাদের সুরে সে উচ্চারণ করলো, মাহমুদ সাহেব!

আমি খানিকটা চমকে উঠে তাকালাম তার দিকে। বললাম, হুঁ!

এবার সে নিজেকে খানিকটা সামলে নিয়ে এবং বলতে চাওয়ার বিষয় পাল্টিয়ে সুর নামিয়ে অনেকটা স্বাভাবিক গলায় বললো, এখন কয়টা বাজে?

বাম হাতের কব্জিটা উল্টে রেডিয়ামযুক্ত ঘড়িটা দেখে নিয়ে বললাম, সাড়ে বারোটা।

সুমাইয়া নির্বিকার। উদাসী তার চাহনি, যেন জগতের কোন কিছুর প্রতি তার কোনই আগ্রহ নেই। তার এই নীরবতা আমাকে দারুণভাবে আহত করলো। তার জায়গায় আজ অন্য কেউ হলে, বিশেষ করে কোন পুরুষ হলে অবশ্যই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতো। তার প্রশংসার আশায় নয়; বরং তার এহেন উদাসীনতা আমাকে বেশ পীড়া দিল। আমার কোন কথা শোনার আগ্রহ তার আছে বলে মনে হলো না। আমিও নিশ্চুপ কয়লার আগুনের কাংরিটা তার দিকে এগিয়ে দিয়ে গাছের অপর শিকড়ে হেলান দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলাম উদাস ভঙ্গিতে।

মনের ভিতরটায় কেমন জানি উসখুস করছে কয়েকটি প্রশ্ন। সুমাইয়া কি আমার কোন কথা বা আচরণে আহত হয়েছে? সে কি আমাকে অবজ্ঞা দেখাচ্ছে, অবহেলা করছে? মনটা বড্ড খারাপ হয়ে গেলো আমার। এই মুহূর্তে এখানে

বসে থাকা মোটেও নিরাপদ নয় তা আমি যেমন বুঝি, তেমনি সুমাইয়াও জানে। কিন্তু উপায় কি! এখনই উঠে হাঁটার জন্য তো বলতে পারি না সুমাইয়াকে।

চিন্তাকে বিক্ষিপ্ত করে স্বস্তি পাবার আশায় অন্য অনেক সময়ের মতো এখনও আমি স্রষ্টার সৃষ্টির বিশালত্বের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করলাম। ঘন কুয়াশার ফলে আকাশে কোন তারকা নজরে পড়ছে না। চাঁদও বেশ ঘোলাটে দেখাচ্ছে। তাই বলে আমার দৃষ্টির বাইরে যে বিশাল সৃষ্টিজগত তা তো মোটেও থেমে নেই। চর্ম চোখে দেখা না গেলেও আমার মন চলে গেলো আমাদের চেনাজানা সৌরজগত থেকে অন্য কোন অজানা নাম না জানা নক্ষত্রের কোন এক সুনির্মল গ্রহে। প্রাণভরে বিচরণ করলাম সেখানে, যেখানে নেই পৃথিবীর মতো মানব সৃষ্ট কোন কদর্যতা, নেই যুদ্ধ-বিগ্রহ, পেশি ও অস্ত্রের বলে যেখানে নেই অন্যায় জুলুম নির্যাতন। আমি ভেবে পাই না, বিশ্বজগতের অসংখ্য নক্ষত্রের মাত্র একটি নক্ষত্র আমাদের সূর্য। অথচ এই একটি মাত্র নক্ষত্রের পৃথিবী নামক একটি মাত্র গ্রহের বাসিন্দাদের নিয়ে কত ইতিহাস, কত উত্থান-পতনের ধারাবাহিকতা চলে আসছে। বিশ্বজগতের তুলনায় পৃথিবীই যেখানে অফুরন্ত বালুকারাশির একটি মাত্র বালুকণার মতো, সেখানে এই পৃথিবীর মানুষরা কতই না নগণ্য, ক্ষুদ্র ও অসহায়। অথচ এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মানুষ জাতিরই কত গর্ব, কত অহংকার। তারা যেন সব বুঝেও না বোঝার ভান করে। অনন্তকালের তুলনায় মানুষের নশ্বর জীবন কতই না ক্ষণস্থায়ী!

সুমাইয়ার হাতের ধাক্কা এবং ডাকে আমার ভাবনায় ছেদ পড়লো। চমকে উঠে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালাম তার দিকে।

: কী ব্যাপার, চোখ মেলেই বসে বসে ঘুমুচ্ছেন নাকি? জানতে চাইলো সুমাইয়া।

বললাম, আমি ঘুমুইনি তো!

: তাহলে এত ডাকাডাকিতেও সাড়া দিচ্ছেন না কেন?

মৃদু হেসে বললাম, আমি পৃথিবীতে ছিলাম না।

আমার জবাব সুমাইয়ার কাছে প্রলাপের মতো মনে হলো। সে চমকে এদিক সেদিক তাকিয়ে অনেকটা ভীত স্বরে জানতে চাইলো, মানে?

বললাম, আমার মন সৌরজগত ছেড়ে অন্য কোন নক্ষত্রের অজানা কোন গ্রহে বিচরণ করছিল।

সুমাইয়া এবার ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসলো এবং বললো, এমন ভয়ানক পরিস্থিতিতেও আপনি নিশ্চিন্তে স্বপ্নচারীর মতো পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে পারলেন?

বললাম, পৃথিবীর সব দুঃখ, শোক-তাপ থেকে মুক্তি পেতে এর চেয়ে মোক্ষম উপায় যে আমার জানা নেই, তাই! তুমি ভাবতে পার, বিশাল এ সৃষ্টি জগতের তুলনায় আমাদের এই পৃথিবী কতটা ক্ষুদ্র, কত ক্ষুদ্রতম পৃথিবীর মানুষ, মহাকালের তুলনায় কত সংক্ষিপ্ত সময়ে মানুষ শিশু থেকে বুড়ো হয়ে কবরে চলে যায়?

সুমাইয়া বললো, সৌরজগতের বাইরেও দেখি আপনি বেশ জ্ঞান রাখেন। আমার পড়াশোনা তো খুবই কম, তাই এত জটিল বিষয় বোঝার মতো যোগ্য সমঝদার নিশ্চয়ই আমি নই।

বললাম, তুমি যতটুকু জান, আমি এর চেয়ে বেশি কিছু জানি না। এ বিষয়ে জ্ঞান আমারও সেকেন্ডারী পর্যন্ত।

আমাদের এখন ওঠতে হবে, এ জায়গাটা মোটেও আমাদের জন্য নিরাপদ নয়। যে করেই হোক মুজাহিদদের সাহায্যলাভের চেষ্টা করতে হবে। মুজাহিদদের খুঁজে পেতে আমাদেরকে আরও মাইল দেড়-দুই হাঁটতে হবে।

কিন্তু তুমি কি এখন হাঁটার মতো সুস্থ হয়েছো?

সুস্থা না হলেও তো উপায় নেই, পথ তো চলতেই হবে। থেমে থাকলে তো চলবে না।

সত্যিই থেমে থাকলে চলবে না। আমাদের এগিয়ে যেতে হবে এবং এখনই। সুমাইয়ার ভেজা কাপড় তার ব্যাগে রেখে দুটি ব্যাগই নিজের কাঁধে তুলে নিলাম। সুমাইয়ার হাতে দিলাম কেবল সাইলেন্সারযুক্ত রিভলবারটি। সব বোঝা নিজে বহন করায় সুমাইয়া আপত্তি তুলেছিল, কিন্তু তার ক্লান্ত শ্রান্ত ও দুর্বল শরীরের কথা বিবেচনা করে তার আপত্তি আমলে নিইনি।

দু'জনই সমান তালে হাঁটছি। কিছুদূর যেয়ে পড়লাম বিরান মাঠে। এসব জমিন থেকে সম্ভবত ক'দিন আগেই গম কেটে নিয়ে গেছে। কাটা গম গাছের ধারালো গোড়া। আমার গামবুটের নিচে পড়ে মটমট শব্দ করতে লাগলো। চেয়ে দেখি, সুমাইয়া খানিকটা পেছনে পড়ে গেছে। আমি থেমে তাকে সঙ্গে নিতে চাইলাম। কিন্তু নগ্ন পায়ে সে হাঁটতে পারছিল না। কাছে এলে বিষয়টা আমার নজরে পড়লো। সে কি বাড়ি থেকেই খালি পায়ে বেরিয়েছে নাকি পাদুকা নদীতে ফেলে এসেছে তা জানতে না চেয়ে বললাম, আমার ব্যাগে কেড্‌স আছে, তুমি পরে নাও। কেড্‌স বের করে দিলে বিনাবাক্যে সে তা পরে নিলো।

আবার হাঁটার পালা। অনেক দূর পর্যন্ত হাঁটার পর অনেকটা ঢালু জমিন পড়লো সামনে। আস্তে আস্তে এর উচ্চতা যেন বাড়ছে। সামনেই অনেকটা খাড়া পাড়। সুমাইয়া জানাল, ওপরে উঠলেই মুজাহিদদের কোন অস্থায়ী ক্যাম্পের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। অনেক কষ্টে আবারও দু'জন প্রায় সমান্তরালভাবে পাড় বেয়ে ওঠতে লাগলাম। হঠাৎ করেই আলোর বন্যা যেন আমাদের দু'চোখ ধাঁধিয়ে দিলো। আমি খানিকটা কেঁপে ওঠলাম ভয়ে। অন্তত কয়েকটা পাঁচ ব্যাটারী টর্চ খুবই নিকট থেকে আমাদের ওপর ফোকাস ফেলেছে। আমরা থমকে দাঁড়াতেই অপরিচিত গম্ভীর কণ্ঠ ভেসে এলো। তোমরা কারা, সত্যি সত্যি জবাব দাও। অন্য আরেকটি কণ্ঠ বললো, কোন চালাকি করার চেষ্টা করো না। আমাদের অস্ত্রের নলের মুখে তোমাদের মস্তক। সাবধান! অস্ত্র তাক করতে চেষ্টা করো না।

এবার সত্যি সত্যিই আমার গায়ের কম্পন বেড়ে গেলো। কি জবাব দেব, ভেবে পাচ্ছিলাম না। সুমাইয়া কি জাদু দেখালো বুঝতে পারলাম না। দেখি তাদের টর্চের আলো আমাদের চোখ থেকে নেমে গেছে। একজন আরেকটু এগিয়ে এসে নম্র সুরে বললো, ভয় নেই, আমরা মুজাহিদ। বলুন কি সাহায্য করতে পারি?

এবারও সুমাইয়া জবাব দিল। বলল, আমি কমান্ডার শেখ ওসামার বোন, আর ইনি আমাদের সম্মানিত মেহমান। আশপাশের কোন মুজাহিদ ক্যাম্পে যাওয়া আমাদের জরুরি।

আগন্তুক বললো, আল্লাহর হাজার শোকর। আপনাদের ধরার জন্য মুজাহিদ বেশে কয়েকজন ইন্ডিয়ান চর এ এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে বলে আমাদের কাছে ইনফরমেশান এসেছে। তাদের ধাওয়া করতেই আমরা এখানে ডিউটিতে এসেছি। আমাদের এও জানানো হয়েছে যে, একজন বিদেশি সাংবাদিক মেহমান এবং শেখ ওসামার বোন এদিকেই আসবে। আমরা এখানে আপনাদের অপেক্ষাই করছিলাম।

টর্চের আলো নিভে যাওয়ায় চাঁদের মৃদু আলোয় মুজাহিদরা আমাদের নজরে পড়লো। সংখ্যায় তারা চার জন। তার মানে চারটি টর্চের আলোই পড়েছিল আমাদের ওপর। মনে মনে আল্লাহর শোকর আদায় করলাম। একজন মুজাহিদ কিছুটা জোর করেই আমার কাছ থেকে ব্যাগ দুটি নিয়ে নিলেন নিজের কাঁধে। বোঝা কমে যাওয়ায় কিছুটা হালকাবোধ করলাম। কিছু দূর হাঁটার পর উপস্থিত হলাম একটা আঞ্চলিক অস্থায়ী মুজাহিদ ক্যাম্পে।

ক্যাম্পের সকল মুজাহিদ দল বেঁধে এসে সম্মানের সাথে আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। কোন্ সে জাদুর স্পর্শে তাঁরা আমাদের এত সহজেই বিশ্বাস করে এতটা ইজ্জত দিচ্ছেন তখনও তা আমার অজানা। একজন (সম্ভবত এই ক্যাম্পের দায়িত্বশীল হবেন) মুজাহিদ অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বললেন, আমরা লজ্জিত, আপনাদের কোন আপ্যায়ন করতে পারলাম না। আপনাদের কষ্ট করে আরেকটু সামনে আমাদের স্থায়ী ক্যাম্পে যেতে হবে। সেখানে কমান্ডার আবদুল ওয়াহেদ ভাই আপনাদের জন্য গাড়ি প্রস্তুত রেখেছেন। যখন খুশি যাত্রা শুরু করতে পারবেন।

এবার আমি বললাম, আপনাদের মেহেরবানী দীর্ঘ দিন মনে থাকবে। এবার আমাদের সে পথটাই দেখিয়ে দিন, যেখানে আমাদের জন্য গাড়ি প্রস্তুত আছে। তারপর জানতে চাইলাম, সেখানে ভাই আবদুল ওয়াহেদের দেখা পাব কি না?

জবাবে তিনি বললেন, ওয়াহেদ ভাই সম্ভবত এখনও জাহানাবাদেই রয়েছেন। তিনি ওই ক্যাম্পে বেতারে জানিয়েছেন গাড়ি তৈরি রাখার জন্য এবং আপনাদের মোজাফ্ফরাবাদ পর্যন্ত নিরাপদে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে। সেখান থেকে ইসলামাবাদের জন্য ট্যাক্সি ভাড়া করে দিয়ে আসবে আমাদের মুজাহিদ ড্রাইভার। এখন আমাদের দু'জন ভাই আপনাদের সেই ক্যাম্পে নিয়ে যাবে।

সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আবারও পথ চলতে লাগলাম। ক্লান্তিতে তখন আর পা চলতে চাইছে না। কিন্তু যখনই সুমাইয়ার অবসাদগ্রস্ত চেহারার দিকে তাকাই, তখনই আমার সব ক্লান্তি যে কোথায় পালিয়ে যায় টেরই পাই না। রাস্তায় সুমাইয়াকে নিচু সুরে জিজ্ঞেস করলাম, মুজাহিদ ভাইয়েরা তোমার কি কথা শুনে আমাদের এত তাড়াতাড়ি চিনতে পারলো?

জবাবে সুমাইয়া একটু মুচকি হেসে বললো, সেই টোকেন যা আপনাকে আবদুল ওয়াহেদ ভাই দিয়েছিলেন। এটা কেবল মুজাহিদদের ভিআইপি সদস্যদের ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয়। আমার ভাইকে তাঁরা খুবই ভালোবাসে এবং শ্রদ্ধা করে।

শেষ কথাটা শুনে আমার মনটা আবার বিষাদে ছেয়ে গেলো। আহা, সুমাইয়া তো এখনও জানে না, তার প্রিয় ভাইজান এখন আর দুনিয়াতে নেই।

আমাকে নিশ্চুপ থাকতে দেখে সুমাইয়া আবার বলতে লাগলো, জানেন, যখন আমরা মুজাহিদ ভাইদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলাম, তখন মনে মনে ভাবলাম, তারা যদি মুজাহিদ হয় তো এই টোকেন দেখেই আমাদের তাদের পক্ষের লোক মনে করবে। আর যদি শত্রু হয় তাহলে তারা এই টোকেনের মর্ম না বুঝে

আমাদের নিরস্ত্র ও গ্রেফতার করতে চাইবে। আর এই সুযোগে আমরাও অস্ত্র তাক করার সুযোগ পাব। ওদের হাতে ধরা পড়লে এমনিতেও তো আমাদের জীবন বরবাদ হয়ে যেতো, তাই মরার আগে তাদের যে ক'টাকে পারতাম শেষ করে দিতাম। তারা অবশ্য প্রথমেই আমাদের আক্রমণ না করে জীবিত আটক করার চেষ্টা করতো। কেন জানেন?

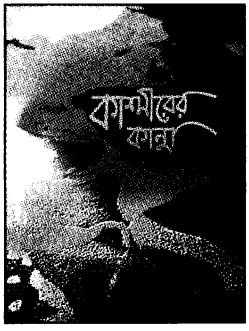
বললাম, কেন?

কারণ আমাদের মুক্তিপণ হিসেবে ব্যবহার করে তারা তাদের বন্দি বিনিময় করতে পারতো। একে তো আপনি একজন বিদেশি সাংবাদিক, তাছাড়া স্বয়ং এই অঞ্চলের চীফ কমান্ডারের বোন আমি। অতএব, তাদের কাছে আমাদের গুরুত্ব অনেক। তারা জানে আমাদের কাছে বিদেশি কোন মেহমানের গুরুত্ব কতটা বেশি। ফলে আমাদের জীবিত আটক করা হতো তাদের প্রথম টার্গেট। তাই এই সুযোগে আমি আমার এই নিঃশব্দ অস্ত্রটা ব্যবহার করে বসতাম। আচ্ছা, আপনি তখন কি করতেন, যদি আমরা সত্যিই শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত হতাম?

সুমাইয়াকে আশ্বস্ত করার জন্য বললাম, আমি তো কাঁধের বোঝা ফেলেই দিয়েছিলাম অস্ত্র তাক করার জন্য, তবে মৃত্যুর জন্যও মনে মনে প্রস্তুত হয়ে নিচ্ছিলাম।

সুমাইয়া বললো, গুড! আপনার কাছ থেকে এমন জবাবই আমি আশা করছিলাম।

রাতের আঁধারে সুমাইয়ার মুখখানা স্পষ্ট দেখা না গেলেও আমি বুঝতে পারছিলাম তার মুখে একটা স্বস্তিযুক্ত হাসির ছোঁয়া যেন ঝিলিক দিচ্ছিল।



বিশ

মাইক্রোবাসটা বেশ পুরনো বলে মনে হয়। রঙ চটা, স্থানে স্থানে দেবে গেছে। দেখলে মনে হয় দীর্ঘ দিন গ্যারেজে পড়ে থাকা অকেজো একটা গাড়ি। পেছনের সিটটা সম্পূর্ণই ব্যবহার অনুপোযোগী। সিটকভার ছেঁড়াফাড়া, ভেতরের ফোম দৃশ্যমান। ড্রাইভার জানালো, এই গাড়িটিই এ ক্যাম্পের একমাত্র ভরসা। ইঞ্জিনটা বেশ ভালো সার্ভিস দিচ্ছে। সংস্কারবিহীন পাহাড়ি উপত্যকার এবড়ো থেবড়ো উঁচু নিচু রাস্তায় চলতে চলতে গাড়িটার বডির এই হাল হয়েছে। মুজাহিদদের আনা-নেয়াসহ অ্যামুনেশনও পরিবহন করা হয় এই গাড়িটা দিয়েই।

বিসমিল্লাহ বলে গাড়িতে উঠে বসলাম। সুমাইয়া আগেই উঠে আমার ডান দিকে বসেছে। ক্যাম্পে মুজাহিদ কমান্ডার আমাদের যথেষ্ট খাতির যত্ন করলেও বিশ্রামের মওকা মেলেনি। রাত সাড়ে তিনটায় আমরা ক্যাম্পে পৌঁছি। কমান্ডার অভ্যর্থনা জানিয়ে আমাদের খাওয়া দাওয়া ও বিশ্রামের আয়োজন করলেন। কিন্তু কোনটাই তখন যাত্রা শুরু করার চেয়ে আকর্ষণীয় ছিলো না আমাদের কাছে। কাশ্মীরের বারুদমাখা বাতাসে আর নিঃশ্বাস নিতে পারছিলাম না। সুমাইয়াও কিছু খেতে পারলো না। সামান্য কিছু মুখে দিয়ে মগভর্তি রঙ চা খেলাম। তখন কিছুটা হলেও ক্লান্তি দূর হয়েছিল। সাড়ে চারটার দিকে কমান্ডারের কাছে যাত্রা শুরুর এজাযত চাইলাম।

তিনি একটু মুচকি হেসে বললেন, এখনই তো আযান হবে, নামাযের পরই বরং যাত্রা শুরু করুন।

বললাম, ঠিক আছে।

অল্পক্ষণ পরেই আযান হলো। নামায পড়ে এসে আমাদের অস্ত্র দুটি কমান্ডারের কাছে জমা দিলাম। সুমাইয়া তার সাইলেন্সারযুক্ত রিভলবারটি কমান্ডারের হাতে তুলে দিয়ে বললো, এটি ভাইজানের একটি প্রিয় অস্ত্র। আমাকে বাড়ির নিরাপত্তার জন্য দিয়েছিলেন। তার তো আর দরকার নেই। মেহেরবানী করে এটি আবদুল ওয়াহেদ ভাইকে দিয়ে বলবেন যেন ভাইজানকে পৌঁছে দেন।

কমান্ডারের মুখটা বেদনায় কালো হয়ে এলো। কানে কানে আমাকে বললেন, শেখ ওসামার শাহাদাতের খবর সুমাইয়া জানেনি তাহলে?

বললাম, জি না, এই মুহূর্তে জানানোটা উচিত মনে করিনি। মাকে হারিয়ে বেচারী বেশ আঘাত পেয়েছে। এই মুহূর্তে আরেকটা প্রচণ্ড আঘাত সইতে পারবে না, তাই।

এবার কমান্ডার সুমাইয়াকে বললেন, ধরুন, দীর্ঘ দিন যদি ওয়াহেদ ভাইয়ের সাথে আপনার ভাইজানের দেখা না হয়?

জবাবে সুমাইয়া বেশ প্রত্যয়ের সাথেই বললো, আমার জানামতে ওনারা একই সেক্টরে প্রায় কাছাকাছি অবস্থান করেন। আমার বিশ্বাস অবশ্যই তাঁদের দেখা হবে।

হ্যাঁ, দেখা তো একদিন না একদিন অবশ্যই হবে। কিন্তু কোন কারণবশত যদি সেটা বিলম্বিত হয়? কমান্ডারের কণ্ঠ কেমন ধরে আসছিল।

সুমাইয়া কিছুটা বিস্ময়ের সাথেই বললো, এটি ইচ্ছা করলে ওয়াহেদ ভাই-ই ব্যবহার করতে পারেন। কমান্ডিং পর্যায়ে তো ভাইজানের পরই ওনার স্থান। ভদ্রলোক আমাদের বেশ উপকার করেছেন। তিনি ভাইজানের খুবই প্রিয় বন্ধু।

কমান্ডারের চোখের কোণে সম্ভবত অশ্রু জমে ওঠেছে। তিনি অন্যদিকে ঘুরে সুমাইয়ার চোখে যাতে না পড়ে তেমন করে চোখ দুটি মুছে নিয়ে কণ্ঠ স্থির রেখে স্মিত হাস্যে বললেন, অবশ্যই এটি ভাই আবদুল ওয়াহেদের হাতে পৌঁছে যাবে। তারপর দু'জনকেই গাড়িতে তুলে দিয়ে আল বিদা বলে বিদায় সম্ভাষণ জানালেন।

ভাঙ্গাচুরা পাহাড়ি উঁচু নিচু রাস্তা দিয়ে গাড়ি চলতে শুরু করলো। আমাদের বাম পাশে কিছুটা দূরেই বিখ্যাত সিন্ধু নদ। ছড়ানো ছিটানো বাড়ি ঘরের মাঝ দিয়ে এই কাঁচা রাস্তাটি চলে গেছে। মাঝে মাঝে বেশ ঝাঁকুনি লাগে।

গাড়ির ড্রাইভার নিজেও একজন মুজাহিদ। কমান্ডার বলে দিয়েছেন অন্তর প্রদেশের ভেতর দিয়ে মোজাফ্ফরাবাদ পৌঁছে ইসলামাবাদের জন্য ট্যাক্সি ভাড়া করে যেন উঠিয়ে দিয়ে আসেন।

ড্রাইভার কমান্ডারকে আশ্বস্ত করার জন্য বললেন, চিন্তা করবেন না, ইনশাআল্লাহ আমি গাড়ি ভাড়া করে তুলে দিয়েই আসবো।

ড্রাইভার বেচারার চেহারাটা ভালো করে দেখার সুযোগ হয়নি তখনও। কিন্তু গাড়ি চালাচ্ছেন বেশ। রাস্তা তার খুবই পরিচিত মনে হলো। এমন বন্ধুর পথ, তবু বেশ শৈল্পিক তার গাড়ি চালনা। গাড়ির চেহারা খারাপ হলেও চলছে যেন নতুন গাড়ির মতোই নিঃশব্দে, মসৃণভাবে। বেশ কিছুক্ষণ পর গাড়ি বাম দিকে মোড় নিল। এবার ড্রাইভার পেছনের দিকে এক নজর তাকিয়ে বললো, আমরা অন্তর প্রদেশে প্রবেশ করেছি একটু আগেই।

আমি বললাম, রাজধানী শ্রীনগর তাহলে আমাদের বাম দিকে পড়বে, তাই না?

ড্রাইভার বললো, হ্যাঁ, তবে দেরি আছে। জানেন, যদি শ্রীনগর হয়ে মোজাফ্ফরাবাদ যাওয়া যেতো, তাহলে অন্তত তিন ভাগের একভাগ সময় কম খরচ হতো।

বললাম, আসার সময় শ্রীনগর হয়ে না আসলেও এই রাস্তা দিয়ে তো আসিনি।

সে জানালো, শ্রীনগরের উত্তর দিকে আরেকটা রাস্তা আছে, যেটি দিয়ে আপনাদের নিয়ে আসা হয়েছিলো। সেটি আমাদের জন্য মোটেও নিরাপদ নয়। তাই একটু ঘুরে হলেও আযাদ কাশ্মীর হয়েই আমরা যাবো।

দেখতে দেখতে সূর্যটা বেশ উষ্ণ হয়ে ওঠলো। এতক্ষণের শীত শীত ভাবটা কেটে গেছে। তবে শরীরটা বেশ ম্যাজম্যাজ করছে, মাথাটাও একটু যেন ঝিমঝিম করছে।

গ্রামের পথ দিয়ে ছুটে চলেছে গাড়ি। বাংলাদেশে এখন বসন্তের বিদায় লগ্ন। নিশ্চয়ই বাংলাদেশের গ্রামে এখন পলাশ ও শিমুল বনে আগুন লেগেছে। এখানেও প্রকৃতির মধ্যে উদাস ভাব লক্ষ্য করলাম। কাচটা একটু নামিয়ে বাইরে দৃষ্টি বুলালাম। এখন রাস্তায় মানুষজনও চোখে পড়ছে। বাচ্চারা দল বেঁধে মক্তবে যাচ্ছে। কোথাও বা অপরিচিত কোন খেলায় মত্ত শিশু-কিশোরদের চোখে পড়লো। তারা 'মুজাহিদ ও শত্রু' খেলাটাই বেশি খেলে। কারগিলের গ্রামেও এ দৃশ্য আমার চোখ এড়ায়নি। শিশুদের খেলার উপকরণ খেলনা পিস্তল, রিভলবার ইত্যাদি। একদল থাকে মুজাহিদ অন্যদলে ভারতীয় সৈন্য। ভারতীয় সৈন্যকে তারা দুশমন দল নাম দেয়। তারপর শুরু হয় বিভিন্ন কৌশলে শুয়ে হাঁটু গেড়ে বসে, গাছ বা পাথরের আড়ালে দাঁড়িয়ে আক্রমণ, ফায়ার ফায়ার খেলা। বলাই বাহুল্য, এসব খেলায় সব সময়ই হানাদার বা তাদের ভাষায় দুশমন দল হেরে যায়। তারপর সমস্বরে উল্লাস প্রকাশ করে তারা। সমগ্র কাশ্মীর অঞ্চলের মুসলিম ঘরের সন্তানদের খেলাধুলাসহ সব কিছুতেই যুদ্ধের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়।

তারা শৈশব থেকেই জেনে আসে, তাদের মাতৃভূমি সাম্রাজ্যবাদী হায়েনারা জবরদখল করে আছে। কেউ বা জন্মই নেয় এতিম হয়ে। তারা জানতে পারে জন্মের আগেই তাদের জনক আযাদীর জন্য লড়াই করতে গিয়ে হানাদারদের হাতে জীবন দিয়েছে। ফলে এ অঞ্চলের শিশুদের খেলাধুলা থেকে শুরু করে সকল কর্মকাণ্ড, ধ্যান-জ্ঞান একমাত্র লড়াইকে কেন্দ্র করেই।

বাইরে ঝিরঝিরে বাতাস। নির্ঘুম রাত কাটানো, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, কষ্টকর সফর। সবকিছু মিলে শরীরটা অবসন্নতায় আচ্ছন্ন। ক্লান্তিতে নেতিয়ে পড়লো দেহটা। সিটে হেলান দিয়ে বসে ছিলাম। কিছুটা শীত শীত লাগায় কাচ নামিয়ে দিলাম। সুমাইয়া বার দুয়েক আমার দিকে তাকিয়ে চোখ বন্ধ করে বসে রইলো। সে ঘুমিয়ে আছে কি জাগ্রত, বোঝার উপায় নেই। সকালের বাসি ফুলের পাপড়ির মতোই মলিন তার মুখাবয়ব। আমার শরীরটা ক্রমেই যেন খারাপের দিকে যাচ্ছিল। এর মধ্যে মাথা ধরাটাও বেড়েছে। তবে ব্যথা আগের মতো মনে হচ্ছে না। আমিও চোখ বন্ধ করে রিলাক্স হতে চেষ্টা করলাম। ফল হলো না, চোখ জ্বলতে লাগলো।

এ সময় ড্রাইভার নিমিষের জন্য পেছনের দিকে তাকিয়ে বললো, ভাই, আমরা এখন শ্রীনগরের সমান্তরালে অবস্থান করছি। এখান থেকে সোজা বাম দিকে গ্রীষ্মকালীন রাজধানী শ্রীনগরের অবস্থান। এই প্রথম দিনের আলোতে ড্রাইভারের মুখ দেখলাম। তাকে যতটা কম বয়সী ভেবেছিলাম ততটা কম বয়স তার নয়। চল্লিশের কাছাকাছি বয়স হবে বলে অনুমান করলাম। শ্মশ্রুমণ্ডিত লম্বা পাগড়ি ও কাবুলি ড্রেসে তাকে যথার্থই একজন মুজাহিদ মনে হচ্ছিল। তাকে এতক্ষণ যেন অবহেলাই করছিলাম। ভালো করে দেখার পর কিছুটা শ্রদ্ধা যেন বেড়ে গেলো আমার।

বললাম, মোজাফ্ফরাবাদ পৌঁছতে আর কতক্ষণ লাগবে ভাই?

জবাবে বললো, আমরা তিন ভাগের দুই ভাগ রাস্তা এসে গেছি। এখন তো রাস্তা তুলনামূলক ভালো, দুই আড়াই ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাব ইনশাআল্লাহ।

মোজাফ্ফরাবাদ যখন পৌঁছলাম তখন মধ্য দুপুর। মোটামুটি মানের একটি শহর। একটা রেন্ট-এ কার সেন্টারের কাছে আমাদের গাড়ি থামলো। গাড়ির বাম পাশে বসায় আমাকেই আগে নামতে হলো। বাইরে ঠা ঠা রোদ্দুর। বেশ তাপ আছে রোদের। গাড়ি থেকে নামতেই চোখে অন্ধকার দেখলাম। খোলা চোখে রোদ লেগে জ্বালা ধরে গেল। কপালের দু'পাশে চোখের উপরিভাগে প্রচণ্ড ব্যথা। শরীরে রোদের তাপ লেগে বেশ আরাম লাগছিল, কিন্তু চোখ মেলে তাকাতে পারছিলাম না। মনে হচ্ছিল রাস্তায়ই শুয়ে পড়ি।

আমার পেছনে পেছনে সুমাইয়াও নেমে এলো। ড্রাইভার ব্যাগ দুটি নামিয়ে রাস্তার পাশে রেখে দিলে আমি সেখানেই বসে পড়লাম। আমার খারাপ লাগছে কিনা জিজ্ঞেস করতে করতে গায়ে হাত দিয়ে ড্রাইভার ভদ্রলোক চমকে ওঠলো। বললো, ইস্! গায়ে তো প্রচণ্ড জ্বর।

সুমাইয়াও আমার কাছে এসে তার ঠাণ্ডা হাতটি আমার উষ্ণ ললাটে স্থাপন করে বললো, আমাকে বলেননি কেন, জ্বরে তো গা পুড়ে যাচ্ছে!

ড্রাইভার জানতে চাইলো, হাসপাতালে নিয়ে যাবো?

কষ্টজড়িত কণ্ঠে বললাম, না ভাই, তার দরকার নেই। ব্যাগে প্যারাসিটামল ট্যাবলেট আছে, দুটো খেয়ে নিলে ঠিক হয়ে যাবে। আপনি বরং একটা ট্যাক্সি ভাড়া করে দিন, চিকিৎসা করাতে হয় ইসলামাবাদ গিয়েই করাবো।

ড্রাইভার বললো, আপনি বরং গাড়িতেই একটু গা এলিয়ে দিন, আমি কিছু খাবার আর ওষুধ নিয়ে আসি।

বললাম, না ভাই, এখানেই ভালো লাগছে। মনে মনে ভাবলাম, গাড়িতে ওঠা নামা এবং আবার অন্য গাড়িতে ওঠার চেয়ে এখানে বসে থাকাই ভালো।

সুমাইয়া ব্যাগের পকেট থেকে টাকা বের করে দিয়ে বললো, দুটি দুই লিটারের পানির বোতল আনবেন, সম্ভব হলে একটা ঠাণ্ডা। ড্রাইভার টাকা নিতে অসম্মতি জানালেও সুমাইয়ার পীড়াপীড়িতে নিতে হলো।

অল্পক্ষণ পরই ফিরে এলো ড্রাইভার। হাতে পানির ক্যান, কিছু খাবার, ফলমূল ও ওষুধ। পাশের চা স্টল থেকে একটা খালি বেঞ্চ বয়ে আনলো। সেখানে শুইয়ে দিল আমাকে। সুমাইয়া এক বোতল ঠাণ্ডা পানি দিয়ে আমার মাথা ভালো করে ধুয়ে দিলো। সত্যিই তখন আমার বেশ আরাম লাগছিল। মুখে ব্যর্থ হাসির ভাব ফুটিয়ে বললাম, আমি এখন পুরো সুস্থ, একটা ট্যাক্সি নিয়ে আসুন, আর অপেক্ষা ভালো লাগছে না।

সুমাইয়া মুখে তুলে তুলে কিছু খাওয়াচ্ছিল আমাকে। খুব বিস্বাদ লাগছিল সব। কিন্তু কিছু না খাইয়ে ওষুধ খেতে দেবে না বলে জিদ ধরলো সুমাইয়া। সামান্য কিছু গলাধকরণ করে দুটো ট্যাবলেট গিলে ফেললাম পানি দিয়ে। বললাম, তুমিও কিছু খেয়ে নাও সুমাইয়া।

ড্রাইভার ট্যাক্সি ভাড়া করতে চলে গেলো। সুমাইয়া বললো, খেতে ইচ্ছে করছে না।

আমি বুঝি, তারও শরীর দুর্বল এবং খারাপ লাগারই কথা। ড্রাইভার ফিরে এলো ট্যাক্সি নিয়ে। আমি বললাম, ভাই, আমাদের কাছে বসে আপনিও কিছু খান।

অনেক কষ্ট দিলাম আপনাকে। জীবনে হয়তো আর কোনদিন দেখা হবে না, কিন্তু আপনাদের কথা মনে থাকবে চিরদিন।

আমার কথা শুনে বিষণ্ন করুণ চোখে তাকালো সুমাইয়া আমার দিকে। আমি দৃষ্টি নামিয়ে নিলাম। ড্রাইভার যেন লজ্জা পেলো। বললো, আমি কিই বা এমন করলাম! এরপর কাছে বসে কিছু খাবার মুখে পুরে বললো, আযাদীর জন্য আমাদের এত কুরবানী কি বৃথাই যাবে ভাই সাহেব!

আমি তার মুখের দিকে তাকাতে পারলাম না। নিজের চোখে দেখে এলাম নিজ ভূমি থেকে হানাদারদের উৎখাতে তাদের প্রাণপণ প্রচেষ্টা। আশ্বাসের সুরে বললাম, পৃথিবীর কোন ইতিহাসেই স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝরা রক্ত বৃথা যায়নি ভাই। ইনশাআল্লাহ, আপনারাও একদিন স্বাধীন হবেন। আমার দুর্বল হাতটি তার কাঁধে রেখে বললাম, আস্থা হারাবেন না, বিশ্বের প্রতিটি মুসলমানের দোয়া আপনাদের সঙ্গে আছে। এবার আমাদের এজাযত দিন।

সবাই ওঠার প্রস্তুতি নিলে আমি আমার জামার পকেটে হাত ঢুকালাম। সুমাইয়াদের বাড়িতে অস্ত্র বাবদ তোহফা হিসেবে দেয়া মুজাহিদ ভাইয়ের সমুদয় অর্থ মুঠ ভর্তি করে ড্রাইভারের হাতে দিয়ে বললাম, এই সামান্য অর্থ মেহেরবানী করে কবুল করুন। এটা আপনার পারিশ্রমিক নয়, আমার পক্ষ থেকে উপহার।

ড্রাইভার প্রায় আর্তনাদ করে উঠে বললো, এমন কথা মুখেও আনবেন না, আপনি আমাদের সম্মানিত মেহমান। আমাদেরই উচিত আপনাকে কিছু তোহফা দেয়া। আমি কেবল কমান্ডারের নির্দেশ পালন করছি, আপনাদের জন্য তো কিছুই করতে পারিনি।

বললাম, এখান থেকে কিছুই যদি গ্রহণ না করেন তো আমি মনে ভীষণ কষ্ট পাবো।

ভদ্রলোক ভালো করে তাকালো আমার দিকে। তারপর মাত্র একশ' রুপির একটা নোট রেখে বললো, স্রেফ আপনাকে খুশি করার জন্যই এটা গ্রহণ করলাম। আমাদের জন্য দোয়া করবেন।

আমরা ট্যাক্সিতে উঠে বসলাম। ড্রাইভারকে ইসলামাবাদে আমি যে হোটেলে উঠেছিলাম সেই হোটেলের নাম বললাম। ট্যাক্সিচালক বললো, আমি চিনি, অসুবিধা হবে না। আল বিদা বলে মুজাহিদ ড্রাইভারের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। পেছন ফিরে দেখি যতক্ষণ না আমাদের গাড়ি তার দৃষ্টিসীমার বাইরে এলো, ততক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে চেয়ে রইলো আমাদের গাড়ির দিকে।

জ্বর কিছুটা কমেছে। কিন্তু ক্লান্তিতে সিটে হেলান দিয়েও বসে থাকতে পারছিলাম না। বারবার আমার মাথা এদিক সেদিক হেলে পড়ছিল। শুয়ে পড়তে ইচ্ছে

করছে। সত্যিই শরীর এতটাই নিস্তেজ ও অবশ লাগছিল যে, নিজেকে ধরে রাখা আর সম্ভব হচ্ছিল না। আমি যেন অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিলাম। এরপর দীর্ঘক্ষণ আর কিছু মনে নেই।

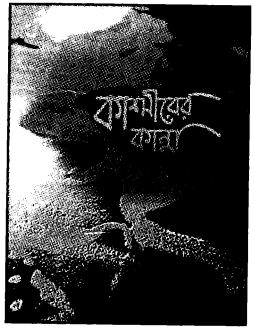
তারপর যখন জ্ঞান ফিরলো তখন অনুভব করছিলাম, আমার কপালে জলপট্টি দেয়া হয়েছে এবং সুমাইয়া একটু পর পর হাতের আঙ্গুল দিয়ে পট্টিটা ভিজিয়ে দিচ্ছে। আমি হয় জ্ঞান হারিয়েছিলাম অথবা ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। এ অবস্থায়ই একটা স্বপ্নও দেখে ফেলেছি। দেখলাম, সুমাইয়াকে আমি শাদী করে ঢাকায় নিয়ে গেছি। আম্মা প্রথমে একটু অসন্তুষ্ট ভাব দেখালেও সুমাইয়ার রূপ-গুণের পরিচয় পেয়ে খুব খুশি হলেন। তাকে পরম স্নেহে মায়ের আদরে ভরিয়ে দিলেন। আমার আর সুমাইয়ার মাঝে যেন গভীর ভালোবাসার জন্ম হয়েছে। আমার চেতনা ফেরার পরও এই রেশটা মনের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ জেগে রইলো। ভাবতেও আমার বেশ ভালো লাগছিল। আস্তে আস্তে চোখ মেলে চাইলাম। দেখি, আমার মাথা সুমাইয়ার কোলে। এতটুকুন সিট ট্যাক্সির। তাতেই হাঁটু ঝুলিয়ে আড়াআড়িভাবে শুইয়ে রেখেছে আমাকে। কপালের জলপট্টিটায় আঙ্গুল দিয়ে পানির ফোঁটা দিচ্ছিল সুমাইয়া। এবার সরাসরি চোখ পড়লো সুমাইয়ার চোখে। চলন্ত গাড়ির মৃদুমন্দ ঝাঁকুনিতে আমার দু'চোখের কোণ বেয়ে দু'ফোঁটা তপ্ত অশ্রু গড়িয়ে পড়লো অকারণে।

নিজের ওপর বড্ড রাগ হচ্ছিল। শরীর ও মনের ওপর কম ধকল যায়নি সুমাইয়ার। এ অবস্থায়ও চলন্ত গাড়িতে নিজের কোলের ওপর আমার মাথা কত সময় ধরে রেখে নীরবে নার্সিং দিয়ে যাচ্ছে সে। আমার তো কোন নিকট আত্মীয়ও সে নয়। তবে কিসের জন্য সে এই শুশ্রূষা করে চলেছে? আস্তে করে উঠে সিটে হেলান দিয়ে বসলাম।

সুমাইয়ার আনত দৃষ্টি। গায়ের সাথে জড়ানো বড় ওড়নার প্রান্তটা অকারণ ডান হাতের শাহাদত আঙ্গুলে প্যাঁচাতে প্যাঁচাতে বললো, এখন কি একটু ভালো লাগছে?

আমার চোখ পানিতে ঝাঁপসা। অন্যদিকে ফিরে বললাম, হ্যাঁ! তুমি এতটা কেন করতে গেলে?

সে বললো, আপনি যে জন্য আমাকে করেছিলেন। তারপর নীরবতা। আর কোন কথা হয়নি দীর্ঘক্ষণ। গাড়ি ইসলামাবাদে প্রবেশ করেছে।



একুশ

ইসলামাবাদ এসে হোটেলে যখন ওঠলাম তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে। সুমাইয়ার সাথে পরামর্শ করেই ডাবল রুম বুকিং দিলাম। দুটি সিঙ্গেল বেড, এটাচ বাথ, সোফা, টেলিফোন, টেলিভিশন সবই আছে। কাশ্মীর যাবার আগে এই হোটেলেই আমি ক'দিন কাটিয়ে গেছি। পূর্বপরিচিত হোটেল বয় আমাকে দেখে চিনে ফেলল। কাছে এসে সালাম দিয়ে বললো, স্যার, আপনার কি অসুখ করেছে? আপনার যা প্রয়োজন হয় আমাকে বলবেন স্যার! আমি সব করে দেব।

মৃদু হেসে বললাম, আমাকে কি রোগীর মতো দেখা যায়?

জবাবে সে বললো, আপনার স্বাস্থ্য খুব খারাপ দেখাচ্ছে স্যার।

বললাম, হ্যাঁ, লম্বা জার্নি করেছি। তাছাড়া শরীরও খুব ভালো নয়। তুমি আমাদের জন্য কিছু খাবার নিয়ে এসো। বলে টাকা বের করে দিলাম। ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেলো।

রুমে ঢুকেই সুমাইয়া বাথরুমে গেলো। বের হলো একেবারে গোসল সেরে। টাওয়ালে জড়ানো তার লম্বা কালো কেশের একটা পোটলা মাথায় শোভা পাচ্ছিল। তার পোশাক এতটাই শালীন যে, কেবল মুখমণ্ডল ছাড়া সমগ্র শরীর ঢাকা। টিউব লাইটের আলোতে গোসলের পর সুমাইয়ার মুখখানা আরও কমনীয় দেখাচ্ছিল। কোন প্রসাধনীর বালাই নেই। লাল টুকটুকে ঠোঁট জোড়া ঈষৎ ফাঁক

করে মৃদু স্বরে আমাকে বললো, এখানে গরম পানির ব্যবস্থা আছে। ইচ্ছে করলে গোসল করুন। তা না হলে ঠাণ্ডা পানিতে টাওয়েল ভিজিয়ে শরীরটা ভালো করে মুছে নিন।

এরই মধ্যে হোটেল বয় খাবার নিয়ে এলো। সুমাইয়া ছেলেটির কাছ থেকে কেবলার দিক সঠিক জেনে নিল।

আমি বাথরুমে ঢুকে ওযু করে ভিজা গামছায় শরীরটা ভালো করে মুছে নিলাম। জ্বর না থাকলেও ক্লান্তি লাগছিল। বাথরুম থেকে বের হয়ে দেখি বাম পাশের খাটের স্ট্যান্ডের সাথে কম্বল দিয়ে পর্দা টানিয়ে নিয়েছে সুমাইয়া। সম্ভবত নামায পড়ছিল, তাই আমি উঁকি দিইনি। রুমের দক্ষিণ দিকে উঁচু রেলিং দেয়া এক চিলতে বারান্দা। আমি সেখানে দাঁড়িয়ে নিস্তেজ রোদের আরামদায়ক তাপ উপভোগের পাশাপাশি শহরের ব্যস্ততা দেখছিলাম। সুমাইয়া বেরিয়ে এসে বললো, খাবার দিয়ে গেছে, খাবেন না?

বললাম, হ্যাঁ, চলো।

রুমে এসে বললাম, তুমি খাবারটা সাজাও, আমি নামায পড়ে নিই।

খাবার যা আনা হয়েছে তার সামান্যই খাওয়া হলো। কলিংবেল টিপলে বেয়ারা এলো। বললাম, এগুলো নিয়ে যাও, আমরা এখন ঘুমুবো। প্রয়োজন হলে তোমাকে ডাকবো, ঠিক আছে?

বেয়ারা ঘাড় কাত করে চলে গেলো।

পর্দা দেয়া খাটে সুমাইয়া চলে গেলে আমিও আমার বেডে শুয়ে পড়লাম। শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম আইবিএ'র অফিসে যোগাযোগ করবো কি না। কিন্তু পরক্ষণেই সুমাইয়ার কথা চিন্তা করে ভাবলাম, একটা দিন জিরিয়ে দু'জনেই একটু সুস্থ হয়ে নিই। ওদের খবর দিলেই যে অতি আপ্যায়ন ও যত্ন করতে গিয়ে শান্তি ব্যাহত করবে তাতে আমার সন্দেহ নেই। এসব ভাবতে ভাবতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়লাম।

কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম ঠিক জানি না। ঘুম যখন ভাঙলো তখন শরীরে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করছি। মাথাও কেমন জ্যাম হয়ে আছে। চোখ বন্ধ রেখেই টের পাচ্ছিলাম কপালে জলপট্টি। গায়ের সামনের দিকে কম্বল নেই, বুকে কে যেন ঠাণ্ডা কি চেপে ধরে ধরে পরীক্ষা করছিল। চোখ মেলে দেখি সাদা এ্যাপ্রোন পরিহিত এক ডাক্তার আমার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে বুকে টেথিস্কোপ ধরে

আছে। ডাক্তারের চোখে চোখ পড়তেই আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, এখন কেমন বোধ করছেন?

আমি কিছুটা বিস্ময় বিহ্বল চোখে এদিক সেদিক তাকালাম। দেখি শিয়রের দিকে বসা সুমাইয়া এবং পাশেই হোটেল বয়। বললাম, শরীরে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করছি।

ডাক্তার বললেন, ভাববেন না, সব ঠিক হয়ে যাবে। এরপর তিনি আমার বগলের নিচ থেকে থার্মোমিটার বের করে ঝাঁকি দিয়ে দিয়ে টেম্পারেচার দেখলেন। চোখ ও জিহ্বা দেখে নিয়ে সাদা কাগজের ডাক্তারি প্যাডে কয়েকটি ওষুধের নাম লিখে সুমাইয়ার হাতে দিলেন। বললেন, রাতে ওষুধ খাওয়ান, আশা করি ঠিক হয়ে যাবে। সমস্যা হলে সকালে আমাকে জানাবেন। নিচে কাছেই আমার চেম্বার।

আমি সুমাইয়ার দিকে চোখ ফেরালাম। সে উঠে ডাক্তারের ভিজিট দিলো এবং বেয়ারাকে প্রেসক্রিপশন ও টাকা দিয়ে ওষুধ আনতে পাঠালো।

নিজের ওপর প্রচণ্ড রাগ হচ্ছিল আমার। বারবার অসুস্থ হয়ে এভাবে অন্যদের কষ্ট দেয়ার জন্য নিজেকে বেশ ছোট মনে করছিলাম। সুমাইয়ার কাজল টানা ডাগর চোখ জোড়া ফোলা ফোলা দেখাচ্ছিল। বেচারী আমার জন্য নিশ্চিন্তে একটুখানি ঘুমাতেও পারলো না। না জানি জ্বরের ঘোরে আমি কত কি প্রলাপ বকেছি, যে কারণে সুমাইয়াকে ডাক্তার ডেকে আনতে হয়েছে। আমি লজ্জিত হয়ে সুমাইয়াকে বললাম, দুঃখিত সুমাইয়া! তোমাকে যথেষ্ট কষ্ট দিচ্ছি। কিন্তু ডাক্তার ডাকার দরকার কি ছিল?

উল্টো অনুযোগের সুরে বললো সুমাইয়া, এভাবে পড়ে পড়ে ভুগবেন, কাউকে কিছু বলারও প্রয়োজন মনে করেন না। কেন, আপনার তো নিজের প্রতি এতটা অবহেলা সাজে না? আমি না হয় আপনার কেউ নই, তাই বলে ডাক্তার না দেখিয়ে ওষুধ না খেয়ে এভাবে নিজেকে কষ্ট দেবার কারণ কি?

বললাম, আসলে শোবার সময় জ্বর ছিল না গায়ে। তাছাড়া ডাক্তার দেখানো কি খুবই জরুরি ছিল?

সুমাইয়ার মুখে এবার রাগের ছায়া ফুটে ওঠলো। বললো, একশ' তিন ডিগ্রি জ্বর নিয়ে আপনি আবোল-তাবোল বকছিলেন। আমার ঘুম না ভাঙলে সারা রাতে অবস্থা কি দাঁড়াতো আল্লাহই জানেন। মাথায় পানি দিতে দিতে কিছুটা অস্থিরতা কমেছে। তাই বেয়ারাকে দিয়ে ডাক্তার ডেকে আনলাম। এখন কিছু খেয়ে ওষুধ

খেয়ে শুয়ে পড়ুন। আমি যখন থাকবো না তখন না হয় আপনার মতো করেই আপনি থাকবেন?

সুমাইয়ার শেষ কথাটা যেন তীরের ফলার মতো আমার অন্তরকে খোঁচা দিল। চোখ তুলে তাকালাম তার মুখের দিকে, অভিমানী করুণাকাতর নিষ্পাপ মুখ। কি যে ভালো লাগছিল আমার। এই বিদেশ বিভূঁইয়ে যেখানে আপনজন বলতে আমার কেউ নেই, এই কুমারীর সেবা-যত্ন বার বার আমাকে সারিয়ে তুলতে সহায়তা করেছে। একান্তই আপনজনের মতো আন্তরিকতাপূর্ণ এই শুশ্রূষা আমাকে মুগ্ধ করলো। আমার ভালো-মন্দের চিন্তা করে সে পেরেশান হয়, এটা কি কেবলই একজন মানুষের প্রতি অন্য একজন মানুষের কর্তব্যবোধের দায় থেকেই, নাকি একবার তার ভাইকে এবং আর একবার তাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানোর কৃতজ্ঞতাবোধ থেকে। কি জানি এভাবেই হয়তো মানুষ পৃথিবীতে একে অন্যকে আপন করে নিতে শিখেছে। একে অন্যের প্রয়োজনে সহায়ক হবে, বিপদে-আপদে, সুখে-দুঃখে একজন আরেকজনের সাথে শেয়ার করবে, এই প্রকৃতি দিয়েই হয়তো মহান আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আর এ থেকেই জন্ম নেবে একের প্রতি অন্যের ভালোবাসার।

আমি চেয়েই ছিলাম সুমাইয়ার দিকে। চোখ নামিয়ে এবার সে বললো, এভাবে চেয়ে কি দেখছেন? কিছু কি বলবেন?

আবেগভরে বললাম, সুমাইয়া! তুমি খুব ভালো মেয়ে। তোমার মতো ভালো মেয়ে আমি আর একটিও দেখিনি।

সুমাইয়া হাতখানি ছাড়িয়ে নিতে চাইলে আমি ছেড়ে দিলাম। অকারণে চোখের কোণ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো গালে। সুমাইয়া কপালের জলপট্টিটা ভেজাতে গেলে সামান্য পানি চোখে পড়ে চোখের পানির সাথে মিশে একাকার হয়ে গেলো।

সুমাইয়ার পীড়াপীড়িতে ওষুধের আগে কিছু খাবারও খেতে হলো। নিজে বিছানায় শুয়ে তাকেও শুয়ে পড়তে অনুরোধ করলাম। সুমাইয়া চলে গেলে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি রাত বারটা বেজে গেছে। ডিম লাইট আগেই জ্বলা ছিলো, বেড সুইচটা অফ করে দিয়ে কম্বলটা জড়িয়ে নিলাম ভালো করে। শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম সুমাইয়ার কথা। মাকে হারিয়ে এখন সে কতই না নিঃসঙ্গ। একমাত্র ভাই, তিনিও শহীদ হয়েছেন। অথচ সে এখনও জানেই না সে কথা। নিজের বাড়ি-ঘর ছেড়ে চলে এসেছে মামার বাড়ি থাকবে বলে। রূপে-গুণে অনন্যা এমন একটি মুসলিম তরুণী, কতটা অনিশ্চয়তার জীবন তার। হায়, সে যদি আমার

সাথে চলে যেতো, আমি তাকে জীবনসঙ্গী করে আজীবন মর্যাদার আসনে রাখতাম। আমার আম্মাও তাকে পেয়ে নিশ্চয়ই খুব খুশি হতেন। এমন একজন আল্লাহভীরু, রূপে গুণে অনন্যা বধূ পাওয়া সত্যিই ভাগ্যের ব্যাপার। এমন সব ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়লাম টেরই পাইনি।

রাতে ঘুমের ঘোরে আবার সেই স্বপ্নটা দেখলাম, যা মোজাফ্ফরাবাদ থেকে ট্যাক্সিতে করে আসার সময় দেখেছিলাম। ঘুম ভাঙ্গার পরও স্বপ্নের আবেশ লেগে রইলো আমার মনে প্রাণে। আশ্চর্য এক ভালোলাগার অনুভূতিতে মনটা আমার ভরে রইলো দীর্ঘক্ষণ। মনের কোন গভীরে যেন সুমাইয়া বেশ শক্ত আসন গেড়ে বসে আছে। তাকে ছাড়া আমার এ জীবন যেন অর্থহীন মনে হচ্ছিল। অথচ মুখ ফুটে বলতে পারছিলাম না কারো কাছেই সে কথা। একেই কি তাহলে ভালোবাসা বলে, একেই কি বলে প্রেম? আমি কি সত্যিই তার প্রেমে পড়ে গেছি? হে প্রভু, তাই যেন সত্যি হয়। পুরুষ একজন নারীর কাছ থেকে যতটুকু প্রত্যাশা করতে পারে তার সবটুকুই যেন সুমাইয়ার মাঝে বিধাতা অকৃপণ হাতে দিয়ে রেখেছেন। এই প্রথম আমি যেন অনুভব করলাম পুরুষের জীবনে নারীর অংশগ্রহণ কতটা অর্থবহ।

খাটের পাশে বালিশে হেলান দিয়ে এসব ভাবছিলাম। এমন সময় সুমাইয়া এলো। মিষ্টি হাসি দিয়ে সম্ভাষণ জানাল। মনে হয় অনেক আগেই ঘুম থেকে উঠেছে সে। তাকে বেশ সজীব দেখাচ্ছিল। গত দু'দিনের ক্লান্তির ছাপ যেন মুছে গেছে। খাটের কাছে সোফায় বসে জিজ্ঞেস করলো, এখন কি কিছুটা সুস্থ বোধ করছেন?

বললাম, হ্যাঁ, মনে হচ্ছে পুরোপুরিই সুস্থ হয়ে গেছি। তোমার এই কষ্টকর শুশ্রূষা দেখে অসুখ পালিয়ে বেঁচেছে।

আমার কথায় সুমাইয়ার ফর্সা মুখটা লজ্জায় লাল হয়ে ওঠলো। বললো, উঠে নাশতা পানি করে ওষুধটা খান। আজই আমাকে ছুটি দিতে হবে। আপনার সাথে এভাবে হোটেলে থাকাটা ঠিক না।

আমি কিছু বলতে যাচ্ছিলাম, তার আগেই সে বললো, আপনার অফিসে যোগাযোগ করুন এবং দেশে ফেরার আগেই ভালো একজন ডাক্তার দেখিয়ে ট্রিটমেন্ট করে যাবেন।

আমাকে নিয়ে তুমি এতটা পেরেশান হও কেন বলো তো? সামান্য একটু জ্বর হয়েছে, তা ভালোও হয়ে গেছে বলে মনে হয়।

নিজেকে নিয়ে ভাববার তো কিছু নেই, তাই অন্যের জন্য একটু ভাবতে ভালোই লাগে। আপনিই বলুন, জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে লড়াইরত একমাত্র ভাই ছাড়া কে আছে আমার, কি আছে আমার? যাকে নিয়ে ভাবা যায়?

সুমাইয়া! প্রায় আর্তনাদের মতো শোনালো আমার কণ্ঠস্বর। মনে মনে ভাবলাম আমি কি বলে দেব তার ভাইজানের শহীদ হওয়ার কথা। শুনে হয়তো কষ্টে তার বুকটা ফেটে যেতে চাইবে। সকালের এই সুন্দর পরিবেশটা হয়তো করুণ হয়ে ওঠবে তার যন্ত্রণাকাতর হাহাকারে। নিজেকে সামলে নিলাম আমি। বলতে তো আমাকে হবেই। তার আগে সে নিজেকে আরেকটু তৈরি করে নিক।

সুমাইয়া আমাকে এভাবে আর্তনাদ করে ওঠতে দেখে বিস্মিত হয়ে তাকালো আমার দিকে। মুহূর্তকয় চুপ থেকে আমাকে নীরব দেখে জিজ্ঞেস করলো, কিছু বলবেন?

আমিও অপ্রস্তুত হলাম। বললাম, হ্যাঁ বলবো, মানে সত্যিই তুমি আমাকে ফেলে চলে যাবে?

সে কিছুটা লজ্জিত হয়ে মুখ নিচু করলো এবং মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করে বললো, বাহরে, আমি আবার কোথায় চলে যাবো! আমি তো নিজের বাড়িঘর ছেড়ে হিজরত করে চলেই এলাম। আপনিই বরং চলে যাবেন নিজের দেশে।

বললাম, চলো না তুমিও আমার সাথে, আমাদের দেশে। সেখানে আমার মা আছেন, বোন আছে। তোমার কোন অমর্যাদা হবে না।

সুমাইয়া চমকে ওঠলো আমার কথায়। পরক্ষণেই বিষাদে ছেয়ে গেলো তার মুখ। হৃদয়ের গভীর থেকে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বললো, তা কি সম্ভব মাহমুদ সাহেব। আপনার দেশ তো আর ইসলামাবাদ নয় যে, ইচ্ছা করলেই চলে যাওয়া যাবে, আবার ফিরেও আসা যাবে।

আমি গভীর দৃষ্টি ফেলেছিলাম তার চোখে। তার চোখ আনত। বললাম, কেন সম্ভব নয়? সুমাইয়া, তোমার যদি আপত্তি না থাকে তো আমার জীবনের সফরসঙ্গী করে নিতে চাই তোমাকে। তুমি হবে আমার প্রেরণাদায়িনী। এতটুকু অমর্যাদা তোমার হতে দেব না সুমাইয়া। তোমার মাঝে মুসলিম নারীর যে অপূর্ব রূপ আমি প্রত্যক্ষ করেছি, তা কেবল ইসলামের প্রথম যুগের নারীদের বেলায়ই মিলে। তোমাকে সঙ্গী হিসেবে পেলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করবো।

সাহস করে কথা ক'টি আমি বলেছিলাম ঠিকই, কিন্তু কেমন যেন অজানা আবেগের আবেশ মাখানো কণ্ঠ আমার। অন্যদিকে সুমাইয়া লজ্জায় যেন জড়িয়ে যাচ্ছিল। তার মুখাবয়ব কেমন রাঙা হয়ে ওঠেছে। নিজেকে সামলে নিতে একটু সময় নিল সে। তারপর কণ্ঠে বেশ দৃঢ়তা এনে বললো, আবেগের বশে ছেলে মানুষী করছেন মাহমুদ সাহেব! অসহায় বিপন্না এক নিঃস্ব তরুণীকে আকাশসম স্বপ্নের দরজা দেখাচ্ছেন। আমার একটি ভাই আছে, যে স্বদেশের আযাদীর জন্য দুশমনদের সাথে ময়দানে লড়াই করছেন। পৌত্তলিক দখলদারদের কবল থেকে নিজ বাসভূমি মুক্ত করে যে ভাই খোদার রাজ কায়েমের জন্য জেহাদের ময়দানে লড়ে যাচ্ছেন, তার বোন হয়ে নিজের সুখ ও আয়াশ-আরামের জন্য দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার মতো ধৃষ্টতা আমি দেখাতে পারি না। আমাকে আপনি ক্ষমা করবেন, বলে অনেকটা দ্রুত পর্দার আড়ালে খাটে গিয়ে শুয়ে পড়লো।

শেষের দিকে তার গলার স্বর বেশ আর্দ্র হয়ে উঠেছিল। তবে তার কথায়ই এটা স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম, তার মধ্যে আমাদের দেশ সম্পর্কে হয়তো বা আমারই জন্য একটা আগ্রহ রয়েছে। আমার প্রস্তাবের ব্যাপারেও হ্যাঁ-নার একটা দ্বন্দ্ব তার মধ্যে কাজ করছে, তাও বুঝতে পারছি। আমি ক্যাবলা কান্তের মতো তার গমন পথের দিকে চেয়ে রইলাম।

দুপুরে গোসল করে যোহরের নামায পড়লাম। শরীর বেশ দুর্বল হলেও ভালোই লাগছিল। জ্বর আসেনি আর। ভাবছিলাম সুমাইয়াকে নিয়ে বাইরে কোন রেস্টুরেন্ট থেকে খেয়ে আসবো। এ সময় বেয়ারা দু'প্যাকেট কাশ্মীরী বিরিয়ানী নিয়ে হাজির। বললাম, এসব কে আনতে বলেছে?

বেয়ারা আমার দিকে তাকিয়ে জবাব দিল, ম্যাডাম। বুঝলাম সুমাইয়া আনিয়েছে। আমাদের কথা শুনে সুমাইয়া উঠে এসে বিরিয়ানীর প্যাকেট হাতে নিলে বেয়ারা বেরিয়ে যায়।

তুমি আবার খাবার আনাতে গেলে কেনো? বললাম সুমাইয়াকে।

প্যাকেট দুটি টিপয়ে রাখতে রাখতে জবাব দিল সুমাইয়া– খেতে হবে, তাই! কেন আপনি এখনও কিছু খাবেন না?

বললাম, খাব। তবে ভেবেছিলাম বাইরে গিয়ে খাব।

এখনও তো ভালো করে সেরেই ওঠেননি, বাইরে যাবার জন্য এত অস্থির হচ্ছেন কেন?

বললাম, খাবার জন্য বাইরে যাবার মতো সুস্থ তো হয়েছি।

সুমাইয়া পানির বোতল, গ্লাস ও খাবার সাজিয়ে একটি প্যাকেট নিয়ে ভেতরে চলে গেলো। বুঝলাম সে আমার সামনে বসে খাবে না। আমি ডাকিনি তাকে।

সকালে কথা বলার পর এবারই প্রথম সে আমার সামনে এলো। মনে মনে সে আমার ওপর বিরক্ত হয়েছে কি না বোঝা গেল না। আমি আমার খাটে শুয়ে আরও এক ঘণ্টা ঘুমিয়েছিলাম। তারপর ব্যক্তিগত ডাইরির শূন্য পাতাগুলোতে গত দু'দিনের ঘটনা টুকে নিলাম। খাওয়া শেষে আবারও বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। চোখ বন্ধ করে কাশ্মীর সফরের ওপর মূল স্টোরিটা সাজানোর কথা ভাবছিলাম। ফিল্মগুলো ডেভেলপ করে প্রিন্ট দেয়া দরকার। ভিডিও এডিট করে তারাই হয়তো কপি করে রাখবে। তার আগে কারেন্ট এফেয়ার্সের ওপর এক্সক্লুসিভ কয়টা আইটেম করে ফেলা দরকার। অফিসে যোগাযোগ না করে ছবি প্রিন্ট করা ঠিক হবে না। ঢাকায় টেলিফোন করে আজই মা ও বোনের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। শুয়ে শুয়ে এসব ভাবতে ভাবতে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ি। সুমাইয়া এক ফাঁকে এসে খাবার টেবিলটা পরিষ্কার করে গেছে।

শুয়ে শুয়ে আরও ভাবছিলাম, তৃতীয় বিশ্বের কোন দেশই পাশ্চাত্য কালচারের ছোবল থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখতে পারেনি। এই পাকিস্তানেও আমাদের দেশের মতো দু'ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু থাকায় মানুষের চিন্তা-চেতনা দু'টি ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়েছে। মাদরাসা শিক্ষায় শিক্ষিত একটা বড় অংশ কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক জীবন যাপন করতে প্রয়াস পায়। আবার জেনারেল শিক্ষিতরা বেড়ে ওঠে পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণায়। আর দুর্ভাগ্যবশত শাসন ক্ষমতা এই পাশ্চাত্য ধারায় শিক্ষিতজনদের হাতেই ঘুরে ফিরে চলে আসছে। ফলে খোদায়ী শাসনের পক্ষের শক্তির সাথে পাশ্চাত্য ধারার শাসকদের লড়াই এখানেও বেশ জোরালো। শাসন ক্ষমতা পাশ্চাত্য চেতনাধারীদের হাতে থাকায় সমাজ জীবনে এর প্রভাবই প্রকট। সামান্য হোটেল বয়, সেও সুমাইয়াকে ম্যাডাম সম্বোধন করায় আমার মনে এই চিন্তাটা রেখাপাত করে।

আধা ঘুম আধা সচেতন অবস্থায় প্রায় দুটি ঘণ্টা কেটে যায়। চোখ বন্ধ অবস্থায়ই কিছুক্ষণ আগেও ঘরময় সুমাইয়ার সঞ্চরণ টের পাচ্ছিলাম। আসরের আযান শুনে পূর্ণ সচেতন হয়ে চোখ খুললাম। দেখি সুমাইয়ার খাটের স্ট্যান্ডে কম্বল টানিয়ে যে পর্দার ব্যবস্থা করা হয়েছিল তা নেই। সুমাইয়ারও কোন সাড়া শব্দ নেই রুমে। ভাবলাম বাথরুমে বুঝি, কিন্তু সেখানেও লাইট অফ, পানিরও কোন শব্দ নেই। হঠাৎ টিপয়ে চোখ পড়তেই দেখি আমার ডাইরিতে চাপা দেয়া এক টুকরো কাগজ। হাতে নিয়ে দেখি একখানা পত্র আমাকে উদ্দেশ করেই লেখা।

নিচে সুমাইয়ার নাম। আমি শংকিত হয়ে পড়তে শুরু করলাম। পরিষ্কার উর্দুতে সে লিখেছে–

মাহমুদ সাহেব!

সকালে আপনার সাথে কথা হবার পর কেন জানি একরাশ লজ্জা আমাকে সংকুচিত করে রাখছে। আপনার সাথে স্বাভাবিক কথা বলা যেমন আমার কাছে বিড়ম্বনার মতো মনে হচ্ছিল, তেমনি আপনার সামনে পড়াটাও ছিল অহেতুক অস্বস্তিকর। তাই আমার চলে যাওয়ার কথাটা সরাসরি আপনাকে বলতে না পারায় যেমন মনে এক ধরনের দুঃখবোধের জন্ম নিয়েছে, তেমনি এক ধরনের অস্বস্তি থেকেও রেহাই পেলাম আপনি ঘুমিয়ে থাকায়। আমাকে ক্ষমা করবেন। আপনি অনেক ভালো এবং একজন বড় মনের মানুষ। সংস্কৃতিবান এমন একজন মুসলিম যুবক সকলেরই প্রশংসার যোগ্য। জানি না আমাকে ছাড়াও আমার ভাই ও মাকে কোন জাদুর ছোঁয়ায় এতটা আপন করে নিয়েছিলেন এত অল্প সময়েই। তাঁরা দু'জনই আপনাকে খুব ভালোবাসতেন। যতদিন বেঁচে থাকবো আপনার কথা মনে পড়বে।

আপনার মেধা ও প্রতিভা বিপুল। অফুরন্ত সম্ভাবনাময় জীবন আপনার। আমাদের মতো পাঁকে জড়ানো জীবনের সাথে আপনার জীবনকে আবেগের বশে জড়িয়ে অনর্থ ডেকে আনা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয়। দেশে ফিরে গিয়ে আপনার মা ও বোনদের আমার সালামটা অন্তত দেবেন। আল্লাহ আপনার সর্বাঙ্গীন মঙ্গল করুন।

সুমাইয়া

চিঠিটা পড়ার পর আমার মাথাটা যেন ঘুরে ওঠলো। মনে হলো, আমি যেন অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছি। অব্যক্ত বেদনায় হৃদয়টা আমার হাহাকার করে ওঠলো। স্বপ্ন তাড়িতের মতো রিসিভারটা হাতে তুলে নিয়ে কাউন্টারে খোঁজ নিলাম। ম্যানেজারকে বললাম, ভাই ২৪০ নম্বর রুমে আমার সাথে যে একজন বোর্ডার ছিলেন তিনি কতক্ষণ আগে বেরিয়েছেন?

ম্যানেজার বললেন, ট্যাক্সি আনতে বেয়ারাকে পাঠিয়ে এখানেই অপেক্ষা করছেন। কেন, কোন সমস্যা?

বললাম, না, ওনাকে একটু অপেক্ষা করতে বলুন। আমি এক্ষুণি আসছি।

কোন রকম জামাটা গায়ে জড়িয়ে বিদ্যুৎ গতিতে নিচে নেমে এলাম। দেখি কাউন্টারের পাশেই সোফাতে বসে আছে সুমাইয়া। আমাকে দেখে যেন কেঁপে ওঠলো সে। মাথা নিচু করে বসে রইলো অপরাধীর মতো। আমি উত্তেজনায় সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত নামতে যেয়ে হাঁফিয়ে ওঠলাম যেন। বললাম, সুমাইয়া! ওপরে চল। তোমার সাথে জরুরি কথা আছে।

নীচের দিকে তাকিয়েই সে বললো, এখানে বলা যায় না?

বললাম, সিনক্রিয়েট করো না। প্লিজ, ওপরে চল। জরুরি কথা আছে। উত্তেজনায় আমার গলার স্বরও কাঁপছিল। শেষের কথাটা বেশ ঝাঁঝালো ও রাগমিশ্রিত কর্কশ শোনালো।

সুমাইয়া নিঃশব্দে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠছিল। আমি কাউন্টারে ট্যাক্সি ফেরত দেবার কথা বলে পেছন পেছন উঠে এলাম উপরে।



বাইশ

রুমে এসে বিছানায় বসে বালিশে হেলান দিয়ে দেহটা এলিয়ে দিলাম। অসুস্থ শরীরে দ্রুত সিঁড়ি ভেঙ্গে ওঠা-নামায় এবং উত্তেজনায় খানিকটা হাঁফিয়ে ওঠলাম। সুমাইয়া বিষয়টা টের পেয়েই বোধহয় একটু সময় দিচ্ছে। সে কুণ্ঠিত হয়ে বসে রইলো সোফায়। ভাবছিলাম কি করে শেখ ওসামার শাহাদাতের খবরটা তাকে দেয়া যায়।

এক সময় বিছানায় সোজা হয়ে সুমাইয়ার মুখোমুখি বসলাম। তার মাথা নিচু করা। বললাম, সুমাইয়া! জীবনের এক কঠিন অথচ দুর্লভ সময়ে তোমাদের সাথে পরিচয় ঘটে আমার। তার সমাপ্তি ঘটবে তুমি চলে যাবার মধ্য দিয়ে। আমি জানি, এরপর তোমাদের সাথে আর কোন যোগাযোগ হয়তো হয়ে ওঠবে না। কিন্তু এই যে এতটা দিন তোমাদের পরিবারের সাথে এক সঙ্গে কাটানো, নিজেদের সম্পর্কে জানাজানি, ঘনিষ্ঠতা– এসবের কোন মূল্যই কি নেই? তোমাকে ধরে রাখার কোন অধিকার আমার নেই। আমার অবাধ্য মনের ভালোলাগা এবং ভালোবাসা, এ সম্পর্কে আমার কাঙ্ক্ষিত ভবিষ্যৎ বিনির্মাণের আবেদন তোমার কাছে প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় সত্যিই আমি মনে কিছু করিনি। আমার হাহাকার বা কষ্ট প্রকাশ করে তোমাকে প্রভাবিত করার কোন অভিপ্রায় আমার নেই। তুমি অনেক বড় এবং মহৎ। তোমার ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে নিশ্চয়ই তোমাকে আমি হাসিমুখেই বিদায় দিতাম। কারণ আমি জানি, জোর করে বা শক্তি প্রয়োগ করে মানুষের দেহ ধ্বংস করে দিতে পারলেও কোন মানুষ

কখনোই অন্যের মন জয় করতে পারার ক্ষমতা রাখে না। আমার কোন কথা ও আচরণে তুমি যদি কষ্ট পেয়ে থাক তবে আমাকে ক্ষমা করে দিও।

শেষ দিকে আমার কথা কেমন আর্দ্র হয়ে জড়িয়ে যাচ্ছিল। সুমাইয়া চুপচাপ শুনে যাচ্ছিল আমার কথা। লক্ষ্য করলাম, কোন এক অব্যক্ত বেদনায় তার মুখখানি কেমন নীল হয়ে উঠেছে।

আবার বলতে শুরু করলাম, সুমাইয়া! প্রতিটা মানব শিশু জন্মের পর তার জন্য চূড়ান্ত এবং অবধারিত যে সত্য তা হচ্ছে ক'দিন আগে বা পরে তার মৃত্যু হবেই। সেটা আমাদের দুনিয়ার হিসেবে কারো বেলায় হতে পারে অকাল আবার কারো ক্ষেত্রে পরিণত বয়সে। কিন্তু মৃত্যুর স্বাদ প্রতিটা প্রাণীকে একবার নিতেই হবে। আমরা কারও মৃত্যুতে যখন শোকার্ত হই তখন ভুলে যাই মহান আল্লাহর ইচ্ছার কথা। নিশ্চয়ই তাঁর ইচ্ছাতেই পৃথিবীর সব কিছু সংঘটিত হয়। তাই স্রষ্টার কোন কর্মের প্রতিই সৃষ্টির কোন অনুযোগ বা অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা কাম্য হতে পারে না। আমি তোমাদের এখানে মুজাহিদদের সাথে পরিচিত হয়ে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করলাম, এখানকার মুসিলম তরুণরা স্রষ্টার সন্তুষ্টি এবং ইজ্জতের জিন্দেগী প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কি করে পরম তৃপ্তির সাথে শাহাদাতের পেয়ালায় চুমুক দিতে অভ্যস্ত। তাদের এ আত্মদান যে কত গর্বের এবং কত মহত্ত্বের তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

আমার এই দীর্ঘ কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে সুমাইয়া কখনও আমার মুখের দিকে তাকায় আবার চোখাচোখি হতেই দৃষ্টি নামিয়ে নেয়। একটা দম নিয়ে আবার বলতে শুরু করি, সুমাইয়া! তুমি হয়তো ভাবছো তোমাকে এসব তত্ত্ব কথা শুনিয়ে আমার পাণ্ডিত্য জাহির করে আমার প্রতি তোমাকে আকৃষ্ট করার প্রয়াস পাচ্ছি। আসলে তা নয়; বরং তোমাকে এমন একটা সংবাদ শোনানোর জন্য আমি এতগুলো কথা বললাম, যা শোনার জন্য হয়তো তুমি মোটেও প্রস্তুত নও।

হঠাৎ সুমাইয়া যেন আকর্ণ আগ্রহে নড়েচড়ে বসলো খবরটা শোনার জন্য। তার ধৈর্য যেন আর বাঁধ মানতে চাচ্ছিল না। মাথার ওপর মৃদুভাবে সিলিং ফ্যান ঘুরছে। তার ঠোঁট যেন নড়ে ওঠলো কিছু বলার জন্য। তার আগেই আমি বললাম, তোমার ভাই কমান্ডার শেখ ওসামা আল্লাহর পথে জেহাদরত এক মর্দে মুজাহিদ। তাঁর অনেক সাফল্যগাঁথা আযাদীর লক্ষ্যে লড়াইরত কাশ্মীরী মুজাহিদদের প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। তাঁর একমাত্র বোন হয়ে তাঁকে নিয়ে গর্ব করার অধিকার তোমার নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু যাঁর জন্য সকালে তুমি আমার আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছিলে, সেই মহান বীর সেনানী আর দুনিয়াতে নেই।

তিনি তোমার আম্মিজানের একটু আগেই শাহাদাতের অমীয় সুধায় চুমুক দিয়েছেন। শেখ ওসামার হাতে গড়া কমান্ডার আবদুল ওয়াহেদ সাহেব সে খবরটাই নিয়ে এসেছিলেন তোমাদের বাড়িতে। কিন্তু বাড়ির অবস্থা দেখে ...!

আমি আর কিছু বলতে পারছিলাম না। কান্নায় কণ্ঠ জড়িয়ে আসছিলো। সুমাইয়ার বেদনাহত করুণ মুখচ্ছবি সহ্য করতে পারবো না বলে বেরিয়ে রুমের দক্ষিণ পাশে রেলিং দেয়া এক চিলতে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম। আমার দৃষ্টি বাইরে, ব্যস্ত নগরীর রাস্তায়।

সুমাইয়া বকুফাটা একটা আর্তনাদ করে পেছন পেছন ছুটে এসে আমার কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললো, মাহমুদ সাহেব! আপনি দয়া করে একটিবার শুধু বলুন, আপনি যা বলেছেন সব মিথ্যে, সব মিথ্যে!

আমি অশ্রুভেজা চোখে তার চোখে চোখ রাখলাম। আমাকে আর কিছু বলতে হলো না। নিমিষে বুঝে গেলো সে, যত নির্মমই হোক আমি সত্যই বলেছি তার কাছে। সে আর স্থির থাকতে পারলো না। ছুটে গিয়ে আমার বিছানাতেই উপুড় হয়ে শুয়ে রোদন করতে লাগলো। আমি ফ্যানের রেগুলেটর ঘুরিয়ে স্পিড বাড়িয়ে দিলাম। কাঁদুক। কেঁদে কেঁদে তার মনটা যেন একটু হালকা হয়।

ফ্যানের বাতাসে তার অবিন্যস্ত খোলা চুল উড়ছিল। ইচ্ছে করছিল তার মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিতে, পারলাম না। শুধু মুখে বললাম, প্লিজ সুমাইয়া! শান্ত হও।

সুমাইয়া মুখ ঘুরিয়ে কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললো, আগে কেন আমাকে জানাননি এই খবর? কেন?

বললাম, ভয়ে! তুমি এমন অধৈর্য হয়ে পড়বে, এই ভয়েই তোমাকে বলতে পারিনি এ কথা। তাই তুমি যখন আমাকে না বলে চলে গেলে তখন অনুশোচনায় আমি অস্থির হয়ে উঠেছিলাম। আল্লাহ আমাকে সে দায় থেকে মুক্ত করার জন্যই হয়তো চলে যাবার পরও তোমাকে নিচে পেয়ে গেলাম।

সুমাইয়ার চোখে-মুখে এবার এক ধরনের কাঠিন্যের ছাপ ফুটে ওঠলো। সোজা হয়ে বসে সে ওড়না দিয়ে মাথা ঢেকে জিজ্ঞেস করলো, ভাইজানের দেহ কি মুজাহিদরা উদ্ধার করতে পেরেছিল শয়তানদের হাত থেকে?

বললাম, হ্যাঁ! তাঁর ইচ্ছানুযায়ী জাহানাবাদেই তাঁকে দাফন করা হয়েছে। মৃত্যুর পূর্বে তিনি ভাই আবদুল ওয়াহেদকে কমান্ডারের দায়িত্ব দিয়ে মাকেসহ তোমাকে

এবং আমাকে ইসলামাবাদ পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু বাড়িতে এসে তিনি যখন আমাদের অবস্থা দেখলেন তখন তোমাকে সে খবর জানানোটা উচিত মনে করেননি। আমাকে চুপি চুপি জানিয়ে সে মুহূর্তে তোমাকে তা জানাতে নিষেধ করেছিলেন।

আসরের সময় বয়ে যায় দেখে আমি ওযু করে এসে নামায পড়ে নিলাম। সুমাইয়া তখনও সেভাবেই বসে আছে নির্বাক নির্লিপ্তভাবে।

বললাম, ওযু করে নামায পড়ে নাও সুমাইয়া। ভাইয়ের শাহাদাত কবুল হওয়ার জন্য দোয়া করো। আমি বারান্দায় আছি, বলে বারান্দায় চলে গেলাম।

সন্ধ্যা হতে আর বেশি দেরি নেই। মেঘমুক্ত পশ্চিমাকাশ আবির রঙে ছেয়ে আছে। সুমাইয়াকে খবরটা বলতে পেরে মনটা হালকা বোধ হচ্ছিল। একই সাথে তার বেদনাকাতর মুখখানি বারবার আমার মনটাকে আহত করে দিচ্ছিল। কি করার আছে আমার? এ তো আমার দেশ নয়। এমন শত শত সুমাইয়া ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে কাশ্মীরের পাহাড়ি কন্দরে কন্দরে। আমি উদাস দৃষ্টি মেলে চেয়েছিলাম আকাশের পানে। সুমাইয়া নামায পড়ে এসে আমার পেছনে দাঁড়ালো। গোধূলি লগনের রক্তিম সূর্যালোক তার মুখমণ্ডলকে আরও যেন রাঙা করে তুলেছে।

কাতর ও ঋজু কণ্ঠে বললো, মাহমুদ সাহেব! আমাকেও আপনি মাফ করে দেবেন। এখন নিশ্চয়ই আমাকে যেতে দিতে আপনার আপত্তি থাকার কথা নয়!

অজান্তেই একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো আমার। চলে যাবে তুমি! হ্যাঁ, চলেই তো যাবে। তোমাকে বাধা দেবার বা ধরে রাখার সাধ্য কি আমার আছে? অভিমানী সুর ঝরে পড়লো আমার কণ্ঠে।

সুমাইয়া বুদ্ধিমতী। সে হয়তো আমার মনের কথাটা পড়ে ফেলেছে। এর আগে ভাইয়ের কথা বলে আমার নিবেদন সে প্রত্যাখ্যান করেছিলো। কথাটা সরাসরি না তুলে সে বললো, আমার বিপন্নাবস্থা আপনাকে পীড়িত করে তুলেছে, তা আমি জানি। তাই আমাকে সুখী করে তোলার জন্য করুণা করে যে রঙিন স্বপ্নের পথ দেখিয়েছেন তার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

সুমাইয়ার কথা শুনে এবার আমি সত্যিই আহত হলাম। বললাম, আমার আন্ত রিক ভালোবাসার এ নিবেদন যদি তোমার কাছে করুণার মতো মনে হয়ে থাকে, তাহলে আবারও ক্ষমা চাচ্ছি। তবুও আমি তোমাকে এই শেষ অনুরোধটুকু করছি, আমার অবাধ্য মনের এই ভালোবাসাকে তুমি অন্তত করুণার আবরণে

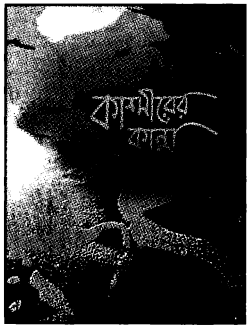
ঢেকে দিও না। তাহলে আমার কষ্টের আর সীমা থাকবে না সুমাইয়া। তোমাকে আমার হৃদয়ের আকুতি জানানোর ব্যর্থতা আমার অন্তরে এতটাই ক্ষতের সৃষ্টি করবে, যা হয়তো কোনদিনই মুছতে পারবো না।

সুমাইয়া এবার যেন একটু বিচলিত হয়ে ওঠলো। বললো, দুঃখিত! অশিক্ষিত-অবোধ এই কিশোরীর কসুর মার্জনা করবেন। আপনার মতো জ্ঞানীর সাথে কথা বলতে যথার্থ শব্দ প্রয়োগে ব্যর্থতার কারণেই হয়তো আপনি এতটা আহত হয়েছেন। বিশ্বাস করুন! পৃথিবীতে বেঁচে থাকার কোন আগ্রহই আর আমার মাঝে অবশিষ্ট নেই। এখন আমার কথা বলতেও খুব কষ্ট হচ্ছে। ভাইজানের শেষ ইচ্ছেমতো আমি এখন মামার বাড়িতেই যেতে চাই।

আমি একটু আশান্বিত হয়ে বলে ওঠলাম, তারপর?

আবার আমি স্বদেশে চলে যাবো। মা-বাবা এবং ভাই যে আযাদীর জন্য নিজেদের শেষ রক্তবিন্দু উৎসর্গ করে গেছেন, আমিও তাই করবো ভাবছি। জাহানাবাদের নূরজাহান বেগমের কথা ভাইজানের মুখে নিশ্চয়ই শুনেছেন। যার জীবনের বদলা হিসেবে দুশমনদের পুরো একটি ঘাঁটি মুজাহিদদের কব্জায় এসেছিলো। এরপর প্রভূত সাফল্যও এসেছিলো এই অঞ্চলে। পুরো কারগিল জয় করে নিয়েছিলো সাহসী মুজাহিদরা। আমিও তাদের মতো দুশমনদের বিরুদ্ধে লড়তে চাই। নার্সিং নিয়ে লড়াইয়ের অংশ হিসেবেই মুজাহিদদের সেবা দিয়ে আসছিলাম। এখন আমি অস্ত্র হাতে তুলে নিতে চাই। জীবনের শেষ রক্তবিন্দু অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত লড়তে চাই দুশমনদের বিরুদ্ধে। আপনি আমাকে এজাযত দিন। দোয়া করবেন যেন কাশ্মীর সত্যিই একদিন আযাদ হয় এবং পৌত্তলিকদের দুঃশাসনমুক্ত হয়ে প্রকৃত খোদায়ী রাজ কায়েম হয়। বললো সুমাইয়া।

আমি বিস্মিত চোখে তার মুখের দিকে তাকালাম। তার দৃঢ় কঠিন মুখভাব দেখে বুঝলাম, সে কেবল একজন মুসলিম ঘরের ঈমানদার কন্যাই নয়; বরং এক সাচ্চা দেশপ্রেমিক সংগ্রামীও।



তেইশ

শেষ রাতের দিকে এক পশলা বৃষ্টি হয়েছে। ঘুমের ঘোরে তখন বুঝতে না পারলেও ফ্যান বন্ধ করে কম্বল মুড়ি দিয়েছিলাম তা খেয়াল আছে। মেঘমুক্ত পরিষ্কার আকাশ, ঝকঝকে সকাল। আজও আমি সূর্যোদয় দেখলাম ইসলামাবাদের এই হোটেলের রেলিং দেয়া চিলতে বারান্দায় দাঁড়িয়ে। ঠাণ্ডা ভাবটা এখন নেই, নেই গরমও। শান্ত-স্নিগ্ধ প্রকৃতি। শহরের রাস্তাগুলোতে কোলাহল বাড়ছে। বৃষ্টিতে ধোয়া-মোছা দালান-কোটা, ফাঁকে ফাঁকে দু'একটি গাছপালা রোদের স্নিগ্ধ আলোয় যেন হাসছে। আমার মনে হলো প্রকৃতির এই সতেজ সজীব রূপ আমাকে যেন বিদ্রূপ করছে। শূন্যতা এবং বিরহের ব্যথা-বিষে কোমল মনটা আমার কেমন যেন নীল হয়ে উঠেছে। কেমন একটা অস্থিরতা মনকে ভারাক্রান্ত করে রেখেছে সুমাইয়া চলে যাবার পর থেকে। সে চলে যাওয়াতে বুঝতে পারছিলাম আমি কতটা দুর্বল হয়েছিলাম তার প্রতি। এত ভালো কেন বাসতে গেলাম তাকে? কেনই বা এত কষ্ট পাচ্ছি আজ আমি। চিন্তার স্রোত ভিন্নদিকে প্রবাহিত করে মনটাকে শান্ত করার জন্য আম্মার সাথে রাতেই ঢাকায় কথা বলেছি। মা হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে বললেন, তুই কেমন আছিস বাবা? এতদিন তোর কোন খবরই আমি পেলাম না কেন? কোথায় ছিলি এতদিন?

মায়ের এমন সব প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে আমি ক্লান্ত হয়ে ওঠছিলাম। তখন আমার খুব কাঁদতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু আম্মা বিগড়ে যাবেন বলে আমি

নিজেকে যথাসাধ্য সামলে নিই। শুধু বললাম, আমি ভালো আছি, আমার জন্য কোন চিন্তা করো না। কাশ্মীর সফর শেষ। কয়েকদিনের মধ্যেই বাড়ি ফিরবো।

মার সাথে টেলিফোনে কথা শেষ করে ডায়াল করলাম আইবিএ অফিসে। যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই। টেলিফোন রিসিভ করলো এজাজ ভাই। বিস্মিত হয়ে হাজারটা প্রশ্ন করলেন তিনি। আমি এখন কোথায় কেমন আছি। চেয়ারম্যান সাহেব নিজে নাকি রোজ ফোন করে আমার খবর জিজ্ঞেস করছেন। ইউএন-এর সাহায্য সংস্থায় যোগাযোগের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছেন। মুজাহিদ কমান্ডারদের মাধ্যমে খোঁজ-খবর নেবার চেষ্টা করছেন ইত্যাদি।

আমি বললাম, ভাই, এতগুলো প্রশ্নের জবাব আমি একসঙ্গে দিই কি করে? এরপর হোটেলের নাম বলতেই তিনি বললেন, আমি জাভেদ ওমর ভাইকে ফোন করে খবরটা জানিয়ে এখনই আসছি। তিনি অল্পক্ষণ আগে বাসায় চলে গেছেন।

ঠিক পনের মিনিট পরই তিনি এসে হাজির। দরজা খুলে তাঁকে স্বাগত জানালাম। তিনি এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, একি চেহারা হয়েছে আপনার? আপনি কি এখনও অসুস্থ? আঘাতটা কোথায় পেয়েছিলেন?

বললাম, আমার সম্পর্কে আপনাদের এই উদ্বেগ সীমাহীন ভালোবাসারই প্রকাশ। আমি কৃতজ্ঞ যে আপনাদের মতো সহকর্মী শুভার্থী পেয়েছি।

অল্পক্ষণ পরই ইসলামাবাদ ব্যুরো চীফ জাভেদ ওমরও এসে হাজির। তারপর দু'জনকেই সংক্ষিপ্ত সফর বৃত্তান্ত শোনাতে হলো। একই সাথে আমার আহত হবার কাহিনী এবং মুজাহিদদের সহযোগিতায় ইসলামাবাদ পর্যন্ত পৌঁছার ঘটনা সবিস্তার তাঁদের শোনাই। কেবল এড়িয়ে গেলাম সুমাইয়ার সাথে এই হোটেলে ওঠা ও আজকেই সুমাইয়ার এখান থেকে চলে যাবার কথা।

তারা বিস্ময়ে অথচ মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন আমার কথা। জাভেদ ভাই জানালেন, ইসলামাবাদে যে ওয়ার্কশপ হওয়ার কথা ছিল তা যথারীতি ১৫ এপ্রিল থেকে শুরু হচ্ছে। চেয়ারম্যান সাহেব আমার ব্যাপারে বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে আছেন। এত রাতে হয়তো টেলিফোনে তাঁকে নাও পাওয়া যেতে পারে। তাই সকালেই আমার ফেরার কথা জানাবেন। রাতে হোটেল থেকে চলে যাবার সময় তাঁরা দু'জনই আমাকে তাঁদের বাসায় নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমি তাতে সম্মত হইনি। এক সময় এজাজ ভাই আমার হাতে একটা খাম বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, চিঠিটা মার্কিন ডাক্তার এলিয়েদার। আমাদের অফিসে এসে রেখে গেছেন যেন আপনি ফেরামাত্রই আপনাকে দিই। আপনার ব্যাপারে এই

মহিলাকে বেশ পেরেশান দেখেছি। এরপর এজাজ ভাই খানিকটা হেসে বললেন, চিঠিটা আমরা খুলিনি, কিন্তু এর বিষয়বস্তু জানার একটু কৌতূহল জন্মেছে আমার মনে।

তার রহস্যময় হাসিমুখের দিকে চেয়ে খামটা খুলে ফেললাম। পরিষ্কার ইংরেজিতে সুন্দর হস্তরেখায় লেখা দু'পৃষ্ঠার চিঠি। আমি স্মরণ করতে পারছিলাম না কারগিলের পাদদেশে মুজাহিদদের অস্থায়ী ক্লিনিকে চিকিৎসাধীন থাকাকালে জ্ঞান ফেরার পর ডা. এলিয়েদাকে দেখেছিলাম কিনা। আহত হবার আগের দিন সন্ধ্যায়ই সম্ভবত তার সাথে আমার শেষ কথা বলা। তখন আমরা খুব কাছে থেকে দেখেছিলাম ভারতীয় জঙ্গি বিমান ভূপাতিত করার দৃশ্যটি। সেদিনের ঘটনায় এলিয়েদা মনে মনে কিছুটা আহত হয়েই ফিরেছিলো। তারপর তার সাথে আর কোন কথাও হয়নি আমার। আমি বেশ আগ্রহ নিয়েই এলিয়দার চিঠিটা পড়তে লাগলাম। সে লিখেছে–

প্রিয় মাহমুদ হাসান!

অনেক শুভেচ্ছা রইলো। আমি ঠিক জানি না আমার এ পত্র তোমার হাতে পৌঁছবে কি না। যদি সুস্থ হয়ে ফিরে আসো তাহলে যখন তুমি আমার এ পত্র পড়বে তখন আমি পৃথিবীর অন্য প্রান্তে স্বদেশের মাটিতে অবস্থান করবো। ইচ্ছে ছিলো ভলান্টিয়ারী সার্ভিস দিয়ে বিশ্বের আরও কিছু অনুন্নত ও সংঘাতপীড়িত দেশ ঘুরবো। কিন্তু কাশ্মীর সফরে তোমার সাথে পরিচয়ের পর আমার মনোজগতে যে উত্তাল ঝড় বইতে শুরু করেছে, তাতে সে ইচ্ছে আপাতত চাপা পড়ে গেছে। সিদ্ধান্ত নিয়েছি দেশে ফিরেই কোন হসপিটাল বা ক্লিনিকে জয়েন করবো।

খৃষ্টান পরিচয়ে জন্ম নিলেও আমাদের পরিবারে ধর্মের প্রতি কারোরই তেমন আগ্রহ দেখিনি। ফলে ধর্ম নিয়ে ভাববার তেমন কোন চেষ্টা আমিও করিনি কোনদিন। খৃষ্টধর্মের কতিপয় বিষয়ে আমার মতো মুক্ত চিন্তার সাধারণ এক তরুণীর কাছেই যেসব অসঙ্গতি, বৈষম্য ও আজগুবি বিষয় ধরা পড়েছে, তাতে ধর্মের অসারতা ও এর প্রতি অনাসক্তি জন্ম নেয়াটাই স্বাভাবিক। পাশাপাশি বহুল আলোচিত তোমাদের ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে এর যে রূপ ফুটিয়ে তোলা হয়, তাতে একে নিয়ে ভাববার মতো কোন আগ্রহ আর অবশিষ্ট থাকে না। তথাপি মেডিকেলের একজন ছাত্রী হিসেবে বিজ্ঞানের এই চরম উৎকর্ষের যুগেও বিজ্ঞানের অনেক সীমাবদ্ধতা, অনেক প্রশ্নের জবাব না থাকার অসারতা আমাকে এমন বিশ্বাসের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে যে, গোটা সৃষ্টি জগতের পেছনে নিঃসন্দেহে একজন সুপ্রিম পাওয়ারফুল স্রষ্টার হাত রয়েছে। প্রাণী জগতের প্রত্যেকটি প্রাণীর অসহায়ত্ব,

তার আকুতি, ব্যর্থতা, অসম্পূর্ণতার দুঃখবোধ জানাবার এবং ন্যায়বিচার পাবার একটা অবলম্বন যদি নাই থাকে, তাহলে বোদ্ধা প্রাণের (বিশেষত মানুষের) পৃথিবীতে এই বৈষম্য ও জুলুমের প্রতিকার কি করে হতে পারে? দুনিয়াতে সব না পাওয়ার ব্যর্থতার যদি কোন প্রতিবিধান নাই থেকে থাকে, তাহলে যে আদর্শ, যে সভ্যতার দাবি করা হয়– এ সবের কোনই মূল্য থাকতে পারে না। কিসের জন্য তবে একে অন্যের সহযোগিতা করবে, কেনই বা মানুষ মানবিক গুণাবলী অর্জন করে অন্যের হিতে নিজের জীবনের আরাম-আয়েশ ত্যাগ করে কল্যাণের পথে ধাবিত হবে? এটা নিছকই দুনিয়াতে মানুষের বাহবা পাবার আশায়, নাকি ধর্মের কথানুযায়ী আমাদের দুনিয়ার জীবনের পর নতুন কোন জীবনে পুরস্কৃত হবার লোভে? শেষোক্তটি আমার চিন্তার সাথে মিলে যাবার কারণে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ধর্মের ন্যূনতম খোঁজ খবর নিতে চেষ্টা করেছি। যুদ্ধপীড়িত ও সংঘাতপূর্ণ বিশ্বের কিছু অঞ্চলে স্বেচ্ছাকর্মী হিসেবে সেবা দিতে গিয়ে এসব ব্যাপারে জানতে আরও অনুপ্রাণিত হয়েছি। তোমাকে এসব কথা বলার কারণ, তোমাকে একজন সমঝদার বোদ্ধা মনে হয়েছে আমার কাছে। তোমার মেধা প্রতিভার পাশাপাশি ধর্মবোধ, শালীনতা, সংযম, ধৈর্য এবং স্পষ্টবাদিতা আমাকে মুগ্ধ করেছে। বিশেষত তোমার সাথে কয়েকদিন মিশে ধর্ম সম্পর্কে যে জ্ঞান আমি আহরণ করেছি তাতে ইসলামের প্রতি আমার আগ্রহ সীমাহীন বেড়ে গেছে। তোমাদের কুরআন-হাদীস ও ধর্মীয় বইয়ের কয়েকটি ইংরেজি ভাষ্য আমি নিয়ে যাচ্ছি সঙ্গে করে। এগুলো পড়ে তোমাকে নিয়ে ডিসকাস করতে পারলে আমি সহজেই তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারতাম।

তুমি যখন আহত হয়ে ক্লিনিকে এলে তখন প্রাইমারি ট্রিটমেন্ট আমিই করেছিলাম। তোমার জ্ঞান ফেরার বিলম্ব দেখে এবং আঘাতের স্থানটা পর্যবেক্ষণ করে আমাদের গ্রুপের চেয়ারম্যান বিজ্ঞ ডাক্তার ইবরাহিম আমার আশংকা অনেক বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। কারণ এই স্থানের আঘাতে জ্ঞান ফিরতে দেরি হওয়া মানেই স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলার সম্ভাবনা। সেখানে মস্তিষ্ক পরীক্ষা-নিরীক্ষার যেমন আধুনিক যন্ত্রপাতি ছিল না, তেমনি তোমাকে সরিয়ে নিয়ে কোথাও উন্নত চিকিৎসা করানোরও উপায় ছিল না। শেষ পর্যন্ত তোমার জ্ঞান যখন ফিরলো তখন দুবার গিয়েও তোমার সাথে কথা বলতে পারিনি, তুমি ঘুমে ছিলে। সেখানে একটি কিশোরী নার্সের আন্তরিক সেবা শুশ্রূষা যে তোমাকে সারিয়ে তুলতে কতটা সাহায্য করেছে তা তোমাকে বলে বোঝাতে পারবো না। তোমার মতো একজন অচেনা বিদেশী মানুষের প্রতি তার দরদমাখা সেই আন্তরিক শুশ্রূষা আমাকে মুগ্ধ করেছে। কারগিলের অবস্থা তখন এতটাই অশান্ত ছিলো যে, মাত্র পাঁচ মিনিটের নির্দেশে তাঁবু গুটিয়ে চলে আসার সময় তোমাকে বলে আসার মতো সুযোগই হয়নি। কথা

বলার সুযোগ ছিলো না বলে আড়াল থেকে কেবল এক পলক তোমাকে দেখেই গাড়িতে ওঠতে হয়েছিলো। আশা করি আমার এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটিকে তুমি অপরাধ বলে গণ্য করবে না।

আমি জানি, পাশ্চাত্য সম্পর্কে তোমার ধারণা খুবই নেগেটিভ। সেখানকার মুক্ত জীবনযাত্রা তোমাদের চোখে অশালীনতার চরম পর্যায় হিসেবে চিহ্নিত। একজন সাংবাদিক হিসেবে সেদিন তুমি আমেরিকার কুমারী মাতার একটি তালিকা শুনিয়ে আমাকে লজ্জা দিয়েছিলে। তোমার অবগতির জন্য অতটুকুই কেবল বলবো যে, হ্যাঁ, মুক্ত জীবনযাত্রার ফলে সেখানে যেমন কুমারী মাতা বা লাভ চাইল্ডের সংখ্যা একটা বিরাট অংকে দাঁড়িয়েছে, তেমনি সেখানে বিয়ে এবং বৈধ দম্পতির সংখ্যাও নেহাত কম নেই। একশ্রেণীর উঠতি বয়সী তরুণ-তরুণীর বেপরোয়া জীবনযাত্রার পাশাপাশি আমার মতো বাইশ-তেইশ বছরের এমন কি তারও ঊর্ধ্বে পর্যন্ত পবিত্রতার প্রশ্নে এমন অসংখ্য যুবক-যুবতী রয়েছে, যারা তাদের কুমার বা কুমারিত্ব সযত্নে লালন করে রাখতেই স্বচ্ছন্দবোধ করে। সেদিনকার সেই মুহূর্তটির জন্য নিশ্চয়ই তুমি আমাকে প্রথমোক্তদের দলে ফেলবে না।

মাহমুদ! তোমার চিন্তার উৎকর্ষ, বিশ্বাস ও উপলব্ধি পরিপূর্ণ জীবনবোধ সম্পন্ন একজন মানুষের পরিচয় বহন করে। তোমার ধর্মের পরশ পাথরের স্পর্শে যদি তুমি এমন সোনা হয়ে থাকো তাহলে প্রার্থনা করো আত্মার মুক্তি, জীবন জগৎ, স্রষ্টার সৃষ্টি এবং মানব জন্মের সার্থকতা খুঁজে পেতে যেন সেই পরশ পাথরের ছোঁয়া আমার অন্তরেও লাগে। তোমাকে প্রলুব্ধ করার জন্য বলছি না, তোমার মেধা-প্রতিভা বিশাল সম্ভাবনার ইঙ্গিত বহন করে। তোমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে যার পরিপূর্ণ বিকাশের সম্ভাবনা খুবই কম। জীবনের গণ্ডিটাকে এই সাউথ এশিয়ার চার দেয়ালে বন্দি না রেখে চলে আসো আমাদের এখানে। দেখবে কত বড় কাজ তোমার জন্য অপেক্ষা করে আছে এখানে। তুমি যদি চাও তবে আমার নিজের স্বার্থেই তোমাকে আমেরিকা নিয়ে আসার সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা করবো আমি। তোমাকে সঙ্গী করে এক নতুন জীবনের ভিত রচনা করবো আমেরিকার এই ঊষর জমিনে। তোমার দীক্ষায় দীক্ষিত হয়ে এক নতুন সকালের অপেক্ষা করে কাটিয়ে দেবো আমাদের জীবন। আমাকে স্বার্থবাদী ভাবতে পারো তুমি, কিন্তু আমার অন্তর্জগতে যে আলোড়ন তুমি তুলেছো, যে হাহাকারে গুমরে মরছে এখন আমার ভিতরটা, তা যদি তোমাকে বোঝাতে পারতাম তাহলে নিশ্চয়ই এমন অপবাদ দিতে পারতে না আমাকে। বিশ্বাস করো, এত দীর্ঘ চিঠি জীবনে এটাই আমার প্রথম। তোমার অনুভূতি ও ইচ্ছা জানার আগ্রহ রইলো। ঠিকানাও নিচে দেয়া আছে। একটা জবাব দিলে অন্তত এটুকু

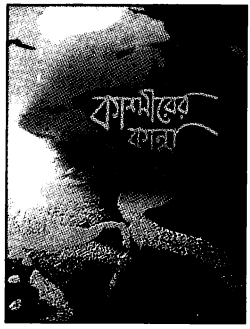
নিশ্চিত হতে পারতাম, আমার এই মিনতিভরা দীর্ঘ পত্রখানি তুমি পেয়েছো এবং পড়েছো। স্রষ্টার অফুরন্ত অনুগ্রহ তোমার ওপর বর্ষিত হোক– এ কামনায় শেষ করছি।

এলিয়েদা

মিথ্যে বলবো না, এলিয়েদার এই পত্র সুমাইয়ার জন্য ব্যথাতুর মনের ভাবনার জাল কিছুটা হলেও ছিন্ন করে দিয়েছিল। চিঠি পড়া শেষ হলে এজাজ ভাইয়ের আগ্রহ মেটাতে তার হাতে তুলে দিয়েছিলাম অনেকটা অন্যমনষ্কভাবেই। এজাজ ভাইয়ের চিঠি পড়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত জাভেদ ভাই চুপচাপ বসে ছিলেন সোফাতে। চায়ের কাপ খালি করে তারা যখন চলে যাচ্ছিলেন, এজাজ ভাই তখন আমার পিঠে চাটি মেরে রহস্যময় হাসি দিয়ে বলে ওঠেন, চলে যাও, ইয়াংম্যান! সৌভাগ্য বার বার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে না।

আমি লজ্জা পেয়েছিলাম তাঁর কথায়। কিন্তু সুমাইয়ার ভালোবাসার কাঙ্গালীপনায় আমি কতটা কাতর তা তো আর তাকে বলা যাবে না। লাজুক হেসে তাদের বিদায় দিয়েছিলাম রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে। স্নিগ্ধ সতেজ সকালে হোটেলের রুমে বসেই চা-নাশতা খেতে খেতে এসব কথাই ভাবছিলাম। এমন সময় টেলিফোন বেজে ওঠলো। রিসিভার কানে ওঠাতেই ওপ্রান্ত থেকে জাভেদ ভাইয়ের গলা শোনা গেলো। হ্যালো মি. মাহমুদ! গুড মর্নিং! কেমন কাটলো রাত?

দু'চারটি কথার পর তিনি বললেন, অফিসে চলে আসুন। চেয়ারম্যান সাহেব আপনার প্রত্যাবর্তনে দারুণ খুশি হয়েছেন। বেলা বারোটায় আপনার সাথে কথা বলবেন এবং প্রয়োজনীয় কিছু সচিত্র এক্সক্লুসিভ আইটেম ইন্টারনেটে ইনস্টল করার পরামর্শ দেবেন।



চব্বিশ

বেলা এগারটার দিকে আইবিএ'র ইসলামাবাদ ব্যুরো অফিসে পৌঁছলাম। অফিসে জাভেদ ভাই একা। এজাজ ভাই গেছেন হোম মিনিস্টারের প্রেস কনফারেন্সে। জাভেদ ভাই উঠে এসে আমাকে স্বাগত জানালেন। চায়ের অর্ডার দিয়ে বললেন, দেখবেন ঠিক বারটাতেই চেয়ারম্যান সাহেব ফোন করবেন আপনার সাথে কথা বলতে।

ভেতরে ভেতরে কিছুটা শংকাবোধ করছিলাম। চেয়ারম্যান সাহেব কি বলেন, সফর তাঁর মনের মতো হয়েছে কি না আল্লাহই জানেন। বসে বসে আইবিএ'র নিজস্ব জার্নালটায় চোখ বুলাচ্ছিলাম। জাভেদ ভাই ইন্টারনেটে হাত চালাবার ফাঁকে ফাঁকে আমার সাথে কথা বলছিলেন। কিছুক্ষণ পর আমার কাছ থেকে কাশ্মীরে ধারণ করা ভিডিও ফিল্মটা মনিটরে ছেড়ে দিয়ে আমার পাশাপাশি সোফায় বসলেন। নিজে ভিডিও করলেও এর আগে তা দেখার সুযোগ হয়নি আমার। লাইটিংয়ের কিছু ত্রুটি ছাড়া ছবি বেশ ভালোই এসেছে। বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশ দেখে তিনি আমার পিঠ চাপড়ে প্রশংসা করলেন। মনিটরে চোখ রাখতে গিয়ে কখন যে প্রায় একটা ঘণ্টা কেটে গেলো টেরই পেলাম না। ঠিক বারটায়ই টেলিফোন বেজে ওঠলো। শংকিত হয়ে ঘড়ির দিকে তাকালাম। জাভেদ ভাই রিসিভ করে ধরিয়ে দিলেন আমার হাতে। ইশারায় এবং নীচু সুরে বললেন, চেয়ারম্যান, ফ্রম সৌদী।

আমি কম্পিত হাতে রিসিভার ধরলাম। প্রথমটায় সালাম ও কুশল বিনিময়ের পর তিনি আমার নিজের আহত হওয়া, চিকিৎসা এবং ঝুঁকিপূর্ণ সফর শেষে ফিরে আসার বিষয়েই খোঁজ-খবর নিলেন। ধন্যবাদ জানালেন এবং কাজের বিবরণ শোনার আগেই প্রশংসা করলেন। তারপর দীর্ঘ প্রায় বিশ-পঁচিশ মিনিট ধরে আমার সংক্ষিপ্ত সফরবৃত্তান্ত এবং উদ্দিষ্ট কাজের কতটুকু করতে পেরেছি তার বিবরণ দিলাম। তিনি খুব খুশি হলেন এবং পনের তারিখের ওয়ার্কশপের জন্য চৌদ্দ তারিখেই তিনি ইসলামাবাদ আসছেন জানিয়ে বললেন, তখন যেন অংশগ্রহণকারীদের সামনে এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত ব্রিফ দিই। এতে সকলেই বেশ উপকৃত হবেন।

কথা শেষ করে রিসিভারটা রেখে পেছনে তাকিয়ে দেখি এজাজ ভাই দাঁড়ানো। তাঁর মুখে এবার আরো গাঢ় রহস্যময় হাসি। আমি দাঁড়াতেই কাঁধে হাত রেখে বললেন, আপনাকে বিরাট একটা সারপ্রাইজ দেব আমি। তার আগে হোটেল থেকে লাগেজ নিয়ে আসতে হবে। আজ অফিস ছেড়ে সোজা আমার বাসায় যেতে হবে এবং ইসলামাবাদে যে ক'দিন থাকছেন আমাদের বাসাতেই থাকতে হবে আপনাকে।

বিস্মিত হয়ে তাঁর উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করছিলাম আমি। বললাম, কি এমন সারপ্রাইজ দেবেন যে, এর জন্য আমাকে আপনার বাসায় গিয়ে থাকতে হবে?

জবাবে এজাজ ভাই তেমনি রহস্যময় ভঙ্গিতে বললেন, তা আপনি চিন্তাও করতে পারবেন না। বিকেলে বাসায় গেলেই বুঝতে পারবেন।

আমরা একসাথে অফিসেই লাঞ্চ করলাম। যোহরের নামাযের পূর্ব পর্যন্ত এজাজ ভাই জাভেদ ভাইয়ের সাথে অনুচ্চ সুরে ফিসফিসিয়ে কি সব বলাবলি করেছেন। আড় চোখে আমার দিকে চেয়ে হেসেছেনও মাঝে মধ্যে। আমি বেশ অস্বস্তিবোধ করছিলাম তাদের এমন আচরণে। আমি পত্রিকা পড়ার ফাঁকে ফাঁকে তাঁদের এমন কথা বলা লক্ষ্য করেছি। আমাকে বিশ্রাম কক্ষে শুয়ে আরাম করারও পরামর্শ দিয়েছেন বার কয়। একবার ঢাকায় ফোন করে আম্মার সাথে কথাও বলেছি। বেলা তিনটার দিকে এজাজ ভাই বললেন, চলুন।

কোথায়? জানতে চাইলাম আমি।

বললেন, আপনাকে নিয়ে শহরটা একটু ঘুরে আসি।

কোন কাজ না থাকায় আমিও কিছুটা বোরিং ফিল করছিলাম। সকাল থেকে দৈনিক ডন, জং, আইবিএ'র সাপ্তাহিকীর ইংরেজি এডিশন প্রায় সবটাই পড়া

হয়ে গেছে। এরই মধ্যে কাশ্মীরের ওপর দুটো এক্সক্লুসিভ রিপোর্ট করে জাভেদ ভাইয়ের কাছে জমাও দিয়েছি। কোথায় ঘুরতে যাচ্ছি কিছু না জেনেই এজাজ ভাইয়ের সাথে অফিসের গাড়িতে করে বেরিয়ে পড়লাম। প্রথমে তিনি নিয়ে গেলেন জাতীয় প্রেসক্লাবে। সেখানে ইসলামাবাদের অনেক প্রবীণ ও ঝানু সাংবাদিকের সাথে পরিচয়ও হলো। '৭১-এ দেশভাগের আগে ঢাকায় তৎকালীন দৈনিক পাকিস্তান ও অবজারভারে কাজ করেছেন এমন দু'জনের সাথেও কথা হলো। আমার জন্মই একাত্তরে। তাই আমার মতো নবীনের সাথে তাঁদের মতো বিদগ্ধ প্রবীণ সাংবাদিকদ্বয় তেমন জমাতে পারলেন না বলে মনে হচ্ছিলো। বাংলাদেশের প্রবীণ ও প্রথিতযশা ক'জন সাংবাদিকের ব্যাপারেও খোঁজ-খবর নিলেন আমার কাছ থেকে। আমার জানার মধ্যে যতটুকু সম্ভব বলেছি তাঁদের।

ঘণ্টা খানেক প্রেসক্লাবে কাটিয়ে আমাকে নিয়ে এজাজ ভাই চলে এলেন হোটেলে। বললেন, লাগেজ নিয়ে এসে বিল মিটিয়ে চাবি ফেরত দিতে।

বললাম, এখানে কেবল একটা ব্যাগই তো আছে, লাগেজ পাবো কোথায়? ব্রিফকেসটা তো অফিসেই রেখে গিয়েছিলাম।

বললেন, ঠিক আছে, যা আছে নিয়ে আসুন। হোটেল ছেড়ে আবার অফিসে ফিরলেন। তখন আসরের আযান হয়ে গেছে। একসাথে নামায পড়ার পর এজাজ ভাই আবার হাসি মুখে জাভেদ ভাইয়ের সাথে কি যেন বললেন। তারপর আমাকে বললেন, চলুন এবার বাসায় যাওয়া যাক।

বললাম, এখনই! অফিসে কাজ শেষ?

বললেন, হ্যাঁ, বাসায় আপনার জন্য যে সারপ্রাইজ অপেক্ষা করছে তা না দেখানো পর্যন্ত স্বস্তি পাচ্ছি না, চলুন।

আমি তাদের কথা ও আচরণে বিস্মিত হচ্ছিলাম। কিছুটা শংকিত এবং বিরক্তও। কিন্তু তা প্রকাশ করার উপায় ছিলো না। জাভেদ ভাইকে শুধু বললাম, এজাজ ভাইয়ের পাগলামির আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না।

তিনি মিটিমিটি হেসে জবাব দিলেন, বাসায় গেলেই সব বুঝতে পারবেন। আশাকরি আগামীকাল আপনার এমন মনমরা ভাব আর দেখতে হবে না।

জাভেদ ভাইয়ের কথায় রহস্য আরও ঘনীভূত হলো। তবুও আমি মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করে বললাম, আচ্ছা! যথা আজ্ঞা। বলে এজাজ ভাইয়ের সাথে বেরিয়ে পড়লাম।

এজাজ ভাইয়ের বাসায় কাশ্মীর যাবার আগেই একবার দাওয়াত খেতে এসেছিলাম। নিজেদের পাঁচতলা বাড়ি। দুই ভাই তারা। বাপ নেই, মা আছেন।

দুই ভাইয়ের মধ্যে তিনি ছোট। বড় ভাই করাচীতে সস্ত্রীক অধ্যাপনা করেন একই কলেজে। বছরের বেশির ভাগই সেখানে কাটান। ঈদ পরব ছাড়া খুব কমই আসেন ইসলামাবাদের বাড়িতে। তবুও নিচ তলার পুরো ফ্ল্যাটই তারা নিজেদের ব্যবহারের জন্য রেখে বাকি ফ্ল্যাট ভাড়া দিয়ে রেখেছেন। এজাজ ভাইয়ের একটি মাত্র ছেলে, বয়স মাত্র পাঁচ বছর। তাঁর স্ত্রী শবনম খুবই সাধারণ গৃহিণী। শিক্ষিত, ভদ্র ও এজাজ ভাইয়ের মতোই অতিথিপরায়ণ। আগেরবার দাওয়াত খেতে এসে আমার সাথে কথা হয়েছিল। খুবই আন্তরিকভাবে আপ্যায়ন করেছিলেন সেবার। বাসায় এসে কলিং বেল টিপলে শবনম ভাবী এসে দরজা খুলে দিলেন। আমাদের দেখে ওড়না দিয়ে একটু ঘোমটা দেয়ার চেষ্টা করে সালাম দিয়ে কুশল জিজ্ঞেস করলেন।

সালামের জবাব দিয়ে বললাম, আলহামদুলিল্লাহ! আপনারা সব ভালো আছেন তো?

: ভালো। আসুন, ভিতরে আসুন, বলে মিষ্টি হেসে ভিতরে চলে গেলেন।

আমরা ড্রয়িংরুমে এসে বসলাম। টেলিভিশনে তখন কি একটা কার্টুন ছবি হচ্ছিল। এজাজ ভাইয়ের ছেলে সা'দ খুব মনোযোগ দিয়ে দেখছিল তা। আমাদের দেখে তার আব্বুর গা ঘেঁষে বসে আমাকে আড়চোখে দেখছিল সে। কাবুলি পোশাকে ছোট বাচ্চাদের দেখতে বেশ লাগে। আমি তাকে আদর করার জন্য কাছে ডেকে আনলাম। সে কিছুটা হতবিহ্বল হয়ে আমার পাশে বসে আমাকে ভালো করে পরখ করতে লাগলো। এ সময় এজাজ ভাই অনুমতি নিয়ে অন্দরে চলে গেলেন। আমি সা'দের সাথে কথা বলে ভাব জমাতে চাইলাম, কিন্তু পাঁচ বছরের শিশুর মাতৃভাষার সাথে বিদেশী হিসেবে কিতাবী জ্ঞানের উর্দুতে আমি ঠিক জমাতে পারছিলাম না।

এজাজ ভাইয়ের ড্রয়িং রুমটি বেশ বড়। দু'পাশে দামি সোফা ও মেঝেতে কাশ্মীরী মোটা কার্পেট। গ্রিল দেয়া বিশাল জানালা ও দরজায় বড় বড় ফুলের প্রিন্ট করা পর্দা দেয়ালের ডিসটেম্পারের সাথে মানানসই। এক পাশে বিশাল দুটি শো-কেসে দেশী-বিদেশী বই পুস্তক। ড্রয়িংরুম দেখে এজাজ ভাইয়ের রুচির প্রশংসা করতে হয়। আমার সাথে ভাব জমাতে ব্যর্থ হয়েই বোধহয় সা'দ রিমোট টিপে টিভি অফ করে ভেতরে চলে গেছে।

এজাজ ভাই সহাস্যে বেরিয়ে এলেন। বসলেন আমার সাথে পাশাপাশি সোফাতে। মিনিট পাঁচেক পরই চা-নাশতার ট্রলি ঠেলে শবনম ভাবীর সাথে ঘরে ঢুকলো আরেকটি নারীমূর্তি। কেবল চোখ দু'টি দেখেই আমি তাকে চিনে

ফেললাম। বিস্ময় বিস্ফারিত চোখ দু'টি স্থির হয়ে রইলো তার কাজল কালো আয়ত চোখের ওপর। অজানা শিহরণে আমার দেহমনে এক রোমাঞ্চকর অনুভূতি জন্ম নিলো। নিজের অজান্তেই অস্ফুটে আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো– সুমাইয়া! তুমি!?

বিস্ময়জড়িত অনুচ্চ কণ্ঠ। পাশে বসা এজাজ ভাইও যেন শুনতে পায়নি আমার গলার স্বর। তখনও আমার চোখ স্থির সুমাইয়ার মুখের ওপর। সুমাইয়ার দৃষ্টি আনত। তার সর্বাঙ্গ যেন এক অনামা লজ্জার চাদরে জড়িত। ঘরে ঢুকেই সে সালাম দিয়েছিলো। আমি জবাব দিতেও যেন ভুলে গেলাম।

এজাজ ভাই কৌতুকভরা চোখে পরখ করছিলেন আমাদের। এক সময় তিনি বলে ওঠলেন, কী ব্যাপার মাহমুদ সাহেব! আমার বোনটির ওপর আপনার দৃষ্টি এভাবে আটকে গেল যে! আগে থেকেই চেনেন নাকি তাকে?

এজাজ ভাইয়ের কথায় আমি সম্বিত ফিরে পেয়ে দৃষ্টি সরিয়ে নিলাম। লজ্জায় আমার মুখ লাল হয়ে ওঠছিল। নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করে বললাম, এই বুঝি আপনার সারপ্রাইজ!

এজাজ ভাই বললেন, কেন সারপ্রাইজ হয়নি?

আমি একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস চাপা দেবার চেষ্টা করে মুখে হাসি ভাব ফুটিয়ে তুলে বললাম– হ্যাঁ, তা হয়েছে বটে! মনে মনে বললাম, যারে কাছে টানা যায় না অথচ প্রাণ ভরে ভালোবাসা যায়, বিধাতার এমনই ইচ্ছা যে, মনের ক্ষতটাকে কাঁচা করে তুলতে আবারও তার সাথে দেখা হয়ে গেলো। মুখে বললাম, তাহলে আপনিই সুমাইয়ার মামাতো ভাই?

এজাজ ভাইয়ের মুখটা কিছুটা মলিন দেখালো। বললেন, হ্যাঁ, অভাগী এ বোনটার আমরাই একমাত্র নিকট আত্মীয়। তাদের করুণ ট্র্যাজেডির মাধ্যমে নিঃশেষ হয়ে যাবার সময় কাছে থেকেও আমরা তাদের কোন উপকারে এলাম না। অথচ দেখুন– চেনা নেই জানা নেই, আল্লাহর ইচ্ছায় হাজার মাইল দূর থেকে এসে আপনি হলেন তাদের সহায়, সাক্ষী হয়ে রইলেন পুরো একটি পরিবারের প্রায় নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার ট্র্যাজেডির।

আমি তো তাদের জন্য কিছুই করতে পারিনি এজাজ ভাই; বরং তাদের কাছ থেকে যা পেয়েছি সে ঋণ শোধ করবার নয়। বললাম আমি।

এজাজ ভাই বললেন, কাল আমি সব শুনেছি সুমাইয়ার কাছে। তার মুখে আপনার কথা বারবার শুনছিলাম। যখন তাকে জানালাম আপনি আমাদের

সহকর্মী, আমরা আপনাকে চিনি-জানি, তখন সে আপনার সম্পর্কে বলার ব্যাপারে বেশ সতর্ক হয়ে পড়ে। তবে তার ভাবীর কাছে আরও খোলাখুলি সব বলেছে। রাতে শুয়ে শুয়ে অতীতের কষ্ট ভুলে তার ভবিষ্যতের কথাই কেবল ভাবছিলাম। ওদের ওখানে যাওয়া আসা ছিলো না ঠিকই, তবে পত্রালাপ হতো মাঝে মধ্যে। গত ছয় মাস ধরে তাও বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। শেখ ওসামা যখন করাচীতে পড়াশোনা করতো তখন বাড়ি যাওয়া-আসার পথে আমাদের এখানটা হয়ে যেতো। তাছাড়া করাচীতে ভাইজানের এখানে প্রায়ই যেতো। পড়াশোনা শেষ করে নীরবে আফগানিস্তান চলে গেলে আর কোন যোগাযোগ তার পক্ষ থেকে হয়ে ওঠেনি।

এমন সময় কলিংবেল বেজে ওঠলে এজাজ ভাই দরজা খুলে বাইরে গেলেন এবং পরক্ষণেই ফিরে এসে বললেন, মাহমুদ সাহেব! আপনি বসে চা-নাশতা করুন, আমি দশ মিনিটের মধ্যে আসছি। বলেই তিনি বেরিয়ে গেলেন।

আমি চোখ তুলে আরেকবার সুমাইয়া ও শবনম ভাবীকে দেখে নিলাম। তারা পাশের সোফায় বসা। মাঝে বসে বিস্মিত চোখে সা'দ চেয়ে আছে আমার দিকে। সুমাইয়ার মুখ নিচু করা।

শবনম ভাবী আমাকে উদ্দেশ করে বললেন, নিন, খাওয়া শুরু করুন। কাল থেকে আপনার সম্পর্কে ও এত কথা বলেছে যে, একজন নারী হিসেবে অন্য একজন নারীর মনের অবস্থা বুঝতে আমার অসুবিধা হয়নি মোটেও।

কুণ্ঠিত হয়েই আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী বুঝেছেন আপনি?

সুমাইয়া লজ্জা ঢাকতে ভাবীর আড়ালে মুখ লুকোতে গিয়ে একবার অপাঙ্গে তাকালো আমার দিকে। আমিও তাকিয়েছিলাম তার দিকে। বাংলাদেশের একজন ডাক্তার লেখক লুৎফর রহমান বলেছিলেন, 'কাণ্ডজ্ঞান টনটনে থাকলে ভালোবাসা যায় না।' সুমাইয়ার চোখের ভাষা আমাকে যতটা আশ্বস্ত করে, কিন্তু তার মনের ভেতরকার হ্যাঁ-নার সংঘাত এবং নেগেটিভ প্রকাশ আমাকে যেন ততটাই কাণ্ডজ্ঞানহীন করে তোলে।

ভাবী বললেন, শুনুন মিস্টার! পুরুষের মুখ দেখেও মনের কথা বুঝতে পারে যে কোন নারী। আপনাকে ব্যাখ্যা করে বলার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।

বললাম, ভাবী! দার্শনিক লেখক হোরেস বলেছেন, 'আশা ভালো, উচ্চাশা নয়।' আমি বোধহয় উচ্চাশাই করেছিলাম।

এই প্রথম সুমাইয়া জবান খুললো। বললো, যে বস্তুকে সূর্য আকর্ষণ করে চাঁদের সাধ্য কি তাকে ধরে রাখার!

বললাম, ভাবী! কথাটার মানে কিছুই বুঝলাম না আমি।

ভাবীই বললেন এবার। আপনার তো এই সহজ কথাটা না বোঝার কথা নয়। মার্কিন ডাক্তার এলিয়েদা আপনাকে সাফল্যের যে সিঁড়ি দেখিয়েছে তাতে সুমাইয়ার কাছে এমনটা মনে হওয়া স্বাভাবিক।

ইঙ্গিতটা এবার পরিষ্কার হলো আমার কাছে। এলিয়েদার চিঠির কথা এজাজ ভাই তাহলে ওদের কাছেও বলেছেন। বললাম, কিন্তু ভাবী, চাঁদের আলোকে যাচঞা করে যে চকোর সূর্যের আলো সইবার শক্তি কি তার থাকে?

উভয়েই হেসে ওঠলো আমার কথায়।

ভাবী বললেন, আপনার সাথে কথায় পারা যাবে না তা বুঝি।

বললাম, তবে আপনারা ননদ-ভাবী মিলে আমাকে আশা-নিরাশার দোলায় রেখে মজা করাটা খুব পারছেন।

ভাবী একটু আহত হলেন বলে মনে হলো আমার কথায়। সুমাইয়া অপাঙ্গে চোখ রাঙিয়ে শাসালো আমাকে। এমন হাসিমাখা আন্তরিক শাসন কেবল প্রিয়জনদের কাছ থেকেই পাওয়া যেতে পারে। আমি তার এই হাসিভরা শাসনের মধ্যেই আমার উত্তর পেতে চেষ্টা করলাম। দার্শনিক হারম্যান বলেছেন, 'হাসি হচ্ছে যে কোন প্রশ্নের বিজ্ঞতম ও সহজতম উত্তর।' ঠিক এ সময়েই ফিরে এলেন এজাজ ভাই। তখন মসজিদে মাগরিবের আযান হচ্ছিল। তিনি ঘরে প্রবেশ করায় আমাদের কথাও থেমে গেলো।

মসজিদে যাচ্ছিলাম এজাজ ভাইয়ের সাথে। তিনি আমার একটি হাত নিজের হাতে নিয়ে বললেন, মাহমুদ সাহেব! সুমাইয়ার সাথে আপনার হৃদয়ঘটিত ব্যাপারটি আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয়নি। দুঃখী এই বোনটিকে একজন ভালো পাত্র দেখে পাত্রস্থ করার সামর্থ্য ও সদিচ্ছা কোনটারই অভাব আল্লাহর ফজলে নেই আমাদের। কিন্তু পৃথিবীতে সে কতটা নিঃস্ব ও অসহায় তা আপনার চেয়ে আর কেই বা বেশি জানে! বিয়ে দিলেই সুখী হতে পারবে তার নিশ্চয়তাই বা কতটুকু। এখানে আসার সময় তাকে মানসিকভাবে বেশ বিপর্যস্তই মনে হয়েছিলো। সে আবার কাশ্মীরে ফিরে গিয়ে আমৃত্যু লড়াই করার এরাদা ব্যক্ত করেছিল আমাদের কাছে। কিন্তু তার জন্য সেটা আত্মহত্যার শামিল বই আর কিছু নয়।

তিনি একটু থামলে আমি বললাম, ভাই! একজন কি দু'জন মানুষের খুনের বদলায় যদি কাশ্মীর আযাদ লাভ করতো তাহলে আমি নিজেই সেই মিছিলের

প্রথম সারিতে চলে যেতাম। কিন্তু তা তো হবার নয়। আপনার কথাই ঠিক, তার এ ধরনের ইচ্ছা আত্মহত্যারই শামিল!

হ্যাঁ, কাশ্মীরের মানুষ আজ অর্ধশতাব্দী ধরে লড়াই করে যাচ্ছে। আরও কত খুন অপেক্ষা করে আছে আযাদীর জন্য কাশ্মীরের জমিনে তা আল্লাহই জানেন। কিন্তু আত্মাভিমানে বিক্ষত এক নারীর বিক্ষিপ্ত আত্মবিসর্জন নিশ্চয়ই আযাদী অর্জনে তেমন কোন সুফল আনতে পারে না। আমি জানি সে নিজেকে যতই লুকাতে চেষ্টা করুক, আপনার প্রতি তার অনিঃশেষ ভালোবাসার ফল্গুধারা স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। আমরা তাকে বোঝাতে চেষ্টা করছি। আশাকরি কামিয়াব হবো। আপনি যদি তাকে সত্যিই কবুল করুন তো আমরা খুশিই হবো। যেখানে আত্মার সাথে আত্মার সম্পর্ক সেখানে স্থানকালপাত্রের ভেদ অসার। আমার বিশ্বাস আপনার জীবনের সফরসঙ্গী হতে পেরে সে সুখীই হবে।

খুশিতে আমি এজাজ ভাইয়ের হাতটা আরো জোরে চেপে ধরলাম। বললাম, সেটা হবে আমার পরম পাওয়া। আমি নিজেকে ধন্য মনে করবো তাহলে।

আবার বললেন এজাজ ভাই, আপনি আমাদের এখানেই থাকুন। এই কয়দিনে সুস্থ পারিবারিক আবহে দেখবেন মানসিকভাবে সে আরও স্বাভাবিক হয়ে স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারবে। আমাদের ওয়ার্কশপ শেষে আইবিএ'র চেয়ারম্যানের উপস্থিতিতেই যেন শাদী মোবারক সম্পন্ন করা যায় সে আশাই করছি আমি।

এজাজ ভাইয়ের কথায় অজানা লাজে ও শিহরণে আমার সমগ্র শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠলো। মুখাবয়বও রক্তবর্ণ ধারণ করে থাকবে হয়তো। তিনি তাকালেন আমার মুখের দিকে। আমরা তখন মসজিদ আঙ্গিনায় এসে গেছি। আমার দৃষ্টি পশ্চিমাকাশে। গোধূলি লগ্নে পশ্চিমাকাশ তখন আবির রঙে ছেয়ে আছে নতুন একটি ভোরের প্রত্যাশায়।

তখন পৃথিবী নামক গ্রহটিতে আরও একটি রাত নেমে আসার আয়োজন চলছে।

স মা প্ত

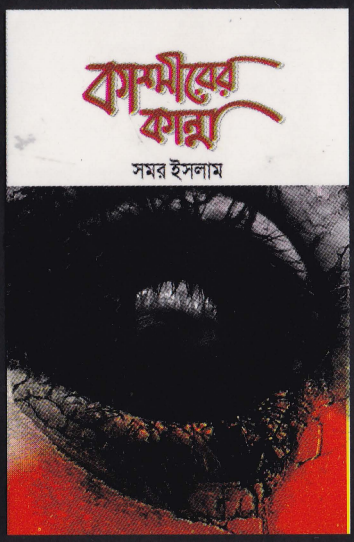
Remash

Presents

https://www.banglapdf.net
https://www.boighar.com
https://www.boilovers.com

Scan & Edit

Md. Shahidul Kaysar Limon
মোঃ শহীদুল কায়সার লিমন
https://www.facebook.com/limon1999



বইঘর

ISBN : 984-70168-0050-4

9 847016800504

KASHMIRER KANNA
SAMOR ISLAM

কাশ্মীরের কান্না
সমর ইসলাম